তৃতীয় ভুবন

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

তৃতীয় ভুবন

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৫

সাড়ে চার টাকা

এই লেখকের :

আগামী

কাছের যারা

প্রচ্ছদশিল্পী

সুবোধ দাশগুপ্ত

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

অনিলকুমার সিংহ

করকমলেষু

তেরশো চৌষট্টির শারদীয়া সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় তৃতীয় ভুবন প্রকাশিত হয়। উপসংহার এবং দু তিনটি পরিচ্ছেদ অনিবার্য কারণে তখন ছাপা যায় নি। পূর্ব লিখিত এই অংশটুকুর সংযোজনা ছাড়া উপন্যাসের আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় নি।

॥ এক ॥

চোখ খুলেই দেখল, ঘরটা অন্ধকার। অন্ধকার, অর্থাৎ ভোর হয় নি। ভোর হয় নি, অথচ অ্যালার্ম বাজছে কেন?

জয়ন্তী পরপর চিন্তা করল। চোখ থেকে তখনও ঘুম যায় নি। চেতন আর অবচেতনের এক মিশ্র তরঙ্গে তার অস্তিত্ব যখন দুলছে তখন এইভাবে চিন্তার কয়েকটা বুদবুদ ফুটে উঠেই কেমন মিলিয়ে গেল।

কয়েক গাছা চুল কপাল ডিঙিয়ে ঠোঁটের ধার ঘেঁষে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে দেখতে পারছিল না কিন্তু শরীরের অনুভূতি দিয়ে বুঝছিল। বুঝছিল কেমন একটা অস্বস্তি। অথচ এ বোধ এতক্ষণ ছিল না। ঘুম কি সমস্ত স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করে রাখে? তাহলে মানুষ স্বপ্ন দেখে কি করে? আঘাত পেলে চমকে ওঠে কেন? তাছাড়া জেগে থাকলেও চুলের বোঝা অনুক্ষণ পিঠের ওপর বহন করছে। অথচ মুখের ওপর তার সামান্য স্পর্শেই এখন কেমন একটা অস্বস্তি। হয়ত শরীরের এক-একটা অংশের সহন-শক্তি এক এক রকম। হয়ত এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে।

হাত দিয়ে চুলের গোছা সরাতে গিয়ে জয়ন্তী অনুভব করল সব ক'টা স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বল আর বুভুক্ষু। শরীরের ক্ষিদে শুধু পরিমিত আহারেই মেটে না, পর্যাপ্ত বিশ্রামও প্রয়োজন— স্বাস্থ্যতত্ত্বে এ কথা লেখা থাকলেও, বাহারী শাড়ি পরার মত সময়

বেঁধে বিশ্রাম নেওয়ার অভ্যেসকে জয়তী চিরদিন ফ্যাশন বলে অবজ্ঞা করতে শিখেছে। অথচ আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ঐ স্বাস্থ্যতত্ত্বের দোহাই দিয়েই তার সমস্ত শরীরটা চাইছে আর একটু ঘুম। ঘুম এবং বিশ্রাম। না নড়ে, পেশীগুলোকে এতটুকু সচকিত না করে যদি সে আবার ঘুমোতে পারত। এক ঘণ্টা। না, দু-ঘণ্টা। তাও না, বেশ কিছুক্ষণ। আহঃ, যদি পারতো।

অর্থাৎ, এই মুহূর্তে শুধু একটু ঘুমের অবসর ছাড়া জয়তী আর কিছু চায় না। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে সমস্ত অভাব, বেদনা, ব্যর্থতা এবং যন্ত্রণা সত্বেও যে পৃথিবীটা শেষ রাতের অন্ধকার আর আলো আর আলো-অন্ধকারে মাখামাখি একটা ছইয়ের নীচে সহজ নিশ্চিন্তি এবং অনায়াস বিলাসে স্বপ্ন দেখছে, সেই পৃথিবীকে জয়তী হিংসে করছে। জনপ্রিয় উপন্যাসের নায়িকার মতো ভাষার সামান্য রদবদল করে এখন সেও পারে বিশ্ববিধাতার কাছে একটা হৃদয়স্পর্শী আবেদনের বাণ ছুঁড়ে মারতেঃ তোমার কাছে তো বেশী কিছু চাই নি আমি। সামান্য একটু ঘুমের অধিকারও কি—

হাসি পেল। আর, হাসি পেয়েছে—এ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জয়তী বুঝল, ঘুমের জড়তা কেটে যাচ্ছে। রোজই অ্যালার্ম শুনে চোখের পাতা খোলার সঙ্গে প্রথমে অবসাদ, পরে বিরক্তি এবং শেষে কিঞ্চিৎ দার্শনিক চিন্তার উদয় হয়। ভোর আকাশের তরল অন্ধকারকে মধ্যরাত বলে ভুল করার প্রবণতা জাগে! কিন্তু যথার্থ দার্শনিকের মতই সব কিছুকে মায়া জ্ঞানে জয়তী শয্যাত্যাগ না করেও পারে না।

বার কয়েক এ-পাশ ও-পাশ করল। শরীরটাকে তুমড়ে কুঁকড়ে গুটিয়ে আনল। তারপর হঠাৎ উবু হয়ে বালিশে কপালটা গুঁজে দুই হাঁটুর ওপর শরীরের ভর রেখে স্কুলের নীচু ক্লাসের মেয়েরা যেমন নীলডাউন হয়ে থাকে, অনেকটা সেই ভঙ্গীতে জয়তী লোভীর মত শেষবারের জন্য বিছানা আর ঘুমের স্বাদটা উপভোগ করতে চাইল। আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে এত ভালো লাগে আগে তা জানত না। কিন্তু তখনও অ্যালার্মটা বাজছে। আর জয়তীর চেতনা যত সজাগ হচ্ছে, ততই সে বুঝছে এই আশ্চর্য প্রদোষে অন্ধকারে ঘড়ির একটানা যান্ত্রিক আর্তনাদ, যান্ত্রিক এবং কর্কশ উচ্চারণে তার অস্তিত্বের দুর্বিনীত ঘোষণা কেমন বেমানান।

পাশের ঘর থেকে মা যেন বিড়বিড় করে কি বললেন। হঠাৎ ইচ্ছে হল জোর করে ঘুম ভাঙার স্বাদ ভদ্রমহিলা একটু চেখে দেখুন। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের বাসনার দৈন্যে জয়তী লজ্জা পেল। শ্রম এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় তো মা আজীবনই দিয়েছেন। তাছাড়া কাক-ভোরের পৃথিবীতে সেও কিছু প্রথম স্কুল মাস্টারি করতে যাচ্ছে না। দিন যাপনের নাটমঞ্চে নিজের ভূমিকাকে ফাঁপিয়ে দেখার মত মূর্খতা আর কি আছে? নাকি মার এক চিলতে দীর্ঘশ্বাস, এক টুকরো 'আহা' শোনার, শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্যই মার চোখ থেকে সে ঘুমটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে?

নিজের ওপর বিশ্রী একটা বিরক্তি নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বন্ধ করল।

শব্দটুকু অদৃশ্য হতে অন্ধকার ঘরের চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেল। কেমন মনে হল, শব্দেরও একটা রূপ আছে। তাছাড়া যে অ্যালার্ম একটু আগে তার কানে কর্কশ ঠেকেছিল, আসলে তার স্বল্প অস্তিত্বও একটা নিয়ম, ছন্দ আর সুর মেনেছে। বুঝল শব্দ শুধু কানে শোনার নয়, চোখেও দেখার।

খাটের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক ভাবে আঙুল ক'টা মটকালো। ডান হাতের তর্জনী ফোটে না। মায়াদি একদিন হঠাৎ মটকে দিয়েছিল। খুব লেগেছিল প্রথমে। কিন্তু যন্ত্রণার অস্ফূট আর্তনাদ আর খুশির অকারণ হাসি শেষ বা শুরুর কোন সময়গত ব্যবধান না রেখে এক সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মায়াদি সেদিন টিউশনির মাইনে পেয়েছে। ক্যানটিনে খাইয়েছিল সকলকে। জয়তীও আজ মাইনে পাবে। প্রথম মাইনে, তার জীবনের প্রথম উপার্জন!

আলস্য, বিরক্তি আর বিড়ম্বনা যেন কতগুলো ছায়ার মতো এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল। সুইচ্ টিপে বাতি জ্বালল। কয়েকটা আলোর ঢেউ একটা স্বতন্ত্র তরঙ্গ হয়ে ছোট্ট পরিধি অথচ তীব্র ওজন নিয়ে তার চোখের ওপর, মুখের ওপর হঠাৎ ফেটে পড়ল। জয়তী যেমন সিদ্ধান্ত না করে নিঃশ্বাস নেয় তেমনি কিছু না ভেবেই বাঁ হাতের তালু দিয়ে চোখ জোড়া ঢেকে ফেলল।

তারপর আলোতে অভ্যস্ত হবার পর ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ছড়ালে রোজই যা দেখতে হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হল না। বিছানা ছেড়ে গড়াতে গড়াতে নমু একেবারে দরজার কাছে চলে

গেছে। বিল্কু হাঁ করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এভাবে ঘুমোনো দুর্বলতার লক্ষণ। জয়তীও ঘুমোলে হাঁ করে কিনা কে জানে!

এই ঠিক হয়ে শো। বিল্কুকে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে জয়তী বলল, এই, মার খাবি কিন্তু। বলল বটে, জয়তী জানে তার বিরক্তি আর উদ্বেগ-মেশানো অভিব্যক্তির এক বর্ণও মেয়েটার কানে যায় নি। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে বিল্কু পাশ ফিরে শুল। কি বলছে বিল্কু শোনার চেষ্টা করেও তা বুঝতে পারল না। স্বপ্নে মনের চিন্তার প্রতিফলন থাকে। বিল্কু যে কথা হয়তো কোনদিন মুখ ফুটে বলবে না, কোনদিন না—তা এই মুহূর্তে বলা হয়ে গেল কিনা কে জানে!

বিল্কু কি বলতে পারে তা ভাবতে গিয়ে জয়তীর অনেক কথা মনে পড়ল। কথা আর ঘটনার কিছু ছবি। সম্প্রতি ভয় বা ভাবনা জয়তীকে অহরহ পীড়া দেয়। তাকাবার ভঙ্গী, গলার স্বর আর যা উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে স্পষ্ট শুনতে পায় নি এমন কথার পেছনে প্রায়ই সে গূঢ় ব্যঞ্জনার আভাষ পায়। অথচ পরে বোঝে, এ তার জটিল মানসিকতারই প্রতিফলন। আপন হীনমন্যতাবোধ। কিংবা অপরাধচেতনা।

নিজেকে ধিক্কার দিল। ছোট বোন, কতোই বা বয়েস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কি কথা বলছে, তা নিয়ে এমন অশোভন কৌতূহল কেন? তাছাড়া বিল্কু ভাবতে পারে, এই ধারণার ছদ্ম আবরণে সে নিজের কিছু চিন্তা কেন মেয়েটার ওপর আরোপ করছে?

বিল্কুর দিকে তাকাল। কুঁকড়ে শুয়ে আছে। মাথার চুল

বিনি ফিতেয় . বিনুনী করে বাঁধা। জয়তীর কালো রিবনটা ওর ভালো লাগে। মাঝে মাঝে নিয়ে বাঁধে। কাল চাইতে এসে জয়তীর কাছে চড় খেয়েছে। অবিশ্যি বিন্দুর দোষ ছিল না, জয়তীরও না। দিদির কথা তুলে মা এমন কান্নাকাটি শুরু করলেন! মা কেন মার মতো হন না? আদেশ করতে পারেন না, অনুরোধও না। খালি রাজ্যসুদ্ধু লোক ডেকে সালিশ মানেন আর আপশোস করেন। কাঁদেন।

অবিশ্যি দিদির দায়িত্ব কম ছিল না। কিন্তু আজ এক কথায় তাকে বাতিলের পর্যায়ে ফেলে মা যদি পৃথিবীর তাবৎ সন্তান সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন—এরা এই রকম, তাহলে কি অন্যায় হবে না? তাছাড়া দিদির দিকেও কি ভাবার কিছু নেই? জয়তী তার মন দিয়ে, তার জ্বালা দিয়ে কি দিদির যন্ত্রণার কোন আভাষই পায় না?

বোঝে মার পক্ষে সে উপলব্ধি সহজ নয়। কিন্তু নিজের মেয়ে, এতদিন যাকে দেখেছে, নিছক দেখা নয়—বুঝেছে, শুধু বোঝা নয়, জেনেছে—তার সম্পর্কে মার ধারণা রাতারাতি বদলে গেল কি করে? একটা ঘটনা কি মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে বদলে দিতে পারে?

তাহলে অস্তিত্বের ভিত্তি কি? দিদি তপতীর বয়েস আঠাশ। মাঝারি রূপ, মাঝারি গুণ, বরাবর মাঝারি ফল করে গ্রাজুয়েট হয়েছে। দশটা মেয়ের মতোই চিরকাল বয়েস মেনে ঘরে বাইরে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। মা ভালবাসতেন, বাবা ভালবাসতেন, ভাইবোনেরা ভালবাসত। পাড়ার লোকও বলেছে, তপুর মত মেয়ে হয় না।

অথচ একটা ঘটনায় সেই মানুষ সম্পর্কে সকলের ধারণা কত সহজে পাল্টে গেল! ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, একথা সত্যি। কিন্তু তাতে একটা সত্তা পুরোপুরি বদলায় কি করে? আঠাশ বছরের ইতিহাস আর অভ্যেস তো এতো অনায়াসে মুছে যাবার নয়!

জয়তী জানে আজও দিদি একই রকম আছে। শুধু অনিবার্য-ভাবেই কিছু পরিণতিজনিত পরিবর্তন হতে পারে। জীবনে নতুন অবস্থা এসেছে। সেই অবস্থার প্রভাব মনে পড়েছে। সেই প্রভাব চৈতন্যকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নতুন অবস্থা আর পরিবেশ দিদির জীবনে নতুন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে পারে। কারণ জীবন প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ে। কিন্তু যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সে এই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করছে, তা তো বদলায় নি। জয়তী জানে, বদলাতে পারে না।

অথচ আজ সকলে নির্দ্বিধায় বলবে দিদি বংশের মুখ ডুবিয়েছে, দিদি স্বার্থপর। তপতী সম্পর্কে আগে যাদের অন্য ধারণা ছিল, তাদের চোখেও তপুদি পাল্টে গেল। অর্থাৎ গুণাগুণের ভিত্তিতে মানুষ মানুষকে বিচার করে না। তার একটা পছন্দের মাপকাঠি আছে। সেই ছক না মিললেই একজনের চোখে অন্যজন যা—তা আর থাকে না, যা নয়, তাই হয়ে ওঠে। হয়ত জয়তী সম্পর্কেও মা একদিন এই ভাবেই—

চমকে উঠল। সমস্ত চৈতন্য যেন নাড়া খেয়েছে। অনেক দুরূহ মুহূর্তেও জয়তী নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারে। চিন্তার সূত্র ধরে মনটাকে আতিপাতি করে খুঁজে দেখল। বুকের তলায় একটা বাসনা—যাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না অথচ মন থেকে

যার উপস্থিতি একেবারে দূর করে দিতেও যন্ত্রণা, চেতনায় যার উপস্থিতি নেই বলে অবচেতনায় নিজেকে ঠকায়—এই মুহূর্তে সেই বাসনারই কি জয় হল? তাই কি সে এমন অনায়াসে দিদির সারিতে নিজেব ভবিষ্যতকে ঠেলে দিচ্ছে? পৃথিবীকে দোহাই দিয়ে বোঝাচ্ছে, মা তাঁর সীমাবদ্ধতা দিয়ে সন্তানের যন্ত্রণা কিছুতেই বুঝবেন না। মেয়ে যখন চৈতন্যের নিয়মকে মানতে বাধ্য হয়ে বিকাশের পথে পা বাড়াবে, তখন তিনি চোখের জলে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের পাল উড়িয়ে সেই মেয়ে সম্পর্কে কতগুলি ভুল ধারণারই নাও ভাসাবেন। অতএব জয়তীর কি দোষ?

মুক্তির সুন্দব পথ। আত্মবঞ্চনার অপূর্ব রাস্তা। নিজেকে বিদ্রূপ করল। মহাজন বলে গেছেন জ্ঞান জীবনের অভিশাপ। অথচ জ্ঞানের আলোয় অনুক্ষণ নিজেকে যাচাই না করলে কত সহজে স্বার্থপর হয়েও মহত্বের পোষাক পরা যায়।

পাশের বাড়িতে শব্দ করে অ্যালার্ম বেজে উঠেই আবার থেমে গেল। জয়তী যেন চোখেব ওপব ছবিটা দেখতে পেল! অজিত লাফিয়ে উঠে কল টিপে ঘড়ির আওয়াজ থামিয়েছে। অন্যের সুখ-সুবিধের দিকে ছেলেটার নজব আছে। চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে জয়তীর মত ওর সময় লাগে না। একটু পরেই দাঁতে ব্রাশ ঘষার আওয়াজ আর মাঝে মাঝে থুথু ফেলার শব্দ কানে আসবে। তারপর পড়তে বসবে। ওদেব পরীক্ষা এসে গেছে। আসাদ হতভাগাটা কি করছে এখন? ঘুমোচ্ছে? ভাবতে হাসি পেল। চোখের ওপর বিষ্কু শুয়ে অথচ আসাদ ঘুমোচ্ছে একথা ভাবতে হাসি পেল কেন? একেই তো মুখ্যু, তার ওপর পড়াশুনো করে

না। নিশ্চয়ই আবার ফেল করবে। ফেল করবে? মরুকগে। ধানাই-পানাই চিন্তা করে লাভের মধ্যে শুধু দেরি।

আঁচলটা ঠিকমতো জড়িয়ে জয়তী দোর খুলে বাইরে এল। শহরতলীতে ভোর হচ্ছে। আকাশে একটা দুটো তারা। পূব দিকের অন্ধকারে একটু ফিকে রং ধরেছে। তারপরই হালকা কতগুলো মেঘ স্তরে স্তরে ক্রমশঃ ভারী আর কালো আর অস্পষ্ট হয়ে পশ্চিমের অন্ধকারে মিশে গেছে। ওদিকে তাকালে কালো পাথরের মত ঘন অথচ উঁচুনীচু একটা দেওয়াল চোখে পড়ে। জয়তী জানে দেওয়াল নয়, কতগুলো গাছ। অন্ধকারে নিবিড় মনে হয়। কিন্তু দিনের আলোয় বেশ দেখা যায় গাছগুলো কত দূরে দূরে, কতো এলোমেলো আর ছড়ানো! নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো নিঃস্তব্ধ কতগুলো বাড়ি। তারপরই আকাশটা যেন নীচু হয়ে গাছের অরণ্যের মাথায় হাত রেখেছে। একটা দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে পৃথিবীটাকে কত ছোট আর জমাট মনে হচ্ছে। যেন তার সমস্ত অবস্থান এবং অস্তিত্ব-টাকে হাতের মুঠোয় ধরা যায়। কিন্তু দিনের আলোয় এই পৃথিবী কত বড় আর কি আল্‌গা। দিগন্তের রেখাচিহ্নও কতো দূরে।

বারান্দার ওপর জানলার তাকে তেলের শিশি, সাবান, দাঁতের মাজন আর একটা কাগজের মোড়কে পেতলের জিভছোলা হেলা-ফেলা করে ছড়ানো। বাঁ হাতের তালুতে কিছুটা মাজনের গুঁড়ো নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দিদির কথা আবার মনে পড়ল। আগে ওরা ঘুটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজত।

দিদির জেদেই এ বাড়িতে মাজনের ব্যবহার চালু হয়েছে। একটা রেকিউজি বুড়ো মাস গেলে কাগজের বাক্সে মোড়া দন্তশক্তি মাজন দিয়ে যায়। বুড়োর নিজের দাঁত কটা খারাপ কিন্তু মাজনেব উপকারিতা সম্বন্ধে আশ্চর্য বক্তৃতা দিতে পারে। ভাবতে হাসি পেল আর হাসতে গিয়ে গলার ভেতর কিছুটা থুথু ঢুকে গেল। কেমন তেতো আর ঝালঝাল স্বাদ। গা গুলিয়ে উঠল। আজকাল রোজই মুখ ধোয়ার সময় আঙুল দিয়ে জিভ পরিষ্কার করতে গিয়ে বমি আসে। পিত্তি পড়ে এমন হয়, না পেটে আল্‌সার হচ্ছে ?

খুব সহজ ভাবে চিন্তা করল। এমন নয়, জয়তী জানে না তার পরিণতি কি। দাদাকে সে দেখেছে। কি যন্ত্রণা আর খাওয়া-দাওয়ার কি বিধিনিষেধ। স্বাভাবিক জীবনটা অনেক ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। অথচ নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একটুও চমকাল না। যেন দূর থেকে অন্য কারোর অবস্থা খতিয়ে দেখছে। যেন জানে, না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, আর হলে কি করা যাবে—এমন একটা ভাব। স্বাস্থ্যসঞ্চয়ী মনকে জয়তী চিরকালই অবজ্ঞা করে। ভবিষ্যতে শরীর ভাঙতে পারে ভেবে এখনই সে যা ভালো লাগে না এমন একটা নীতিবাচক আর নেতিমূলক গণ্ডির ভেতর ঢুকতে রাজি নয়। তাই বলে প্রকাশদার বাড়াবাড়িও পছন্দ করে না। নাওয়া, খাওয়া, শরীরটাকে নিয়তম নিয়মে রাখার ব্যাপারে ওঁর এই প্রবল ঔদাসীন্য কেন, জয়তী তা কিছুতেই বোঝে না। হালে যেন আসাদেরও এই রোগ বাড়ছে। একদিন ধরে একটা চড় মারতে হবে। প্রকাশদাকে বলে লাভ নেই। উল্টে ঠোঁট টিপে হেসে কিছু বাণী দিয়ে দেবেন। আজ আবার একটু আগে কলেজ যেতে হবে।

এমনিতেই অবহেলা বাড়ছে আর প্রকাশদা চটছেন। বলি বলি করেও নিজের সমস্যার কথা কিছুতেই বলা হয় নি। মায়াদিকেও না। জয়তী দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে সত্যি। কিন্তু আরও কতো বড় কর্তব্যের টান, টান আর দ্বন্দ্ব তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একথা যদি জানতেন, তাহলে কি প্রকাশদা তার ওপর এভাবে রাগ করতে পারতেন ?

কয়েকটা কাক ডেকে উঠল। মৃদু, গম্ভীর অথচ কি এক অনিবার্য ঘোষণায় ভরাট। ভোরের আলো-ছায়া আর দুপুরের চড়া রোদে কাকের ডাক শুনতে আশ্চর্য লাগে। অন্য সময় এই ডাকই কত তুচ্ছ আর কুশ্রী। পৃথিবীর সব সুন্দরই বোধ হয় বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশের ভেতর সুন্দর। তাই ভোর আর সন্ধ্যের চেহারাটা মূলত এক। অথচ তফাৎ আছে। তফাৎ চরিত্রে। চরিত্র কথাটা বড় ভেগ। যত না আপেক্ষিক তার থেকেও বেশী অশ্লীল। হেডমিস্ট্রেস বনদি প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর চরিত্রে সন্দেহ করেন। অর্থাৎ জয়তী সম্পর্কেও তাঁর সংশয় আছে। কিন্তু জয়তী জানে চরিত্রহীন হওয়া কত শক্ত। হলে কি সুবিধে। ইচ্ছে থাকলেও চরিত্রহীন হতে না পারাটা তাদের ট্র্যাজেডি।

এই যুগ সম্পর্কে একটা ভালো বিশ্লেষণ করতে পেরেছে ভেবে খুশি হল। আর দূর থেকে পাখার ঝাপটের শব্দ কানে এল। পাখিরা জেগে উঠছে, আবার কটা কাক ডাকল। একটু পরেই একটা জুটো মুরগীর চিৎকারও শোনা যাবে। অন্ধকার থেকে প্রদোষে পৌঁছতে রাতটা বেজায় দেরি করে। কিন্তু প্রদোষ থেকে প্রভাতের যাত্রাপথে সূর্যের গতি অত্যন্ত দ্রুত। হঠাৎ কি ভাবে

যেন চারদিকটা আলোয় ফটে ওঠে। আকাশে তারা থাকে কি থাকে না। কিছু কিছু পাখির ডাক, বিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষের গলা, হঠাৎ বাসন মাজার শব্দ, দূর রাস্তায় লরীর আওয়াজ—ভোর হয়।

ততক্ষণে জয়তীকে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। রান্না ঘরের তালা খুলে গ্ল্যাক্সোর টিন থেকে দু-মুঠো চিঁড়ে বার করে এলুমিনিয়ামের বাটিতে জল, নূন আর গুড় দিয়ে মেখে প্রাতঃকালীন জলযোগটা সারা হয়েছে। চিঁড়ে ভিজে ফুলে উঠলে একেবারেই খেতে পারে না। আবার সদ্য জলে দেওয়া শক্ত পদার্থটি চিবিয়ে গিলতেও সময় লাগে। খাওয়ার জন্য এত পরিশ্রমে বিরক্তি! মাঝে মাঝে না খেয়েই বেরোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দু-একদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে এ অভিমানের কোন মূল্য নেই। কারণ বাঁচতে তাকে হবেই। আর সে-ও বাঁচতে চায়। তাছাড়া এ অবস্থায় ভোর বেলা উঠে হাঙ্গামা করতে মাকে তো জয়তীই নিষেধ করেছিল।

খেতে সময় লাগলেও পোষাক বদলাতে দেরি হয় না। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিটি টিচার পোষাক আর প্রসাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। কারণ রঙীন শাড়ি বনদি পছন্দ করেন না। পাউডার মাখলে চটে যান। দুল, হার আর এক-জোড়া চুড়ির বেশি অন্য অলঙ্কার পরলে এমন বিদ্রূপ করেন যে চোখে জল আসে।

শকুন্তলার মত অলংকারের আধিক্য ঘটার কারণ জয়তীর নেই। পাউডার মেখেছে যদি কেউ বোঝে, তাতে মর্মান্তিক লজ্জা। দেখতে যে সে যথেষ্ট সুন্দর নয়, এ চৈতন্য আছে। কিন্তু রঙীন

শাড়ি পরতে জয়তীর ভালো লাগে। দোকানে বসে কাটলেট খাওয়া, আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখার মত রঙীন শাড়ি পরাও তার একটা সখ। কেন, তা ঠিক বোঝে না। সাদা শাড়ি তাড়াতাড়ি ময়লা হয়, নিজের রুচির স্বপক্ষে এমন একটা প্রয়োজন বোধের যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মন সায় দেয় নি। সাদা শাড়ির সঙ্গে বৈধব্যের, বঞ্চনার একটা যোগ আছে—জয়তীর জীবনবোধ তাই রঙ পছন্দ করে, এ দোহাইও নিজের কাছে হাস্য-কর ঠেকেছে। কিন্তু সে যাই হোক, অন্যের ভ্রূকুটির ভয়ে শাড়ির রঙ স্থির করায় কি অপমান।

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মত প্রথম যেদিন ভেবেছিল জীবনে টিঁকতে গেলে অনেক অপমানই হাসিমুখে সইতে হয়—সেদিন জয়তী মুখার্জীকেও এমন কথা ভাবতে হল দেখে প্রথমে হাসি পরে কান্না পেয়েছিল। আজকাল কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। বেশ নিষ্করুণ ভঙ্গিতে বুঝতে পারে টিঁকে থাকতে হলে অনেক কিছুই সইতে হয়। না পারলে অন্তত, সহ্য করার ভানটুকু জানতে হয়।

জয়তী স্কুলে যায় খোঁপা বেঁধে। একটু ভারিক্কি ভাব আনার জন্য সে নিজেই এমনতর পরিকল্পনা করেছে। তাছাড়া পিঠের ওপর বিনুনী ঝুললে মনটাও কেমন ছেলেমানুষিতে দোল খায়। চুল বাঁধার সময় কালো রিবনটা হাতে নিয়ে থমকে দাঁড়াল। একবার বিল্টুর মুখের দিকে তাকাল। ঘুমোচ্ছে। রিবনটা ওর মাথার কাছে রেখে যাবে? ঘুম থেকে উঠেই দেখবে। দেখে খুশি হবে, না চটবে? না, কিছুই না-ভেবে মনে করবে দিদি দিতে হয় তাই দিয়েছে কিংবা ভুল করে ফেলে গেছে?

একবার বিষ্ণুর দিকে দু-পা এগোল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর ঝটপট রিবন দিয়ে চুলের গোছা বেঁধে ফেলে আবার আস্তে আস্তে গিঁটটা খুলে দিল। মনের গতির সঙ্গে হুবহু তাল রেখে তার শরীরের প্রত্যঙ্গগুলো নড়েচড়ে উঠল। শেষে বিরক্ত হয়ে রিবনটা ছুঁড়ে রাখল আলনার ওপর। একটু হাসল। হাসতে হাসতে ভাবল, ঘর গোছাতে গিয়ে বিষ্ণুর চোখে পড়বেই। হয়তো ব্যবহার করতে ভয় পাবে, ভয় আর লজ্জা। হয়তো পাবে না। কিন্তু দিদির ব্যবহারকে নাটকীয় মনে করার কোন সুযোগ এতে রইল না।

ছোট বোনের চোখে মহৎ বা তুচ্ছ হবার সম্ভাবনাকে লুপ্ত করে তার একটা সামান্য সখ মেটাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে ভেবে হঠাৎ জয়তীর খুব ভালো লাগল। হঠাৎ মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল। বিষ্ণুর মুখের পাশে আরও কতগুলো ছায়া-ছায়া মুখ। কোনটাই স্পষ্ট নয় অথচ প্রত্যেকের নাম মনে পড়ছে। মনীষা, বন্দনা, মলি, হাসি। ইস্কুল। একটা চেয়ার, একটা টেবিল, সামনে অনেকগুলো বেঞ্চি আর এক ঝাঁক মুখ। যারা তাকে বিরক্ত করে, মানে না, আবার মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে তার পড়া শোনে। কি যেন একটা মোহ আছে, কি যেন একটা মোহ! বাড়িতে বাবার শাসন, কলেজে প্রফেসরের ধমক। অথচ এ ঘরে সে দিদিমণি। দায়িত্ববোধের আত্ম প্রসাদ। কি আশ্চর্য! এক মুহূর্ত আগেও কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল ঐ সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয় তাকে টানবে, মাস্টারি করার অনুভূতি তাকে রোমাঞ্চিত করবে?

স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে মাকে ডাকল। বেশ ভোর হয়েছে।

মোটামুটি সকাল। একধারে মজা পুকুর, অন্যধারে সামন্তদের নতুন বাড়ি। মধ্যিখানে রাস্তাটা সরু। বর্ষা গেছে। তাই মধ্যে মধ্যে নিয়মিত ব্যবধানে ইট ফেলে পথ চলার ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। ইটগুলো কেউ তুলে ফেলে নি। একটা নালা পেরিয়ে সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেন। এ রাস্তাটা লম্বা আর চওড়া আর মজবুত। ডানদিকে নালা, তারপর একেবারে মোড় পর্যন্ত কাশীপুর ক্লাবের পোক্ত দেওয়াল। আগে নাকি ওর ভেতরে সাতটা পুকুর ছিল। বাগান, বাড়ি, ফোয়ারা এবং সুইমিং পুল এখনও অতীতের পদস্থ ইওরোপিয়ানদের বিলাসপটুতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাঁ দিকে অনেকখানি মাঠ, মাঝে মাঝে বাড়ি উঠছে বা উঠেছে। জয়তীও তার শিশু কালে এখানে মল্লিকদের বিরাট ফুল বাগানের ক্ষয়চিহ্ন দেখেছে। রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে দমদম রোডে। বাঁ দিকে ঘুঘুডাঙা, রেলের টাইম টেব্‌লে যার নাম দমদম জংশন। ডানদিকে চিড়িয়ামোড়। কিন্তু চিড়িয়ামোড় বলে কেন? ওখানে কি আগে চিড়িয়াখানা ছিল? কলকাতা বা শহরতলীর অনেক রাস্তার নামই জয়তীকে বিচলিত করে। অবিশ্যি কিছুক্ষণের মেয়াদে। পরে তা নিয়ে ভাবা বা উত্তর খুঁজে বার করার মতো ধৈর্য তার নেই। আবার একদিন হয়তো প্রশ্নটা তাকে বিচলিত করে। ভাবে, জেনে নিতে হবে এ রাস্তার এমন নাম কেন? কিন্তু ভুলে যায়। আবার একদিন একই প্রশ্ন মনে জাগলে হাসি পায় আর নিজের ওপর বিরক্তি জাগে।

অর্থাৎ এক জাতীয় গভীরতার অভাব। হাঁটতে হাঁটতে জয়তী সিদ্ধান্ত করল। রাস্তার নাম দেখে তার ইতিহাস জানার মতো

অনুসন্ধিৎসা জয়তীর আছে যা হয়তো আরো অনেকের নেই। কিন্তু যে পারম্পর্যবোধ বা অধ্যবসায় একটি সচেতন মনে থাকে, জয়তীতে তার অভাব। এই মাঝারি মনোবৃত্তিকে প্রকাশদা হামেশাই ঠাট্টা করেন। শুনে রাগ হয়। যেন সব কিছুকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়াই ওঁর স্বভাব। সবকিছু, অর্থাৎ যা ওঁর বিশ্বাস বা আয়ত্তের বাইরে।

কিন্তু সত্যিই কি গভীরতার অভাব থেকে ভেসে বেড়াবার মনোভাব প্রশ্রয় পায় না? দিদির বিয়েতে জয়তীর নীতিগত সমর্থন আছে আবার বিয়ের দরুণ দিদি বা রমেনদার জন্য তার মনে যে এক ফোঁটাও অবজ্ঞা নেই, একথা সত্যি নয়। মায়ের পঙ্গু গোঁড়ামিকে সে ঘৃণা করে, অথচ এর পেছনে ভদ্রমহিলার যে অসহায়ত্ব, কান্না আর যন্ত্রণা—তাকেও উপেক্ষা করতে পারে না। এই বয়েসে মার ছেলে হবে ভাবতেই বিতৃষ্ণা, কিন্তু জীবনের ধর্মকে পুরোপুরি মানার গর্ব সে রাখে। তুচ্ছ বা তাৎপর্য-ভরা প্রতিটি ব্যাপারে এমনি তার পরস্পর-বিরোধিতা। তাই তো নিজের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দূরে থাক, চিন্তা করতেও সে ভয় পায়। সন্ধ্যেবেলা আসাদের সঙ্গে দেখা হবে। তার আগে প্রকাশদার কাছে সব খুলে বলবে। জানে হাসবেন, ঠাট্টা করবেন, গম্ভীর হয়ে বক্তৃতাও দেবেন। জানে, নতুন কোন কথা বলবেন না যা সে শোনে নি বা ভাবে নি। তবু প্রকাশদার কাছে পথ চাইবে। গ্রহণ করুক বা না করুক।

কিন্তু পথ কি আছে? পথ একটাই। দমদম রোড, সরকারী বাস। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। আশ্চর্য! একটু আগেই এই

কুৎসিত জীবিকা আর কদর্য ইস্কুলটা সম্পর্কে সে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল কি ভাবে ?

মনে বিরক্তি আর বিস্ময়বোধ কেমন এক হয়ে মিশে গেল। অন্যমনস্কভাবে বাসে উঠল। সকালের বাস, যাত্রী অল্প। কয়েকজন মজুব আব কিছু মধ্যবিত্ত। পথের দু-ধারে জীবন হাই তুলে জেগে উঠছে। খাবারের দোকানে উনুনের ধোঁয়া, পাকা বাড়ির দবজা জানলা খুলে গেছে। বস্তি ক'টার মুখে কিছু কিছু জটলা। চাপা কলের সামনে বালতি আর লম্বা লাইন। আশেপাশে দাঁড়িযে কেউ দাঁত মাজছে, কেউ তেল মাখছে। একটা বুড়ো মত হিন্দুস্থানী আকাশের দিকে জোড়হাতে তাকিয়ে চিৎকার কবে সূর্যের স্তব গাইছে।

সূর্য উঠেছে। আকাশটা আলোয় উপচে পড়ছে। মাত্র কিছু আগের ছায়া-ছায়া, ছায়া আব আলো আর অন্ধকারের মিষ্টি রহস্যটুকু মিলিয়ে গেছে। একমাস ধরে আকাশের এই রঙ বদলের প্রক্রিয়া জয়তী দেখেছে। আর সেই সঙ্গে নিজের মনের ভাঙা গড়ার প্রক্রিয়াও উপলব্ধি করছে।

আজ আর মনে পড়ে না প্রথম দিকে এর পেছনে কোন সজাগ চেষ্টা ছিল কিনা। নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু এখন তা প্রয়োজন আর অভ্যাসেব স্বাভাবিক পথে আপনিই কাজ করে। কাজ করে, জয়তীকে বদলায়। এই সকালে দমদম রোডে ভিড় নেই সরকারী বাস তীব্র খুশিতে ছুটে চলে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে জয়তী কোন দৃশ্যই স্পষ্ট দেখতে পায় না একটা ছবি পুরো ফুটে ওঠার আগেই গাড়ির গতির সঙ্গে তাল

মিলিয়ে আর একটা চিত্রের আবির্ভাব হয়। গাড়ি ছোটে আর এই আশ্চর্য গতির সঙ্গে তাল রেখে জয়তীর মন এবং স্নায়ুও কেমন ছুটতে থাকে। চিড়িয়ার মোড়ে বেঁকে বাঁ দিকে বি, টি, রোড ধরে শ্যামবাজারের রাস্তা। পাকপাড়ার রাজবাড়ি, রাণী রোড, টালা পোল, বাগবাজার ব্রিজ। তারপর শ্যামবাজারের পাঁচমাথা। সেখান থেকে হেঁটে ক-পা এগিয়ে সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু জয়তী যেন এতদূর থেকে স্পষ্ট ইস্কুলের ভাঙা ভাঙা বাড়িটা দেখতে পায়। ঘণ্টার সামনে দফ্‌তরি দাঁড়িয়ে, বনদি নিজের ঘরে পায়চারি করছেন, ছুটতে ছুটতে ছাত্রী আর মিস্ট্রেস ফটক পেরুচ্ছে। রাস্তার দ্রুতপরিবর্তনশীল দৃশ্য চোখের ওপব দিয়ে ঢেউয়ের মত বয়ে যায় কিন্তু মনে কোন ছাপ কাটে না। কারণ ততক্ষণে জয়তী বদলাচ্ছে। নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। জয়তী—যে বাড়ির মেয়ে, যে বিরক্ত হয় আর রাগ করে আর অভিমান, যে দেখে এবং ভাবে, যার চৈতন্যের পেছনে একটি স্পর্শ-কাতর সজাগ মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নেই—সে এখন চোখের সামনে দেখছে তার নতুন অস্তিত্ব। সেখানে সে দিদিমণি। অনেকগুলি মেয়ের শিক্ষিকা, অনেকগুলি শিক্ষিকার সহকর্মী। ইস্কুলের ফটক, বনদির ঘর, টিচার্স রুম এবং ক্লাস—এই পরিবেশের যে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব—যেখানে নতুন বৌ শকুন্তলাও বুড়ী শ্বাশুড়ীর মত হঠাৎ গম্ভীর, গম্ভীর আর কর্তব্যের মুখোশ টেনে কিছু পরিমাণ অস্বাভাবিক—সেই পরিমণ্ডলীর অন্যতম পুতুল জয়তী নিজে।

অন্ধকার থেকে প্রদোষে পৌঁছতে রাতটা বেজায় দেরি করে।

কিন্তু প্রদোষ থেকে প্রভাতের যাত্রাপথে সূর্যের গতি অত্যন্ত দ্রুত। জয়তীর মনের আকাশেও দিনের সূর্যের যাত্রা একই নিয়মে। তাই ঘুম থেকে জেগে বাসে-ওঠার মধ্যে সে নিজের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা এবং বাস্তবতার কোমল রঙের প্রেক্ষা-পটে দর্শনের লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে। কিন্তু বাসে উঠলেই হঠাৎ সকাল হয়। আর সকালেব চড়া রঙে সব স্বপ্ন, কল্পনা অস্পষ্ট হয়ে যায়। মা, দিদি, আসাদ, মন আর মননের সমস্ত দ্বন্দ্ব মিথ্যা মনে হয়। সেখানে শুধু বালিকা বিদ্যালয়। সে—স্কুল টিচার জয়তী মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পিরিয়ডেই ক্লাস সিক্স। শঙ্কিত মনে চিন্তা শুরু করল আজ কি গল্প বলে ওদের শান্ত রাখা যায়। অভিনেত্রীদেব মতো স্কুল টিচারকেও মন ভোলাবার কতগুলো আর্ট রপ্ত করতে হয়। বিশেষতঃ সে যদি ছেলেমানুষ আব দেখতে সুন্দর না হয়। বাংলা কবিতার ব্যাখ্যাটা কাল রাতে পড়ে রেখেছে। ক্লাস ম্যানেজ করতে না পারলে নিজেরই লজ্জা। হৈমদি, চারুদি মুখ টিপে হাসবেন। বনদি শাসাবেন। আস্তে আস্তে জয়তার সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কঠিন হয়ে উঠছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত তার কাছে ইচ্ছেটা পাখির চোখ। আর চোখ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যে। তার দায়িত্ব, সম্ভ্রম, টিঁকে থাকার গুরুত্ব—হৈমদি, চারুদিব মত সহকর্মীর সঙ্গে নিপুণ রাজনীতিকের মতো মানিয়ে চলা—এই জীবনের বাস্তবতা। এই একমাত্র সমস্যা। আর কিছু নেই, কিছু নয়।

॥ দুই ॥

চিকণ চিকণ গলা। সুরে বেসুরে মেশামেশি। তবু শিশুকণ্ঠের উচ্চারণে গানটা শুনতে আশ্চর্য লাগে। 'তাহার মাঝে আছে যে এক, সকল দেশের সেরা'। পুরো সুরে তালে গাইলে এদের গলায় যেন এ গানের আসল রূপটি ফুটতো না।

জয়তী নিজেও গুনগুন করছে। একই সময়ে তার তিনটি ইন্দ্রিয় তখন সজাগ।

চোখ জোড়া চারদিকে বুলিয়ে সকলকে নজরে রাখছে। হাই বেঞ্চের এখানে ওখানে কিছু ফাঁক কেন? কয়েকজন বুঝি আসে নি? মলির কাল জ্বর হয়েছিল। ও কি আজ—না, ওই তো। চোখ বুজে গাইছে আর মাঝে মাঝে পিটপিট করে দিদি-মণির দিকে তাকাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে হাসি, না গাইছে বলে ওটা কাজললতার মত এভাবে বেঁকে আছে?

চোখ জোড়া যখন খবরদারী করছে তখন সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয়তীও গাইছে—'সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'।

গাইছে বটে, কিন্তু মনটা তখন অস্পষ্টভাবে অতীতের স্মৃতি-মন্থনে ব্যস্ত। দাদার কথা মনে পড়ছে। ছেলেবেলায় মল্লিকদের মাঠে রোজ বিকেলে ক্লাবের খেলা শুরু হবার আগে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সকলে এ গান গাইতো। দিদি, সে, আসাদ, চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাটা বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। আহা! ওর কথা ভাবলে কান্না পায়। এ গান গাইতে গিয়ে দাদার চোখে জল আসতো। তাই দেখে দিদির আর দিদির দেখাদেখি জয়তীরও। আসাদটার

ওসব বালাই ছিল না। ও খেলাধূলোয় দড় কিন্তু গাইতে বললেই মুখ গোমড়া। দাদার শাসনে বাধ্য হয়ে সকলের সঙ্গে গলা মেশাত। দাদা প্রায়ই বলতো—বাংলা ভাষায় দেশপ্রেমের এমন গান আর নেই। রবি ঠাকুরের এই এক জায়গায় হার হয়েছে। পরে বড় হয়ে যখন এ কথার মানে বুঝতে শিখেছে, তখন দাদা আর নেই।

'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'।

জয়তীর চোখে জল আসছে। দাদার কথায়, না ছেলেবেলার সেই অভ্যাসের স্মৃতিতে? এ কি, শেষ সারির ছোট-হাসি একটু লাফিয়ে উঠেই ফিক্ করে হেসে ফেলল কেন? পাশের কেউ ওকে বোধহয় চিম্‌টি কেটেছে। অসহ্য। কে? একজন চোখ বুজে গদগদ হয়ে গান গাইছে, অন্যজন মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভয়ে ভয়ে জয়তীর দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় আগেরটা, কি নাম যেন ওর? না, এখন কিছু বলবে না।

'সে যে আমার জন্মভূমি'।

গান শেষ হল। নানা রকম শব্দ তুলে ধপ্‌ধপ্ করে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। সামনে কারোর ব্যাগ, কারোর বা বই-খাতার পাঁজা। দু-একজনের টিফিন বাক্সও আছে। ঘরের মধ্যিখান থেকে বেঞ্চি নড়ার কেমন একটা শব্দ আসছে। বেঞ্চিটার দু-দিক কি উঁচু নীচু? মেয়েরা বোধ হয় ইচ্ছে করে আওয়াজ করছে না। হয়তো করছে, কে জানে!

সব কিছুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জয়তী রেজিস্টার খাতা খুলল। দ্রুত রোল-কল করতে এখনও সে পারে না। নাম দেখে

দেখে সাবধানে উপস্থিত অনুপস্থিতের চিহ্ন দিতে হয়। নির্দিষ্ট ঘরের মাথায় আজকের তারিখ বসাতে হবে। তারিখ কতো? হঠাৎ যেন কিছুতেই মনে পড়ছে না। আগের ঘরের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হল। তাহলে আজ তিন, নয়, সাতান্ন।

বনশ্রী চৌধুরী?

ইয়েস স্যার।

খাতা থেকে মুখ তুলে জয়তী বলল, স্যার নয়। ইংরেজিতে মেয়েদের বলে ম্যাডাম। দিদিমনিদের, সিস্টার। কিন্তু আমার ক্লাসে উপস্থিত বলে উত্তর দিতে বলেছি না?

ভুলে যাই দিদিমণি।

আর ভুলো না, বোসো। জয়তীর মুখে হাসি কিন্তু গলায় গাম্ভীর্য—প্রতিমা রায়?

উপস্থিত।

মলি ব্যানার্জী?

উপস্থিত।

মালবিকা ধর?

আসে নি দিদিমণি। একসঙ্গে অনেকগুলো গলা চিৎকার করে বললো। একটু সুযোগ পেয়েই হল্লা করে উঠেছে। জয়তী বুঝলো আস্তে আস্তে তার মেজাজ চড়ছে। কিন্তু না। সে কিছুতে অন্য দশজন মিস্ট্রেসের সারিতে নিজেকে নামাবে না। চারুদি, হৈমদির মতো অকালে বুড়িয়ে যাওয়া জাত মাস্টারনি সুলভ খিটখিটে বা মারকুটে হবে না। কিন্তু আশ্চর্য, ওঁদের ক্লাসেই এরা শান্ত থাকে বেশি। ভালবাসার থেকে ভয়কে এদের

পছন্দ হল ? উঠে দাঁড়াল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, শোন, অঙ্কের রোল ডাকলে তার উত্তর দেবার দায়িত্ব তোমাদের নয়। কেউ না এলে আমি নিজেই তা বুঝতে পারবো। শেলী সেন ?

ইয়েস স্যার।

শেলী ? এদিকে এসো তো ? এসো ?

নিজের চেয়ারের পাশে এনে দাঁড় করাল। ক্লাসের সমস্ত মেয়ে তার মুখোমুখি। একটা হাত ধরল। ফর্সা, নরম, ছোট্ট। সোনালী রেঁায়ার মত পাতলা লোমের আভাষ। স্পষ্টই বুঝতে পারল মার খাওয়ার জন্য শেলী মনে মনে তৈরি হয়েছে। নিজেরও ইচ্ছে করছে একটা চড় কষাতে। কিন্তু এটা সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনের বাড়ি নয়—সে সম্পর্কে জয়তী সচেতন। হেসে জিজ্ঞেস করল, রোল ডাকলে কি বলে জবাব দিতে বলেছি ?

দিদিমণির হাসি-মুখ দেখে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে শেলী জবাব দিল, উপস্থিত।

স্পষ্ট করে বল যাতে সকলে শুনতে পায় ?

কাঁপা কাঁপা গলায় শেলী আবার বলল, উপস্থিত।

আর একটু হেসে জয়তী বলল, আবার বল।

শেলী কেঁদে ফেলল।

জয়তী মুখ শক্ত করে বলল, বল ?

কান্না ভেজা গলায় শেলী জবাব দিল, উপস্থিত।

যাও, গিয়ে বস। গান গাইবার সময় আর কোনদিন কাউকে চিমটি কেটো না।

ক্লাসটা নির্বাক হয়ে গেছে। সিক্সের মেয়ে। মোটামুটি বয়েস দশ থেকে চোদ্দ। জয়তীর শাস্তি দেবার ধরণটা সকলেই বুঝতে পেরেছে।

রোল কল শেষ হল। 'কিশলয়'খানা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে নির্দিষ্ট কবিতাটা বের করল। দেখাদেখি ছাত্রীরাও বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছে। অস্ফুট শব্দের একটা আশ্চর্য তরঙ্গ। সকলেই জানে কোন্ কবিতা পড়া হবে। কিন্তু পড়া হল না। বই মুড়ে টেবিলের ওপর রেখে জয়তী একটু হেসে বলল, আজ আর পড়াবো না। রোজ যে গান গেয়ে তোমরা স্কুলের কাজ আরম্ভ করো, সেই গানের গল্প বলবো। আচ্ছা, তোমরা যখন গান গাও—তখন তার মানে বোঝো?

হ্যাঁ—এ—এ। বিলম্বিত টানে সমস্বরে সকলে সায় দিয়ে উঠলো। আওয়াজটা ভারী মিষ্টি লাগল। ঠিক সেই সময়ে দূরে কোন ঘর থেকে যেন গানের সুর ভেসে এল। কার ক্লাস? কে দেরি করে এল? বনদি আজ এক হাত নেবেন। নিশ্চয়ই শর্বরী। মেয়েটা ভোরে উঠতে পারে না, আসেও দূর থেকে। আজ একটু বেশি দেরি করে ফেলেছে। চারুদি খুব খুশি হবেন বোধহয়। জঘন্য। জয়তী মনে মনে গাল দিল।

জানো, আমি যখন তোমাদের মতো ছোট আর তোমাদের থেকেও দুষ্ট ছিলাম—কয়েকজন ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেলল। তাদের দিকে তাকিয়ে জয়তী নিজেও হাসল। কিন্তু প্রশ্রয় পেয়েও এখন কেউ চেঁচামেচি করছে না। খুশি হয়ে গল্প শুরু করল।

তাদের সেই ক্লাব—হা-ডুডু, গোল্লাছুট, কানামাছি ভোঁ ভোঁ। খেলা আর মারামারি। আমি খুব গুণ্ডা ছিলাম, সকলকে হারিয়ে দিতাম। শুধু আসাদ বলে একটি ছেলে ছিল। তার সঙ্গে কিছুতেই পারতাম না। একদিন গোল্লাছুট খেলার সময় সে তো আমায়—বলতে বলতে অসহায়ের মত একটা প্রতিশব্দ খুঁজে, না পেয়ে, কথা শেষ করল—আমায় ল্যাং মেরে ফেলেই দিল।

ইস্স্। অস্ফুটে অনেকে আর্তনাদ করে উঠল। নানা ভঙ্গিতে বসে বড় বড় চোখে তন্ময় হয়ে ওরা জয়তীর গল্পে ডুবে গেছে।

হ্যাঁ। জয়তী হাসল! গল্প বলে সকলকে তন্ময় করেছে বটে, কিন্তু নিজে মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হচ্ছে না। পালা করে প্রত্যেকের মুখের ওপর চোখ রেখে তার গল্পের প্রভাব বুঝতে চাইছে। অথচ অন্য কোন মুহূর্তে সে এই স্মৃতি রোমন্থনে বুঁদ হয়ে যেতে পারতো। যেতে তার ভালো লাগতো। সে শক্ত মাটির ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ে, হাত পা ছড়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আর আসাদ আনন্দে লাফাচ্ছে। সে দিন রাগে দুঃখে একজনের মাথা ফাটাতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আজ আসাদের চরিত্র ভেবে হাসি পায়। স্নেহের, প্রশ্রয়ের। অথচ হাসতে পারবে না জয়তী। হাসলেও সময় বুঝে, মেপে হাসি বিলোতে হবে। কারণ তার সামনে ক্লাস সিক্সের ডানপিটে মেয়েরা। যাদের সে গল্প বলছে না, গপ্পো শোনাচ্ছে। এ বলা আর মানসাঙ্ক আবৃত্তি করায় তার কাছে কোন প্রভেদ নেই। কারণ তার ভালো লাগা, মন্দ লাগার ওপর কাহিনীর বলা না বলা নির্ভর করছে না। মাস্টারি জীবনের কি বিড়ম্বনা। ছাত্রীদের মন ভোলাবার জন্যে জীবনের পুঁজি নিয়ে

সাবধানে বাণিজ্যে নামতে হয়েছে। সাবধানে, কারণ পরকে ভোলাতে হবে অথচ নিজের মন ভুললে চলবে না।

আমাকে হোঁচট খেয়ে পড়তে দেখে আসাদ তো খুব খুশি। এদিকে আমার হাত পা কেটে রক্ত ঝরছে।

ইস্! আবার কয়েকজন অস্ফুট স্বগতোক্তি করল।

হঠাৎ মনে হল ল্যাংয়ের বদলে তখন তো ধাক্কা শব্দটা ব্যবহার করা যেত।

মুসলমান কিনা, তাই। হঠাৎ শেলী উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর থেকে ছোট বিনুনীটা পিঠের ওপব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তাই না দিদিমণি, ওরা এই রকম হয় না?

যন্ত্রণায় মুখ যেন নীল হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কোনরকমে প্রশ্ন করল, কেন, কে বলেছেন তোমায়?

আবার উঠে দাঁড়িয়ে শেলী বলল, কেন? মা বলেছে।

মা? জয়তী হাসার চেষ্টা করল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। শত চেষ্টাতেও মা'র পুরো চেহারাটা মনে আসছে না। শুধু একটা অস্পষ্ট কাঠামো চোখ ছুঁয়ে গেল। পাতা ঝরার সুরে জয়তী যেন নিজেকেই শোনাল: মা বলেছেন?

দিদিমণির মুখ দেখে তার কথা তিনি সমর্থন করলেন কিনা শেলী বুঝছে না। তাই নিজের বক্তব্যকে আরো জোরালো করার জন্য বলল, কেন? চারুদিদিমণিও তো একদিন ইতিহাসের ক্লাসে, ইয়ে, শিবাজীর রাজ্যজয় পড়াতে পড়াতে বললেন—মুসলমানরা গুণ্ডা হয়, মানুষ খুন কবে, নোংরা ভাবে থাকে। আমরা তো কত পরিষ্কাব, জাতে কত বড়।

ততক্ষণে জয়তীর শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়ে উঠেছে। একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা?

কেন? হিন্দু? শেলীর গলায় একটু যেন গর্ব, একটু বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল।

জয়তী হাসতে লাগল। তাকে হাসতে দেখে শেলী চটছে। কিছু মেয়ে অবাক হয়ে কারণ বুঝতে চাইছে। কিন্তু তার ছাত্রীদের মুখের দিকে জয়তী তাকাতে পারছে না। বিতৃষ্ণা না ভয় সে নিজেই জানে না। চোখ গিয়ে পড়ল পেছনের দেওয়ালের দিকে। অবাক হয়ে এই প্রথম সে দেখল পলেস্তারা খসে আর কালির ছিটে লেগে দেয়ালের বুকটা কেমন যেন ছবি হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে দেখলে মনে হয় সাপের ফণা, ওদিকটা যেন মাটির পুতুল। পুরোপুরি নয়, কিছুটা আদল আসে। মা! নিজের মায়ের চেহারাটা এইবার স্পষ্ট মনে পড়ছে। রুগ্ন, ক্লান্ত, পেটটা স্ফীত। দিদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটি কায়স্থের ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে ফেলছেন। কি আন্তরিক ভয় আব অকৃত্রিম বেদনা ভদ্রমহিলার। শেলী সেনের মার চেহারাও কি এমনই? না বোধ হয়। শেলী গোলগাল, মাথায় একটু খাটো। পরনের পোষাক দেখে মনে হয় বাবার টাকা আছে। আধুনিক শিক্ষা আর রুচি যে আছেই—তার প্রমাণ, শেলীর নাম। অথচ ও শিখেছে মুসলমানদের ঘৃণা করতে। শুধু বাড়িতে নয়, স্কুলে—ইতিহাস পড়ে। ভাবতবর্ষের ইতিহাস!

বোসো। জয়তী বলল। হিন্দু ধর্মের ঔদার্য, মুসলমানদের সত্য পরিচয় আর বিশ্বমানবতা বোধ সম্পর্কে কি সে একটা

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবে? উত্তেজিত মনটা তাই চাইছে বটে। কিন্তু তারপরের কয়েকটা অবশ্যম্ভাবী ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। চারুদি শুনবেন, বনদির কানে যাবে, টিচার্স রুমে এই নিয়ে কিছু উষ্ণ আলোচনা হবে। জয়তী মুখার্জী ঘুরিয়ে স্কুলের সিনিয়র টিচার চারুপ্রভা সেনকে অপমান করেছে। তার ফল ভবিষ্যতে অনেক দূরে গড়াতে পারে। বনদিকে সে চেনে। সুতরাং তা হবার নয়। যে মা আচার, সংস্কার আর অন্ধতার বেড়াজালে নিজেকে বন্দী রেখে প্রতি মুহূর্তে জয়তীর মনকে ক্ষতবিক্ষত করছেন, সেই মা আর তাঁর সংসারের অভাব মেটাবার জন্যই বিবেকের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত ভালবাসা আর ভালো-লাগার সম্মানবোধের বিরুদ্ধে জয়তীর পক্ষে কিছু বলার নেই। চুপ করে হেসে ব্যাপারটা সয়ে যেতে হবে। কারণ জীবনে টিঁকে থাকার জন্য অনেক অপমানই সহ্য করতে হয়।

কিন্তু ক্লাসের মেয়েরা জয়তীর মনোজগতে ঝড় বৃষ্টির খবর বোঝে না। হিন্দু মুসলমান তত্ত্ব নিয়েও তাদের মাথা-ব্যথা নেই। গল্প শুনতে চায় সকলে। অসহিষ্ণু হয়ে বনশ্রী প্রশ্ন করে বসল, তারপর কি হল দিদিমণি?

অ্যাঁ? চমকে উঠল। এক মুহূর্ত সময় লাগল কি গল্প বলছিল এবং কতোদূর এগিয়েছে তা ভাবতে। তারপর স্তিমিত গলায়, শূন্য দৃষ্টিতে সকলেব দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার যে দাদার কথা তোমাদের বলেছি, ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গান গাইতে গাইতে দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা ভেবে যিনি কাঁদতেন—যাঁর কথা

গোড়াতেই বললাম না, তিনি ছুটে এলেন। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে আসাদের নামে নালিশ করলাম। উল্টে দাদা আমার কান মুলে দিলেন। নালিশ করা আমাদের নিষেধ ছিল। ইচ্ছে হল এই প্রসঙ্গে একটা উপদেশ জুড়ে দেয়—তোমরাও কক্ষনো নালিশ করো না যেন। কিন্তু বলার উৎসাহ পেল না।

ততক্ষণে প্রথম সারিতে বসে শান্তশিষ্ট যে মেয়েটি, বয়েসেও ছোট—ফস্ করে প্রশ্ন করে বসল, ওমা। আপনিও ইয়ে খেয়েছেন? বড় হলে আপনার দাদা আর আপনাকে মারে না, না দিদিমণি?

প্রশ্ন শুনে আবার কয়েকটি মেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেলল। জয়তী একবার চিন্তা করল প্রশ্নটা শুনতে পায় নি এমন ভাব দেখাবে কিনা। কিন্তু মেয়েটির সরল কৌতূহলে ভরা চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে জবাব তাকে দিতেই হল। একটু থেমে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছে এমন ভাবে সে বলল, না। এমনিতেই দাদা আমাদের কখনো মারতেন না। তাছাড়া আমি বড় হবার আগেই আমার দাদা মারা গিয়েছিলেন।

সকলে চমকে উঠেই বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রশ্নের জবাবে শেষ কথাটা বলার প্রয়োজন ছিল না। তবু কেন যে বলল, তা জয়তীর কাছেও স্পষ্ট নয়। হয়তো সে নিজের মনকে আর একবার খবরটা শোনাচ্ছিল। হয়তো কতগুলি দুরন্ত মেয়ের কাছ থেকে কিছু সহানুভূতি আকর্ষণের ইচ্ছা অবচেতন মনে ছিল। কিন্তু সকলের বিমূঢ় বিস্ময়ের গভীরতা, বিস্ময় আর বেদনা দেখে সে নিজেই হতবাক হয়ে গেল। তখনই আবার মনে পড়ল। দশ বছর আগের মা। ঠাকুর দেবতা আর স্বামী পুত্র কন্যাকে নিয়ে

সংসার পেতেছেন। সহস্র অভাব অনটনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য দিন গুণছেন। সমর্থ শরীর, মন। সত্যি, মার জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই বোধহয় পূর্ণ হয় নি।

হঠাৎ মনে হল, মার দুর্বলতার জন্য যত বিতৃষ্ণাই থাকুক, এই মুহূর্তে নিজের মেয়ের মত মাকে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে। বুকটা টনটন করে উঠল। হায়রে স্বপ্ন! হায়রে সন্তান আর সংসারের মধ্য দিয়ে মানুষের বাঁচবার বাসনা। আঙুলের ভেতর আঙুল গলিয়ে হাতজোড়া সে বুকের ওপর রাখল! মানুষ বাঁচতে চায় কি নিয়ে? তার পুঁজি কতোটুকু। এই কচি কচি মেয়েগুলোও তো একদিন বড় হয়ে উঠবে। তারপর জীবনের যৌবনের সহজ নিয়মে এরাও তো একদিন সন্তান আর সংসারের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাইবে। মা হবে! মা! দু-হাতে নিজের বুক চেপে ধরল। কিন্তু আহ্। সেখানে মা নেই। দাদার মৃত্যু নেই। আছে আসাদ। লজ্জা, লজ্জা। এই মুহূর্তে নিজের প্রেমের জন্য জয়তীর মনে কোন গৌরববোধ নয়। জীবনের আর একটা ভয়ংকর দিক—ভয়ংকর আর মোহন অথচ বাস্তব—তার চোখে পড়েছে। সামনের দেয়ালের ছবিটা হঠাৎ পাল্টে গেল কেন? মার মূর্তির আদল আসছে কি ভাবে? স্কুল মিস্ট্রেস জয়তী মুখোপাধ্যায় তার চেয়ারে বসে যন্ত্রণায় দু-হাতে বুক চেপে ধরে আসাদের কথা চিন্তা করছে—সামনের দেয়াল থেকে তাই দেখেই কি মা মুখ টিপে এভাবে হাসছেন? মা যতো হাসছেন, বিল্টু ততো ডাকছে। কিন্তু কেন? কেন?

বিল্টু ডাকে নি। প্রথম সারির সেই ছোট্ট মেয়েটি। জয়তী

স্পষ্ট দেখল সে ডাকছে। তবু প্রকৃতিস্থ হতে কিছু সময় লাগল। সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। মাথা থেকে একটা উষ্ণ রক্তপ্রবাহ যেন দুই ঠোঁটের তীরে এসে জমা হয়েছে। উপচে ফেটে পড়তে চায়।

দিদিমণি? আপনার দাদার কি হয়েছিল?

প্রশ্নটা শুনে হৃদয়ঙ্গম কবতে কিছু সময় লাগল। তারপরই জয়ন্তী ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ইচ্ছে করল চিৎকার করে ধমক দিতে। কি ভেবেছে এরা? কিন্তু অন্তরঙ্গ হবার শিক্ষা তো সে-ই দিয়েছে। এখন ফেরার রাস্তা কোথায়? প্রশ্নটাও কিছু মারাত্মক নয়। দাদাব কি হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি মারা গেলেন কি ভাবে? কিন্তু কি জবাব দেবে? এই অপরিণত কয়েকটা মনকে কি উত্তর দেবে 'সে? জয়ন্তী কি বলবে তার দাদা রাজনীতি করতো। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার সময় শান্তির মিছিলের নেতৃত্ব নিয়ে সে গিয়েছিল কলকাতা শহরের নিষিদ্ধ এলাকায়। সেখান থেকে রক্তক্ষত বুকে মেডিকেল কলেজের শুভ্র বিছানায় তার জীবনের বাতিটুকু নিভে গেল। সে কি বলবে? শেলীর মার শিক্ষা, চারুদির ইতিহাস চেতনা কি তাহলে আরো বেশি সত্য হয়ে উঠবে না এদেব কাছে?

জয়ন্তী জানে তার দাদার মৃত্যু গৌরবের, মহত্বের। তবু আজ, আজ এখানে সত্য কথা সে বলতে পারবে না। কিন্তু কেন? মুসলমান জাতির ওপর এদের মিথ্যা ঘৃণা যদি বাড়েই, তা হলে তার এত লাগে কেন? আসাদ মুসলমান বলেই কি জয়ন্তীর যতো যন্ত্রণা?

না। টেবিলের ওপর চাপড় মারল। না। এখানে লজ্জা বা সংকোচের ছলেও আপোস নেই। সে জানে ধর্ম মিথ্যা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। সে জানে পৃথিবীর উদ্ভব কি ভাবে, দেবতার জন্ম কিসে। সে জানে বর্ণভেদ, জাতি বিদ্বেষের কারণ কি। তার চোখের আলোর মতই এ জ্ঞান সত্য, পরীক্ষিত সত্য। তাছাড়া ঐ ছেচল্লিশ সালেই আসাদদের বাড়ি পুড়তে দেখেছে। বাহান্ন সালে কাগজে পড়েছে মুসলমান নারীর ওপর হিন্দুদের অত্যাচারের বিবরণ। সে জানে এ মূঢ়তা কেন। তার জন্য একটা জাতি বা কয়েকটা মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দাদা আসাদের প্রেমে পড়েন নি। কিন্তু তিনিও এ কথাই বলতেন।

জয়তী হেঁয়ালী করে জবাব দিল, দাদার রোগ ছিল গরীব দুঃখী সব মানুষকে ভালবাসা। তাদের কাছ থেকেই তিনি অসুখ কুড়িয়ে আনেন।

যে যার মত বুঝে নিল। কেউ কেউ বোধহয় কিছুই বুঝল না। ফিসফিস করে কি কি সব বললো নিজেদের মধ্যে। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করল না। হয়তো দিদিমণির মুখ চেয়ে সাহস পেল না।

ঘণ্টা পড়ল।

রেজিষ্টারি খাতা আর 'কিশলয়'খানা হাতে তুলতে তুলতে জয়তী অনুভব করল তার শরীর-মন স্থির, শান্ত হয়ে গেছে। একটু বা বিষাদগ্রস্ত। কিছু আগের সেই বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের মতো মানসিক উত্তেজনা বা শারীরিক চাঞ্চল্য এখন নেই। কালির ছিটে-মাখা ভাঙা পলেস্তারায় তৈরি দেয়ালের ছবিটাকেও আর মায়ের মুখ বলে ভুল হচ্ছে না।

মনের কি জটিল গতি। শরীরটাও কি মন-নির্ভর? শরীর, মন, কিছুই বোধহয় স্থানকালপাত্র মানে না। না, পাত্র মানে। নিজের সম্পর্কেই জয়তীর আজ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!

কাল নজরুল ইসলামের কবিতাটা শেষ করবো। সকলের দিকে তাকিয়ে বিশেষভাবে কাউকেই উদ্দেশ্য না করে জয়তী বলল। তারপর একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, তিনিও একজন মুসলমান। কবিতাটা শেষ হলে তাঁর গল্প বলবো।

চারুদি কি রাগ করবেন? শেলির মা কি অভিভাবিকার চিঠি দেবেন বনদির কাছে? কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছু কেয়ার করে না। কাউকে না।

উঠে দাঁড়াল।

॥ তিন ॥

টিচার্স রুমটা দৈর্ঘে প্রস্থে সমান নয়। ঘরের দুই দেয়াল ঘেঁষে সারি বাঁধা অনেকগুলি ডেস্ক। সামনে একটা করে চেয়ার। কোন কোন ডেস্কে তালা ঝোলে, কোনটায় নয়। জয়তীর ডেস্কে কপাটের ছিটকিনিই নেই।

বাড়িতে জয়তীদের দুই বোনে মিলিয়ে একটি মাত্র ট্রাঙ্ক। স্কুলে নিজের আলাদা ডেস্ক পেয়ে প্রথমদিন তাই সে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। ঢালু কপাটের ওপর এক জায়গায় কাঠের চটা উঠে গিয়ে পেরেকের মুখ বেরিয়ে পড়েছে। অন্য এক দিকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আঁকাবাঁকা হরফে কোন এক মণিমালা সেনের নাম লেখা হয়েছে। অমরত্বের এই শিশুসুলভ আকাঙ্ক্ষা কোন প্রাপ্তবয়স্কা দিদিমণির কিনা, অনেক সংকোচ কাটিয়ে মাত্র কয়েক-দিন আগে চারুদিকে প্রশ্ন করে সে সম্পর্কে জয়তী নিঃসন্দেহ হয়েছে। মণিমালা সেন সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের টিচার। শুধু হৈমদিই তাঁকে দেখেছেন।

ভাঙা বাড়িতে ছোট স্কুল হলেও কতগুলি ওপর ওপর নিয়ম বা কেতা রক্ষার ব্যাপারে বনদি খুবই প্রখর। এই টিচার্স রুমের পরিকল্পনায়ই জয়তী তার প্রাথমিক পরিচয় পেয়েছে! দেয়ালে দু-একজন মনীষীর বিবর্ণ ছবি, একটা ইংরিজি বাংলা ক্যালেণ্ডার, অবিভক্ত বাংলার ম্যাপ। ওপর দিকের কালো কাঠের রড থেকে ম্যাপের আধখানা ছিঁড়ে ঝুলে আছে।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই হৈ হৈ করে সমস্ত মেয়েরা ক্লাস ছেড়ে

বেরিয়ে এল। সামনে একফালি মাঠ। ঠিক মাঠ নয়, কিছুটা যেন উঠোন। সদর দরজার বাইরে যাবার নিয়ম নেই। ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে কেউ কেউ সস্তা দামের খাবার কিনছে। আর সকলে যেমন-তেমন একটা খেলায় ব্যস্ত। স্বল্প উঠোন, সরু বারান্দা, ছোট ক্লাস ঘরে খেলা হয় না। তবু এরা কিছু একটা করতে পেরে খুশি, খুশি হয়ে খুশি। অভিযোগ নেই, কারণ অভাববোধ জাগার মতো দামালো মন কারোর নেই। আবার এর মধ্যেও বনদির খবরদারি আছে। হঠাৎ এক একটা দিকে কোলাহল স্তব্ধ হয়। আর, না দেখেও জয়তী বোঝে, হেডমিস্ট্রেস এখন কোথায়।

ক্লাস থ্রির তুটি মেয়েকে নিয়ে চারুদি টিচার্সরুমে ঢুকলেন। চৌকাঠের তুই মুখে, কানে হাত দিয়ে তুজনকে নীলডাউন করে রেখে চারুদি শকুন্তলার ডেস্কের ওপর আয়েস করে বসলেন। পেটি-কোটের শক্ত বাঁধনটা একটু আলগা করলেন। ব্লাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খানিক পিঠের একটা পাশ চুলকোলেন। তারপর খোঁপা ভেঙে চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তুড়ি বাজিয়ে হাই তুলতে তুলতে ডাকলেন, সোনার মা, বলি অ সোনার মা, কানের ইয়ে খেয়েছিস নাকি ?

সোনার মা ইস্কুলের ঝি। মাইনে সামান্য। ঘর ঝাঁট দেওয়া, মাস্টারনিদের ফুট ফরমায়েশ খাটা তার কাজ। তাছাড়া কয়েকটি মেয়েকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা আর পৌঁছে দেওয়ার দরুণ একটা উপ্‌রি রোজগারও আছে।

বেশি বয়েসে বিয়ে করে মাগী আক্কেলের মাথা খেয়েছে।

চারুদি সকলের দিকে এক পলক তাকিয়ে শকুন্তলার চোখে চোখ রেখে কথা শেষ করলেন।

মুখের রেখায় বিরক্তি অথচ মন্তব্যের শেষে হাসি। যেন সোনার মা ডাক না শুনে এমন একটা রসিকতার সুযোগ দেওয়ায় তিনি খুশি। কিন্তু পরিষ্কার দেওয়ালে পানের পিক্ ফেলতে দেখলে যেমন হয়, তেমনি চারুদির এই হাসিটাকে জয়তীর বেজায় অশ্লীল মনে হল। অবাক হয়ে ভাবল, কথা নয়—হাসিটাই বেশি নোংরা।

সোনার মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চারুদির মন্তব্য শুনতে পেয়েছে। চারুদির চোখও তা এড়ায় নি। কিন্তু তুজনেরই কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চাবির গোছা ছুঁড়ে দিয়ে চারুদি বললেন, দে।

সোনার মা সিনিয়ার টিচার চারুপ্রভা সেনের ডেস্কের তালা খুলে টিফিন বক্সটা বের করল। এলুমিনিয়ামের বাক্স, কালো ছোপ ধরেছে। আঁচলে একবার হাত ঘষে চারুদি হাত ধোবার দায় সারলেন। একখানা রুটি আর বেগুন ভাজা পাটিসাপ্টা পিঠের মতো পাকিয়ে আধাআধি মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বললেন, জল।

কথাটা মোটেই শোনা গেল না, কিন্তু সকলে বুঝল। সোনার মা জল এনে দিল। একবার গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে এক চুমুক জল কুলকুচো করে গিলে চারুদি ঢেঁকুর তুললেন। তারপর বললেন, বুঝলি জয়তী, আমাদের গুষ্টিসুদ্ধ সকলেই বেগুন খেতে ভালবাসে। আমারও তাই—

জয়তী হাসল। কারণ এ অবস্থায় হাসতে হয়। আর-একদিনের

কথাও মনে পড়ল। আশ্চর্য! কুমড়ো বা বেগুন ছাড়া অন্য তরকারী না জোটার দৈন্যকে এ ভাবে চাপা দেওয়ার মতো মধ্যবিত্ত মনের সূক্ষ্মতা এখনও চারুদির আছে? জয়তী অবাক হল।

অবাক প্রথম দিনও হয়েছিল, যেদিন তার মাস্টারি জীবনের শুরু। মা সঙ্গে টিফিন দিয়েছেন। জোর করে দিয়েছেন। কিন্তু একঘর সহকর্মীর মধ্যে বসে কি ভাবে খাবে, এ দুশ্চিন্তা জয়তীর ছিল। অথচ টিফিন পিরিয়ডে দেখল এ ব্যাপারে টিচার্স কমন্ রুম আশ্চর্য নির্বিকার। কেউ খাচ্ছেন, কেউ দেখছেন। অথচ খাওয়ার গল্পেই প্রত্যেকে মুখর। তাই ক্লাস থ্রির দুটি ছাত্রী লোভীর মত দিদিমণিদের খাওয়া দেখছে, এ দৃশ্য এখন আর স্কুল মিস্ট্রেস জয়তী মুখোপাধ্যায়কে বিচলিত করে না।

এই, আজ না মাইনে পাবি? সিনেমা দেখাতে হবে কিন্তু। শর্ব্বরী জয়তীর খোঁপা টেনে খুলে দিয়ে বলল, বুঝলি?

জয়তী খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ।

শর্বরীটা আশ্চর্য। হেসে বলল, কি বই দেখবি?

অপরাজিত।

আবার?

মাথার চুলে টান দিয়ে শর্বরী বলল, হুঁ।

আর জয়তী দেখল হৈমদি তার পিঠ বোঝাই চুলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বুক কেঁপে উঠল। কি দেখছেন হৈমদি, তাঁর অতীত? বুক কেঁপে উঠল। কি দেখছে জয়তী, তার ভবিষ্যৎ?

অতীত আর ভবিষ্যৎ। স্কুল মিস্ট্রেস জয়তী মুখোপাধ্যায়ের

অতীত কি ? ব্যঙ্গ করে নিজেকে এই প্রশ্ন করল। কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্তীর অতীত 'মিস্ট্রেস' শব্দটি জুড়ে অন্য ভাবে আবর্তিত হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায় টিচার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল ভয়ের। ভয়ের আর শ্রদ্ধার আর ভাসাভাসা। যখন বড় হয়েছে, যখন নাইন-টেনের ছাত্রী—তখন তাতে কিছুটা কৌতুক, কিছুটা বা কৌতূহল আর অশ্রদ্ধা অথচ শ্রদ্ধা করার সজাগ চেষ্টা মিশেছে। এবং তখনও তা ভাসাভাসা। ক্লাস ঘরের বাইরে দিদিমণিদের চেহারা কি, টিচার্স রুমের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কি তাঁদের পরিচয়—সে সম্পর্কে জয়ন্তীর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

তাই সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হয়ে যেদিন সে প্রথম এই দৈর্ঘে প্রস্থে অসমান ঘরটার শরিক হল, সেদিন তার মনে কৌতূহল, সংশয় আর ভীতিই শুধু না, সেই সঙ্গে কিছুটা হীনমন্যতাবোধও যেন ছিল। কারণ নতুন এক জগতে এসে দাঁড়িয়েছে—যাঁদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এ যাবৎ শ্রদ্ধার হলেও সম্পর্কিত মনোভাবটি যথার্থ শ্রদ্ধেয় নয়। তাছাড়া সে নিজে এখনও, হ্যাঁ এখনও, ছাত্রী। সুতরাং টিচার হিসেবে একটা ডেস্ক অধিকার করলেও নিজের মধ্যে অনভিজ্ঞ শিক্ষিকা আর ভীরু ছাত্রীর দ্বৈত মনোভাব কিছুদিন প্রশ্রয় পেয়েছে। তখন দূর থেকে দেখেছে তার মার সমান, দিদির বয়েসী অথবা বন্ধু হবার উপযুক্ত অন্যান্য সহকর্মীদের। চারুদি, হৈমদি, শর্বরী, শকুন্তলা এবং আরো কয়েকজন—যাঁরা এই সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের এতগুলি ছাত্রীকে বিকশিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

টিফিনে বা ছুটির পর টিচার্স রুমে এই দিদিমণিদেরই তুচ্ছ

আলাপ, মামুলী রসিকতা তাকে বিস্মিত, বিচলিত, মর্মাহত করেছে। চিবকাল যাঁদের দূর থেকে দেখেছে, যাঁদের ভয় আর শ্রদ্ধা করতে শিখেছে—অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তাঁদের মানসিকতার এই নতুন উদঘাটন জয়তীর কাছে মর্মান্তিক।

কিন্তু নিজেই জানে না, কি ভাবে মূক দর্শক বা নীরব সমালোচকেব ভূমিকা ছেড়ে ক্রমে সে এঁদেরই সঙ্গে সরব আর মুখর হয়ে উঠেছে। চারুদির ঠাট্টা, হৈমদিব প্রশ্রয় বা শর্বরীর সমবেদনা ছিল বাস্তব প্রেরণা। কিন্তু অচিরেই তাকে বুঝতে হয়েছে কোন ভাবে সমাজচ্যুত হলে চলবে না। বিতৃষ্ণা বা ঔদাসীন্যে জয়তী সরে থাকলেও সূর্যের চাবপাশে পৃথিবী ঠিকই ঘুরবে।

তাই নিয়মবক্ষার জন্য যা শুরু, অভ্যাসের পরিণতিতে তার শেষ। তাই মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কমনরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বের আর এক পরিচয় জয়তী পায়। আগের মত নিজের মনে তৈরি ব্যবধান বা লঘুগুরু সম্পর্কের মূল্যহীন চিন্তা নয়। অন্যতম টিচার হিসেবে আজ সেও সমানে চারুদি, হৈমদি, শকুন্তলা এবং শর্বরীর সঙ্গে প্রতিটি আলোচনার অংশদার। শুধু যে কথার পিঠে কথা, তা নয়। কোন এক সচেতন মুহূর্তে জয়তী বহুদিন আবিষ্কার করেছে এই তুচ্ছ, তুচ্ছ আব রুচিহীন আলোচনা তার এতক্ষণ তেমন অনুপভোগ্য মনে হয় নি।

তখন জয়তী অবাক হয়েছে, এ কথা সত্যি। কিন্তু বড় জোর ঐ বিস্ময়। তার লজ্জা করেছে কি করে নি। কান্না পেয়েছে কি পায় নি। কারণ সে জানে জীবন নিয়ম মেনে চলে আর টিঁকে থাকতে গেলে কিছুটা আপোস করতেই হয়।

ক্লাস থ্রির সেই মেয়ে দুটির চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। ঘাড় গুঁজে জামার হাতায় তারা মুখ মুছছে। প্রতিবাদ নেই, কারণ এরাও জানে প্রতিবাদ করতে নেই। অনুনয় নয়, কারণ জানে তাতে ফল হবে না। কিন্তু ঐ চোখের জলের ফোঁটায় জয়তী নিজের স্কুল জীবনের ছায়া দেখছে। সেও কি একদিন মনে মনে অক্ষম কান্নায় ভেঙে পড়ে নানা অবিচারের জন্য দিদিমণিদের অভিশাপ দেয় নি? একেই কি বলে ইতিহাসের পুনরাবর্তন? এবং সে, জয়তী মুখোপাধ্যায় কি তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিচিত্র স্বাদ এইভাবে লাভ করবে, তা জানতো? অবাক হয়ে তাকাল।

কিন্তু হৈমদি এখনও তাকে দেখছেন কেন? জয়তীর অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তি আর ভয়। কিসের ভয়, কেন, তা জানে না। ঠিক ভয় নয়, কিছুটা বা লজ্জা। কিন্তু এই লজ্জার কারণ কি? মমতা? করুণা?

নিজের স্পর্ধায় অবাক হয়ে গেল। একটা মানুষকে করুণা করার চিন্তা তার মনে এল কি ভাবে? আহ্, কি ভাবে?

এ কথা সত্যি হৈমদির বয়েস হয়েছে। বুঝি এ বয়েসে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী না হয়ে ওঁকে করপোরেশনের দাইয়ের সাজে মানাতো ভালো। আশ্চর্য! এই দুই পেশায় কি কোন মিল খুঁজে পেয়েছে জয়তী? নইলে এমন কথা মনে এল কেন? কিন্তু না। বরং চারুদিকে ঘিরে সে কল্পনা করা যায়। চারুদির মোটাসোটা, আত্ম-তৃপ্ত শরীরের সঙ্গে কিছুটা যেন করপোরেশনের বিশেষ ছাপ-মারা রিক্শার গদিতে অলস ভঙ্গীতে বসা ধাত্রী চেহারার মিল আছে।

হৈমদিকে টিপিকাল স্কুল মিস্ট্রেস বলে এক পলকে চিনে নেওয়া যায়। শীর্ণ আর রুগ্ন আর ক্লান্ত। কপাল এবং হাতের ওপর কতগুলো শিরা সব সময় কুঁকড়ে ফুলে থাকে। মাথার চুল উঠে আসছে, চোখের তলায় কালি। চিবুকের হাড় আর কণ্ঠা বড্ড বেশি প্রকট। কপালে, নাকের দু-পাশে বয়েসের ভাঁজ পড়েছে। সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন নেই। বিধবা না কুমারী, সাদা শাড়ির এক আঙুল চওড়া কালো পাড় দেখে তা বুঝবার উপায় নেই।

হৈমদির বসার ভঙ্গীতেও তাঁর শরীরের মতো ক্লান্তি। যেন ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় জীর্ণ এই দেহটা, জীর্ণ আর তুচ্ছ এই শরীর তিনি বইতে পারছেন না। যেন একটু সুযোগ পেলেই খানিক ঘুমিয়ে নেবেন। অথচ জয়তী জানে, ওঁর ইন্‌সম্‌নিয়া রোগ।

এ জাতীয় চেহারার বয়েস বোঝা সহজ নয়। চারুদি একটা সংখ্যা বলেন বটে। কিন্তু জয়তীর বিশ্বাস হয় না। এত কম বয়েস হৈমদিব কি করে হবে? তিনি সুহাসিনীতেই দীর্ঘকাল চাকরি করছেন। এ চারুদির রাগের কথা।

নিজের বয়েস কমিয়ে অন্যেরটা কিছু বাড়িয়ে বলার স্বভাব মেয়েদের আছে। কিন্তু হৈমদির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কারণ জয়তী বোঝে। এতো অল্প বয়েসে হৈমদির যৌবন গেছে, রূপ তো ছিলই না—এ কথা বুঝিয়ে চারুদি তৃপ্তি পান। নিজের মেদবহুল শরীর, কালো মাথা আর সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া চওড়া একটা কপাল সম্পর্কে চারুদি সচেতন।

অথচ ওঁর দুর্ভাগ্যের কথাও তো সে হৈমদির মুখেই শুনেছে।

ছিটগ্রস্ত স্বামী আর গুটিকয়েক ছেলেপুলে নিয়ে মাঝারি একটা সংসার নিজের স্বল্প আয়ে তাঁকেই চালাতে হয়। স্ত্রী এবং মা হওয়ার জ্বালা যে কত, নিজের মাকে দেখে জয়ন্তী তা বুঝেছে। আবার সেই একই ব্যক্তিকে যদি উপার্জনও করতে হয়, তা হলে তাঁর জীবন কত কঠোর, জয়ন্তী তা অনুমান করতে পারে।

কিন্তু অনুমানের অবকাশ চারুদি বা হৈমদি রাখেন নি। নিজের কথা সামান্য বলে অন্যের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এতখানি মুখরতা, তায় গোপনে, জয়ন্তীকে অবাক করেছিল। দুজনের কাছেই তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল—খবরের সূত্র সে কোনদিন ভাঙবে না। ফলে দিন সাতেকের মধ্যে দুটি মানুষকে তার বোঝা হয়ে গিয়েছিল।

চারুদি যতো মুখ-আলগা, হৈমদি তত চাপা। চারুদি যেমন খোলাখুলি হৈমদির নিন্দে, তাঁর বয়েস নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন—হৈমদি তেমন সরাসরি কিছু বলেন নি। চারুদির স্বামী পাগল, এই কথাটার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। আর পাগল হবার পর ওঁদের সন্তান সংখ্যা শূন্য থেকে ছয়ে পৌঁছেচে—এই কথাটুকু হৈমদি আশ্চর্য সুরে বলেছিলেন। ঠোঁটের কোণে এক পলক হাসি ফুটেছিল, যা দেখে করুণা বা বেদনা বলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জয়ন্তীর সতর্ক চোখ ভুল করে নি। চেহারায় বা চরিত্রে আশ্চর্য বৈপরীত্য থাকলেও স্বভাবের এই একটা জায়গায় সে দুজনের মিল খুঁজে পেয়েছে। যদিও প্রথমদিকে ওপর ওপর গরমিলটাই তাকে অবাক করতো বেশি।

অবাক হয়েছিল, যেদিন প্রথম জানতে পারল চারুদি আর

হৈমদির মধ্যে কয়েক বছর কথা বন্ধ। শর্বরীর মতে দেড় বছর, শকুন্তলা বলে তিন। পাশাপাশি ডেস্ক, এক স্কুলে চাকরি করেন, একই ক্লাসে হয়তো পরপর পড়িয়ে আসেন—কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। অথচ তুজনেরই বয়েস কম-বেশি চল্লিশের কাছে। তুজনেই সুহাসিনীর সিনিয়ার টিচার। নতুন মাস্টারনিদের জড়িয়ে তুজনেরই মনে সন্দেহ, ভয় আর বিরক্তির সীমা নেই।

নতুন যারা আসে, তাদের পুঁজি অনেক। যৌবন। অধ্যবসায়। নিষ্ঠা এবং উৎসাহ। বাইরে থেকে শিক্ষকতার জীবিকা সম্পর্কে একটা আশ্চর্য আদর্শবাদ আর সম্ভ্রমবোধ নিয়ে ঢোকে। সেই সঙ্গে কাঁচা একটি মন—যা শিক্ষা-রীতির সংকীর্ণতা, বৈচিত্র্যহীন পরিশ্রম বা স্বল্প উপার্জনের শুকনো হাওয়ায় কুঁকড়ে যায় নি। তাছাড়া ক্রমশঃই শিক্ষা দপ্তরের আইনে মাস্টারি পদে যোগ্যতার মাপকাঠি বাড়ছে। ফলে সিনিয়ার টিচারদের থেকে নতুন শিক্ষয়িত্রীদের ডিগ্রীর ওজন প্রায়ই এক আধ সের বেশি।

তাই চারুদি, হৈমদি ভয় পান। হিংসে করেন। নতুন দিদিমণিরা তাদের সুন্দর মুখ আর আধুনিক বাচন ভঙ্গিমায় ছাত্রীদের হৃদয় জয় করে নেবে। এই বাচ্চা মেয়েগুলো রূপ, গুণের কাঙাল—কে না জানে? তাঁরা পুরনো হয়ে গেছেন, এবার বাতিলের পর্যায়ে পড়বেন।

শর্বরী বা শকুন্তলার মত জয়তীর রূপ নেই। বয়েস কম। তা ছাড়া এখনো কলেজের ছাত্রী। তাই হৈমদি বা চারুদি কি ভাবে যেন জয়তীকে নিজেদেরই একজন ভেবে নিয়েছেন। স্বাভাবিক সংকোচে বা ছাত্রীসুলভ হীনমন্যতায় সে কম কথা বলে। মন

দিয়ে অন্যের বক্তব্য শোনে। চোখে মুখে এমন একটা নিরীহ ভাব রাখে, যাতে অন্যে একথা ভেবে তৃপ্তি পান যে সে এই সিনিয়ার টিচারদের পাশে বসলেও ঠিক সহকর্মী নয়। তাই এঁদের সমস্ত আক্ষেপ, সমস্ত যন্ত্রণা, কুৎসা আর পরিহাসের নিরবচ্ছিন্ন শ্রোতা জয়তীই।

প্রথম প্রথম ভয় করত। চারুদিকে, হৈমদিকে, নিজেকে। তারপর ঘৃণা। ভয় আর ঘৃণা। এই কি শিক্ষকতার সম্মানীয় জীবিকা? এঁদের হাতেই কি ভবিষ্যৎ মানবসমাজ বেড়ে উঠবে? তার এতো স্বপ্ন, সাধ, যুক্তি কি এই চারুদি, হৈমদিরই মত নদীর গতিতে শুরু হয়ে খালের সীমাবদ্ধতায় বাঁক নেবে? প্রথম প্রথম ভয় করত। চারুদিকে, হৈমদিকে, নিজেকে। তারপর ঘৃণা। ভয় আর ঘৃণা। এখন যেন সমবেদনার নতুন চড়া উঠছে।· চারুদি, হৈমদির সমস্ত যন্ত্রণা সে অনুভব করতে পারে। কারণ বোঝে। তাই রাগ সাজে না, ঘৃণাও না। ওঁরা তাকে ছেলেমানুষ ভাবেন। কিন্তু সময় সময় তারই এই সিনিয়ার টিচারদের শিশুর মতো অসহায় আর করুণ মনে হয়।

কিন্তু শকুন্তলা এমন হয়ে উঠল কেন? রূপ আছে, গুণ আছে। বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছিল। চারুদি বা হৈমদির মত মাস্টারি জীবনের দীর্ঘপথ বালি ভেঙে এগোতে হয় নি। তাছাড়া স্কুলের বাইরেও একটা আস্তো স্বামীকে নিয়ে ওর নিটোল সংসার। অথচ এরই মধ্যে সে কেমন অক্লেশে একজনের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে আবার দুজনের ভেতর মধ্যস্থ হবার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে।

কালকের সেই অসতর্ক মন্তব্যটা কি শকুন্তলা হৈমদিকে শুনিয়ে দিয়েছে? তাই কি হৈমদি এভাবে—লজ্জায় গা কাঁটা দিল। হয়তো জয়তীকেই তুজন কিছুটা বিশ্বাস করে স্বস্তি পেতেন। তার নিজের কোন ক্ষতি না হলেও তুটি প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর বিশ্বাসের ছোট্ট জায়গাটুকু ভেঙে দিতে মমতা হয়। এরপরও চারুদি আর হৈমদি ডেকে সব কথাই বলবেন। কারণ না বলে তাঁরা পারবেন না। কিন্তু আর বিশ্বাস করবেন না। হাসিমুখে গোপন কুৎসা শোনাই কুশ্রী। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসেব প্রশ্ন না থাকলেও যদি সেই কুৎসা শুনতে হয়, তবে তার মত অশ্লীলতা আর কি আছে? চারুদি, হৈমদির চোখে তখন শকুন্তলা বা জয়তীর কোন তফাৎ থাকবে না। জয়তীকে যথার্থ সহকর্মী হিসেবেও সহজে স্বীকার করতে পারবেন না। তখন ওঁদের চোখে তার কি পরিচয় নির্দিষ্ট হবে? নিছক গোপন আলোচনার সঙ্গী?

নিজেকে ধিক্কার দিল। সমস্ত পরিবেশটা ভয়াবহ মনে হচ্ছে। কি দেখছেন হৈমদি, তাঁব অতীত? কি দেখছে জয়তী, তার ভবিষ্যৎ?

ইচ্ছে হল চিৎকার করে ওঠে। আর আহ্। ইচ্ছে হল চিৎকার করে ওঠে। না। এভাবে বেঁচে থাকতে সে চায় না, সে পারবে না। মনের এই দৈন্য, পরিবেশের এই গ্লানি আর জীবনের এই পঙ্গুতা নিয়ে দিন যাপনের কোন অর্থ হয় না। মানুষ বাঁচে কেন? চারুদি, হৈমদি, শকুন্তলা বাঁচেন কেন? জয়তী কেন বাঁচবে?

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। শুনতে পেয়েছে কিন্তু যেন বুঝতে

পারে নি। কিংবা বুঝেছে, কিন্তু এখুনি যে ক্লাসে যেতে হবে—সে চৈতন্য তার লোপ পেয়েছে। স্থাণুর মত বসে দেখল হঠাৎ টিচার্স রুমটা কেমন গম্ভীর এবং কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অবসর সময়টা এক একদিন এক এক প্রসঙ্গের আলোচনায় জমে ওঠে। দেশের রাজনীতি, কোন বিশেষ ক্লাসের বিশেষ একটি ছাত্রী, উনি অর্থাৎ বনদি অথবা অন্য যা হোক কিছু। কিন্তু অনিবার্যভাবে ঘুরে ফিরে তার শেষ হয় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার ব্যাখ্যায়। অথচ ঘণ্টা পড়লেই টিচার্স রুমটা কেমন বদলে যায়। কেমন গম্ভীর আর কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বাইরের গোলমালও কমে গেছে।

ক্লাস থ্রির মেয়ে দুটো চারুদির পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। ভালো করে চোখ মুছে কান্নার চিহ্ন ইতিমধ্যে মুছে ফেলেছে। হৈমদিও ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি একটা বই খুঁজছেন। ঠিক এই ভঙ্গীতে পেছন থেকে দেখলে হৈমদিকে টিচার ছাড়া অন্য কিছু মনে হবার নয়। দাইয়ের পোশাক ওঁকে মানাবে না। পাড়ার দাই গোপালের মাকে সে দেখেছে। ওর হাতেই নাকি জয়তীর জন্ম। গোপালের মার গোপাল নামে কোন ছেলে নেই। মার ছেলে হবে। আশ্চর্য। ছেলে না মেয়ে? আশ্চর্য। মার সন্তান-সম্ভাবনা এই মুহূর্তে তাকে এমন রোমাঞ্চিত করছে কেন? মা, তার একটা আস্ত মা আছে। চারুদিও মা। হৈমদিও মা হতে পারতেন। একদিন জয়তীও মা হবে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনের চোরটি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। এই তো জয়তী মুখোপাধ্যায়। এই

তো তার স্বপ্ন, সাধ, যুক্তি। কি লজ্জা, কি গৌরব। লজ্জা আর গৌরব, অথচ ঘৃণা। ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা। আহ্। অস্থির আবেগে ডান হাতটা ঝেড়ে যেন মন থেকে সমস্ত রং, সমস্ত বিষ ঝেঁটিয়ে ফেলতে চাইল।

ততক্ষণে বনদি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন। আর সেই মুহূর্তে জয়তীর মনে পড়েছে ক্লাসে যেতে হবে। স্কুল মিস্টেস জয়তী মুখোপাধ্যায় চকিতে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আশ্চর্য! মা আর বনদিতে কতো তফাৎ। জয়তী কি এক লহমা আগেও জানতো তাদের হেডমিস্ট্রেসকে সে এতো শ্রদ্ধা করে!

॥ চার ॥

হেডমিস্ট্রেসের ঘর।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বনদির টেবিল। বনেদী ছাঁদে মোটামুটি দাম আর রুচির পরিচয় আছে। বহুকাল রং পড়ে নি। বোধ হয় কেনার পর কোনদিনই না। ওপরে রেক্সিনের আস্তরটা কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। দোয়াতদানি, কলম, কালির ছাপমারা ব্লটিং। লাল, কালো ছাপ পড়ে কেমন একটা দুর্বোধ্য ছবি হয়ে উঠেছে। ব্লটিং এর ছাপ দেখে কি লেখা হয়েছিল বোঝা গেলে হয়তো হেডমিস্টেস বনদির অন্তরঙ্গ মনের পরিচয় জয়তী পেত। একটা বড় কড়ি কাগজচাপার কাজ করছে। রংচটা কলিং বেল। এখন আর বাজে না। কিছু বই আর ফাইল, সুন্দর করে গোছানো।

নিজে যেখানে পড়েছে, সেই স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের ঘরখানা মনে পড়ল। খুঁটিনাটি স্মরণ নেই। কিন্তু অস্পষ্ট একটা স্মৃতি কেমন স্পষ্ট হয়ে চোখে ভাসছে। কতো বড় আর ঝকঝকে আর সাজানো। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয় গরীব। তবু বনদির ঘরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। গম্ভীর।

এক কোণে কেরাণী রাধাচরণের টেবিল। মাঝ বয়েসি বোকা বোকা লোকটা। বোকা অথচ স্মার্ট। অন্ততঃ হতে চেষ্টা করে।

ওর টেবিলটা ছোট। তাতে অনেক ফাইল, অনেক কাগজপত্র। একটা কাগজের বাক্সে কয়েকটা রাবার স্ট্যাম্প। স্ট্যাম্প প্যাড। কাঠের চাকতির ওপর পেতলের শলা দিয়ে তৈরী চিঠি রাখবার

ফাইলে কিছু চিঠি, বিল আর টুকরো কাগজ গাদাগাদি করে বেঁধানো। টেবিলটা ছোট হলেও ওজনে ভারী। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের হিসাব-পত্র বয়ে কেমন গুরুগম্ভীর।

হঠাৎ মনে হল পদমর্যাদার ওজনে শুধু মানুষের চেহারার ভারই বাড়ে না, নিষ্প্রাণ পদার্থও গুরুত্ব পায়। তাই বনদির অনুপস্থিতিতেও তাঁর চেয়ারে কেউ বসে না। হেডমিস্ট্রেসের মতো এই কাঠের আসনটিও সকলের সম্মান পায়। রাধাচরণের টেবিল আর তার বাড়ির টেবিলে প্রভেদ কোথায় ? অথচ নিজের কাছেই এ দুয়ের তফাৎ কতোখানি। টাকার হিসেব বা হিসেবের টাকা থাকে বলে বস্তুটির গুরুত্ব কিছু কম না। এই দপ্তর সামনে নিয়ে মানুষটা যখন থমথমে মুখে বসে থাকে, তখন জয়ন্তীর হাসি পায়। টেবিলটাকে দেখলে ভয় করে কিন্তু মানুষটিকে দেখলে হাসি পায়।

রাধাচরণ বনদিকে ভয় করে। তাঁর উপস্থিতিতে কখনো কারোর দিকে চোখ তুলে কথা বলে না। অথচ ঘরে কোন মিস্ট্রেস ঢুকলে তার বসার ভঙ্গী, ঘাড় গুঁজে কাজ করার মনযোগ, তার নীরব উপস্থিতি যে একেবারে উপেক্ষিত হয় না— সে চেতনাটুকুও আছে।

দিন কয়েক আগে শর্বরী ওকে ধরেছিল। বনদি চলে গেছেন, কিন্তু রাধাচরণের হিসেব তখনও শেষ হয় নি।

চিঠিটা কি গেছে ?

প্রশ্ন শুনে লোকটা যেন ঘামিয়ে উঠেছে। একটু ইতঃস্তত করে মুখ তুলে বলল, ঠিক জানি না।

জানেন না কি রকম? শর্বরীর মুখে চোখে বিরক্তি, বলবেন না তাই বলুন?

না। রাধাচরণ অল্প হেসে জবাব দিল। আর সেই হাসিটা সত্যিই যেন ওর টেবিল, কাজ বা কাজ করার ভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না। একটু থেমে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, একমাস চাকরিতে ঢুকেছি। এ সব ব্যাপারে আমাকে অনুগ্রহ করে জড়াবেন না।

অ। তীব্র বিদ্রূপে হেসে শর্বরী বলল, তবে একটু ভুল করেছেন। আপনাকে কোন ব্যাপারেই জড়ানো হয় নি। শুধু একটা ইনফর্মেশান চেয়েছিলাম। কারণ স্কুলের কেরাণী আর হেড-মিস্ট্রেসের পি. এ. আপনি। শেষ কথাটা কেটে কেটে বলেছিল।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন রাধাচরণের সমস্ত স্মার্টনেস এবং গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে গেল। করুণ হেসে বলল, অপমান করছেন? আমার—

বাধা দিয়ে শর্বরী বলল, না। রুচি নেই। চলে এল।

সেদিন জয়তীর মনে হয়েছে এই সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে শর্বরীকে মানায় না। চারুদিকে মানায়, হৈমদি আর শকুন্তলাকে মানায়। তাকেও মানাবে, কারণ নিজেকে জয়তী ভাঙতে জানে। কিন্তু শর্বরী এখানে নির্বাসিত।

রাজনীতি করা মেয়ে। পৃথিবীটাকে বদলাতে চায়। প্রকাশদারাও চান। কিন্তু তবু শর্বরীর সঙ্গে প্রকাশদার মতে মিল নেই। এম. এ. পরীক্ষা দেয় নি। অন্য একটা স্কুলে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে, ছাড়তে বাধ্য হয়ে, আজ বছরখানেক হল সুহাসিনীতে ঢুকেছে। তারপর থেকে বনদিকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে স্কুল

বাড়াতে হবে। ভাঙ্গা বাড়ি, ছাত্রীদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, লাইব্রেরী না থাকার মত, মিস্ট্রেসদের মাইনে কম।

বনদি বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, ভেবে দেখবেন। শর্বরী অন্যান্য সহকর্মীদের উত্তেজিত করেছে। সে খবর পেয়ে বনদি প্রত্যেককে ডেকে বলে দিয়েছেন, এ চিন্তা গভর্ণিং বডির, মিস্ট্রেসদের নয়। মুখ নীচু করে সকলে হেডমিস্ট্রেসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

বুঝলি? সুহাসিনী যদি হাই স্কুল হয়, তা হলে বনদির আর হেডমিস্ট্রেস থাকা চলে না। ওঁর নাকি এ বয়েসে নতুন করে বি. টি. পড়ার মেজাজ নেই। হৈমদিই তো বললেন। এক ভদ্র-মহিলা নিজের স্বার্থ আর ইগোর জন্য এতগুলো মেয়ের সর্বনাশ করছেন। অন্যান্য মাস্টারনিগুলোকে এতো করে বোঝালাম, কিন্তু কারোর সাহস নেই। বনদির আপত্তির কারণ নিয়ে আড়ালে তামাসা করবে অথচ সামনে কিছু বলবে না। এরা নিজেদের ভাল বোঝে না।

শর্বরীর ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা দেখে প্রকাশদাকে মনে পড়েছিল। ক্যান্টিনের মালিকানা বদলাবার দাবীতে সেদিন স্ট্রাইক। ভাইস্ প্রিন্সিপালের প্রিয় কিছু ছাত্র যখন জোর করে কর্ডন ভেঙ্গে ক্লাস করতে গেল—তখন প্রকাশদাও এমনি ক্ষোভ, ঘৃণা আর যন্ত্রণায় জ্বলে উঠে বলেছিলেন, এরা নিজেদের ভাল বোঝে না। ক্যান্টিনে খাবারের দাম কমলে আমার বাবার রোজগার বাড়বে না।

কলেজে প্রকাশদা, মায়াদির সঙ্গে জয়তীও তিন বছর হৈ-চৈ করেছে। স্টাইপেণ্ড কাটা গেছে, প্রিন্সিপাল বি. এ. ক্লাসে ভর্তি করতে চান নি। পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হয় নি। কলেজের

সাধারণ ছাত্র, অধ্যাপক, এমন কি দারোয়ান, বেয়ারার চোখেও সে একটা মারাত্মক রাজনীতি করা মেয়ে।

কিন্তু জয়তী জানে প্রকাশদা বা শর্বরীর সঙ্গে নিজের প্রভেদ কোথায়। তার বিশ্বাস এত দৃঢ় নয়, কাজের ধারাবাহিকতায়ও সে এমন নিয়মিত নয়। তাছাড়া তার সংশয় আছে, দ্বন্দ্ব আছে। আপন অস্তিত্ব তাকে প্রতিমুহূর্ত পীড়িত করছে। না, তফাৎ আছে। সে কোনদিনই ওদের মতো নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না। পৃথিবীর প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে পারবে না রুখে দাঁড়াতে। কিছুটা মেনে, কিছুটা না মেনে, তাকে বাঁচতে হবে। কারণ, শকুন্তলা হতে না পারার অহমিকাও যাবার নয়।

শর্বরী জানে না। শর্বরী বোঝে নি। কিন্তু যেদিন একটা চিঠি টাইপ করে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, নে, আর কেউ দিল না—সেদিন এমনি একটা অস্বস্তি আর উত্তেজনার মধ্যেই জয়তী সই করেছিল। নিজের মনের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আলোড়ন সযত্ন প্রয়াসে গোপন রেখে হাসিমুখে শর্বরীর হাতে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে বলেছিল, গভর্ণিং বডি কি কিছু করবে? উল্টে বনদি—

শর্বরী মুখ টিপে হেসে জবাব দিয়েছিল, দেখা যাক্।

আর জয়তী অবাক হয়ে ভেবেছিল, শর্বরী কি নিশ্চিন্ত। হেড-মিস্ট্রেসের মতের বিরুদ্ধে গভর্ণিং বডির কাছে চিঠি দিচ্ছে। অথচ কত সহজে!

জানিস, তুই আমার মুখ রাখলি। ভদ্রমহিলা বুঝবেন, আমি একা নই।

শর্বরীর গলা একটু কেঁপেছিল। গলা কাঁপল কেন? শর্বরীর

মনেও কি আবেগ আর বাস্তবতার টানাপোড়েন চলছে? বাইরের এই সহজ, এই সহজ আর অনায়াস নিশ্চয়তার আড়ালে শর্বরীও কি ভবিষ্যতের কথা ভাবছে?

উনি তো ক্ষেপবেন। ডেঁটে থাকিস। তারপর দেখা যাক।

শর্বরীর ভাবনা জয়তীকে ঘিরে। একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। শর্বরী স্কুল মিস্ট্রেস জয়তী মুখার্জিকেই চেনে, স্কটিস চার্চ কলেজের জয়তীকে সে দেখে নি। হাসি পেয়েছিল। চারুদি, হৈমদির মত শর্বরীও কি তাকে ছেলেমানুষ মনে করে? জয়তী নিজে জানে তার সঙ্গে শর্বরীর তফাৎ কতোটা। কিন্তু একটিমাত্র সহকর্মী, যাকে সখী মনে করে, তার চোখে জয়তীর অস্তিত্বের চেহারা কি, আজও তা স্পষ্ট করে জানা হয় নি।

জানার সুযোগ এল। চিঠির খবর পেয়ে বনদি ডেকেছেন। ছুটির পর হেডমিস্ট্রেসের ঘরে সব কটি মাস্টারনি উপস্থিত। রাধাচরণের বিলে রেভেনিউ স্ট্যাম্পে সই করে টাকা গুণে নিচ্ছেন। একের পর এক। একটা পাতলা খাম থেকে টিকিট বের করে জিভ দিয়ে থুথু লাগিয়ে রাধাচরণ যন্ত্রের মত বিল মেলে ধরছে, তারপর ঘাড় গুঁজে নিখাদ সতর্কতায় টাকার নোট গুণছে। কমপক্ষে দু-বার। তারপর দিদিমণিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সমান সতর্কতায় তাঁরাও আর একবার টাকাটা গুণে নিচ্ছেন।

ঘরের থমথমে আবহাওয়া, বনদির উপস্থিতি, টুকরো টুকরো কথা আর রাধাচরণের কাজের যান্ত্রিকতা জয়তীর মনে প্রথম মাইনে পাওয়ার উত্তেজনা কেড়ে নিতে পারে নি। অন্যান্য মিস্ট্রেসদের মত সেও বনদির বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু যেন ভয়ও করছে। ভয় এবং অস্বস্তি। তবু ঠিক এই মুহূর্তটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখছিল। দেখতে তার ভাল লাগছিল। প্রথম মাইনে পাওয়ার উত্তেজনা, শর্বরীর চিঠিতে সই দেওয়ার ভয় এবং বনদি কি বলতে পারেন তা ভেবে অস্বস্তি—পরস্পর বিরোধী এই তিনটি মনোভাবের আলো-ছায়া-অন্ধকারে জয়তী নিজেকে দেখছিল। ঘরের চারদিকে চোখ মেলে নিজেকে দেখছিল।

শকুন্তলার পর শর্বরীর পালা। রাধাচরণ যে চকিতে একবার শর্বরীর মুখের দিকে তাকাল, তা জয়তীর চোখ এড়ায় নি। সেদিনের ঘটনার প্রভাব লোকটার মনে কি ভাবে পড়েছে কে জানে! শর্বরীর প্রতিক্রিয়া অবিশ্যি দেখেছে। রাধাচরণকে 'শ্রীরাধা' আর বনদিকে 'কেষ্ট ঠাকুর' বলে সে পরদিনই টিচার্স রুমে নতুন গল্প চালু করেছে। টিফিনে লুকিয়ে এসে রাধাচরণ যখন খুব একটা গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে ফিশফিশ করে বলল, হেডমিস্ট্রেস চিঠিটা চেপে রেখেছেন, তখন শর্বরীর একটা চোখ উত্তেজনায় জ্বললেও আর একটা চোখ হাসিতে মিটমিট করছিল। দুজনে বারান্দা থেকে কমনরুমে গম্ভীর হয়েই ঢুকল। কিন্তু তারপর উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে দু হাতে জয়তীকে জড়িয়ে ধরে শর্বরী বলেছিল, এই, আমি ভাই প্রেমে পড়েছি।

উঁ ?

হ্যাঁরে। তোদেব ছি রাধার।

বলেছিল। আর আরো জোরে হেসে ফেলেছিল। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে দূর থেকে চারুদি, হৈমদি বিরক্ত এবং

কৌতূহলী চোখে এদিকে তাকাতেই বক্তৃতার ঢংয়ে শর্বরী বলেছিল, সকলের তরফ থেকে আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। উনি আর শ্রীকৃষ্ণ নন, আয়ান ঘোষ। পদস্খলনের কারণ ক্রমে প্রকাশ্য।

জয়তী তাকিয়ে দেখছিল। রাধাচরণকে, শর্বরীকে। টাকার গোছাটা হাত পেতে নিল, তারপর না গুণেই ব্যাগে পুরল। রাধাচরণ মুখ তুলে তাকাল। যেন চমকে তাকাল।

সেদিন যে কথা ভাববে না বলেই ভাবে নি, কিংবা ভাবতে লজ্জা পেয়েছে, আজ রাধাচরণের ছোট্ট চমকটুকুর ধাক্কা সেই চিন্তার আবর্তেই তার মনকে দুলিয়ে দিল। রাধাচরণকে কোনদিন চমকাতে দেখে নি। সেদিন শর্বরীর বকুনী খেয়েও সে আশ্চর্যভাবে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কিন্তু তাতে চমক ছিল না। তার ব্যস্ত, গম্ভীর, সতর্ক পেশা বা অস্তিত্বে কোন চমকের প্রত্যাশাই সে রাখে না। তাই বোধহয় চমকাবার কারণ ঘটলেও চমকাতে ভুলে গেছে। কিন্তু আজ রাধাচরণের এই চমকের যথার্থ কারণ কি শর্বরীর নিছক টাকা গুণে না নেওয়া, না, যে মন তাকে সেদিন চূড়ান্ত অপমান করে আজ সহজ বিশ্বাসে টাকাটা তুলে নিয়ে পরম সম্মান দেখাল—তার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস? যান্ত্রিক রাধাচরণেরও কি একটা মন আছে? মন থাকার যন্ত্রণা আছে? আর—

কিন্তু ততক্ষণে জয়তীর পালা এসে গেছে। রাধাচরণ হিসেবের ব্যাপারে এত সতর্ক যে তারপর সত্যিই আর নিজে টাকা গোণার প্রয়োজন হয় না। তবু গোণাটাই রীতি। শর্বরী গুণল না, সুহাসিনী

বালিকা বিদ্যালয়ে এটি একটি ঘটনা। এবং প্রত্যেকেরই তা চোখে লেগেছে। জয়তী গুণতে চায় না। তার লজ্জা করে। একটা মানুষকে অপমান করা হল মনে হয়। না গোণার পথ শর্বরী দেখিয়েছে। সুতরাং অসুবিধে নেই। অথচ ব্যতিক্রম সকলের চোখে পড়বে। কি ভাববেন ওঁরা? মুখ টিপে হাসবেন, না বিরক্ত হবেন?

ঘাড় নুইয়ে অন্যমনস্কের মত বিলটা সই করতে করতে জয়তী তখন এই চিন্তাই করছে। টাকা ক'টা গুণে নেবে কি নেবে না। একবার সকলের দিকে তাকাতে চাইল। কিন্তু স্পষ্ট চোখে দেখতে পারল না। মনে হল প্রত্যেকের নজর একই দিকে। জয়তীর মনের দ্বন্দ্ব কি ওঁরা টের পেয়ে গেছেন? বনদির ঠোঁটের কোণে হাসি কেন? শর্বরীর চিবুক এত দৃঢ় হবার কারণ কি? রাধাচরণ টাকার গোছা হাতে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে? নাকি এ সমস্তই তার কল্পনা। কিন্তু কি আশ্চর্য! শর্বরীর সঙ্গে স্কুল পরিচালনার কিছু কিছু ত্রুটির প্রতিকার চেয়ে গভর্ণিং বডির কাছে চিঠি দেবার পর সেও যদি না গুণে টাকা ক'টা নেয়, তাহলে তার মহত্বের মর্যাদা না দিয়ে সকলে কি তাকে শর্বরীর ছায়া মনে করবে? তাহলে কি এই বোকা বোকা অথচ স্মার্ট হতে সচেষ্ট রাধাচরণ আড়ালে মুখ টিপে হাসবে? বনদি বিরক্ত হবেন? চারুদি আর হৈমদি চটবেন? শকুন্তলা—অবিশ্যি শকুন্তলার মনে প্রতিক্রিয়া কি হবে তা জয়তীর মাথায় আসছে না। ওর মত একটা তুচ্ছ, তুচ্ছ আর মামুলী মেয়ে হয়তো এমন সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাবে না। কিন্তু কে কি ভাববেন বা ভাবছেন—তাতে জয়তীর কি এসে যায়? আহ্, কি এসে যায়?

টাকার গোছা হাত পেতে নিল। প্রথম মাইনে। কিন্তু নিতে গিয়ে নিজের ওপর বিরক্তি আর সকলের কথা ভেবে কপালে ঘাম। টাকা ক'টার ওপর একবার দ্রুত চোখ বোলাল। একটা ধারে আঙুল ঘষল। নখ দিয়ে চিরুনির দাঁড় টানলে যেমন হয় তেমনি মৃদু শব্দ। গুণল না। অথচ শর্বরীর মত তাচ্ছিল্যে ব্যাগেও ঢোকাতে পারল না। গোণা আর না-গোণার মাঝামাঝি অভিনয় সেরে ক্লান্ত পায়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল। শকুন্তলা ছাড়া অন্য কারোর দিকে তাকাবার সাহস হল না। একটা আত্মতৃপ্ত খুসি খুসি মুখ চোখে পড়তে তার কান্না পেল।

মনের কি তুচ্ছতা। অন্যে তাকে শর্বরীর ছায়া ভাববে, এ চিন্তায় এত পীড়া কেন? শর্বরীর ঋজু, জ্যান্ত প্রাণটাকে সে ভালবাসে। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের একটিমাত্র স্বচ্ছন্দ আশ্রয় এই শর্বরী। কিন্তু অবচেতনায় কি তারজন্য একটু ঈর্ষা, একটু হীনমন্যতাবোধ লুকিয়ে আছে? নইলে টাকা গুণে না নিয়ে যে সহজ সৌজন্য দেখাল, তারজন্য মনে মনে তাকে প্রশংসা জানিয়েও একটা সিন তৈরী করার অজুহাতে সেই মুহূর্তে শর্বরীর ওপর রাগ হচ্ছিল কেন? রাগ যদি হল, তাহলে সে-ই বা অন্যান্য মিস্ট্রেসদের মত টাকা ক'টা গুণে নিল না কেন? শর্বরীর চোখে ছোট হয়ে যাবার ভয়ে? নিজের কাছে মামুলী প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায়? তাহলে রাধাচরণকে সম্মান দেখানো বা না-দেখানোটা তার কাছে আদপেই কোন প্রশ্ন ছিল না? তাছাড়া শর্বরী অত্যন্ত সহজে যা পারল, তারই অনুসরণ করতে গিয়ে জয়তী নিজের মনে এতবড় একটা নাটক সৃষ্টি করল কি ভাবে? মনের এ কি তুচ্ছতা?

শর্বরীর ছায়া হতে আপত্তি, হেরে যেতেও ভয়। অথচ মামুলী-পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যে ঝুঁকি, সেটুকু গ্রহণ করার আগেও কত সতর্ক হিসেব। তাই কি টাকা ক'টা এমন ভাবে ব্যাগে পুরল যাতে শর্বরী ভাবে সে গোণেনি অথচ আর সকলে বোঝে তাদের মত একটা একটা করে না গুণলেও সে মোটামুটি অর্থের পরিমাণটা দেখে নিয়েছে?

লজ্জায়, যন্ত্রণায় দু হাতে নিজের বুকটা শক্ত করে চেপে ধরতে গিয়ে হঠাৎ হৈমদির চোখে চোখ পড়তে সোজা হয়ে বসল। আস্তে হাত নামিয়ে নিল। আর, সকলের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বনদি ডাকলেন, খোকার মা, চা। তারপর একটু হাসার মত মুখ করে বললেন, জয়তী, আমাদের চা খাওয়াতে হবে। প্রথম মাইনে পেয়েছ।

সকলে অবাক হয়ে গেল। জয়তীও অবাক হল। সে জানে সকলে অবাক হয়েছে বনদির কথার অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গে। কিন্তু জয়তী অবাক হল নিজের মনের আর এক চেহারায়। টাকা গুণবে কি গুণবে না, এই চিন্তায়ই বিব্রত ছিল। কিন্তু টাকাটা যে তার মাইনে, এতো বড় ঘটনাই মনে এতক্ষণ স্পষ্ট হয়ে বাজে নি। অথচ কতোদিন, কতোভাবে সে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেছে।

তুমি চটপট সব গুছিয়ে নাও। আমরা একটু কথা বলব।

রাধাচরণ মুখ তুলে একবার বনদির দিকে তাকিয়েই আবার ঘাড় গুঁজে ফাইলের কাগজপত্র সাজাতে লাগল। কেরাণীকে বনদি ছুটি দিলেন। কিন্তু বিচিত্র আদেশের ভঙ্গীতে।

চা এল। খোকার মা রাধাচরণের চা আনে নি। একবার আড়-চোখে শর্বরীর দিকে তাকাল। ওর চোখে কোন ভাবান্তর নেই। একবার আড়চোখে রাধাচরণের দিকে তাকাল। ওর চোখে কোন ভাবান্তর নেই। ইচ্ছে হল বনদিকে বলে। কিন্তু লজ্জা পেল। আর কাপে চুমুক দিয়ে বনদি কথা আরম্ভ করলেন। যেন কিছুই হয় নি। কোন গুরুত্ব নেই এমন একটা ঘটনা। দুজন মিস্ট্রেস গভর্ণিং বডির কাছে চিঠি লিখেছেন—তাঁরা স্কুলকে নতুন করে সাজাতে চান, নতুনভাবে চালাতে চান।

বনদির শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় জ্বালা নেই কিন্তু ভাষায় সূক্ষ্ম ধার। যেন কিছুই হয় নি। কোন গুরুত্ব নেই এমন একটি ঘটনা। অন্তরঙ্গ অভিভাবিকার মত তিনি বোঝাচ্ছিলেন এ ভাবে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে লাভ নেই। কারণ সে চিঠি নিয়ে গভর্ণিং বডি হেডমিস্ট্রেসেরই সঙ্গে আলোচনা করবেন, সিদ্ধান্তে আসবেন। বড় কিছু করার ইচ্ছে রাখা ভাল, ঝোঁক থাকা মন্দ না। তবে সাধ্য যাচাই না করে বড় ইচ্ছের পেছনে ছুটলে অনেক সময় শুধু বোকামিই হয় না, লোকসানও ঘটে।

বনদির কথা শুনতে শুনতে জয়ন্তী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবল, একমাস হেডমিস্ট্রেসকে দেখছে অথচ ভদ্র-মহিলাকে ইতিপূর্বে কখনো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে নি। বনদির ডান-দিকের ভুরুর মাঝখানে যে একটা ছোট্ট আঁচিল আছে আর থুতনির কাছে তিল—জয়ন্তী তা জানতো না। বনদির মাথায় পাকা চুল—তাও কোনদিন দেখে নি। একটা শীর্ণ শরীরের কাঠামোয় বনদির ঠোঁটের ওপর গোঁফের হাল্কা আভাষ আর রূপোর চশমাই

প্রথম নজরে চোখে পড়ে। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে এত রোগা আর শুকনো আর ফুরিয়ে যাওয়া—তাও যেন এই প্রথম সে আবিষ্কার করল।

বনদির সঙ্গে মার চেহারার কোথায় মিল আছে? কোথায়? কি আশ্চর্য! মিলটা ধরতে না পারায় নিজের ওপরই চটে উঠল। যেন এই মুহূর্তে এই ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করতে না পারলে সমস্ত পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। স্তব্ধ আর মিথ্যে।

আস্তে আস্তে মনে পড়ল এক বাড়িতে থাকলেও আজ কতোদিন হল মার দিকে ভাল করে তাকায় নি। অথচ কত ভাবে, কতবার দেখা হয়, কতো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলে, ঝগড়া করে। কখনো অভিমান। অথচ মাকে দেখে না। তাকানো আর দেখায় কত প্রভেদ। তাকান নিছক ইন্স্‌টিঙ্কট্‌। দেখা উইল।

বেশ যুৎসই একটা চিন্তা করে ফেলেছে ভেবে জয়তী মনে মনে খুশি হল। ঠিক তখনই মনে পড়ল মার সঙ্গে বনদির চেহারায় মিল কোথায়। চেতন মনে এই প্রশ্ন আর তাকে পীড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু সে যখন উইল এবং ইন্স্‌টিঙ্কট্‌ নিয়ে চিন্তা করছে তখন অবচেতন মনে প্রশ্নটা পাক খেয়ে খেয়ে ঠিকই উত্তর খুঁজে পেয়েছে। মিল আকৃতির ফুরিয়ে-যাওয়া ভাবে। কিন্তু মার চেহারায় একটা চিরন্তন দৈন্য আর ব্যর্থতার কান্নাভরা আক্ষেপ আছে। বনদির শরীরে, পোষাকে, ভঙ্গীতে কঠোর শাসন এবং তীব্র অভিযোগ।

চেয়ারের শব্দে চমক ভেঙ্গে তাকাল। রাধাচরণ উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা ফাইল বগলদাবা করে ধীর পায়ে হেডমিস্ট্রেসের

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চাবির গোছাটা রেখে ধীর পায়েই বেরিয়ে চলে গেল। বনদি একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন। কথার স্রোতে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়েছেন হয়তো। শকুন্তলা শর্বরীর হাঁটুতে আস্তে চিমটি কাটল। হঠাৎ এতদিনের ঝগড়া ভুলে চারুদি আর হৈমদি পরস্পরের সঙ্গে চোখাচুখি করলেন।

চা খাও সকলে।

বনদি কাপে শেষ চুমুক দিলেন। জয়তীর চায়ে কি যেন একটা ভাসছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল পোকা নয়, চা পাতা। আবার কথা শুরু হল। বনদি ভয় দেখাচ্ছেন। যেন কিছুই হয় নি, কোন গুরুত্ব নেই এমন একটা ঘটনা। তবে আগের থেকে গলা একটু চড়েছে, কথা একটু দ্রুত বলছেন। ইনডিসিপ্লিন বা ডেকোরামের অভাব তিনি সহ্য করবেন না। কোন বক্তব্য বা অভিযোগ থাকলে তা হেডমিস্ট্রেসকে জানানোই বিধেয়। সরাসরি গভর্ণিং বডির নামে চিঠি আর শিক্ষাদপ্তরে প্রতিলিপি পাঠানোর ঔদ্ধত্য তাঁর স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম। এতে ডেকোরাম থাকে না। সরকারের চোখে সুহাসিনীর প্রেস্টিজ নষ্ট হয়। গভর্ণিং বডির কাছে এমন মিস্ট্রেস পোষার জন্য লজ্জা পেতে হয়।

যখন ভুরু কুঁচকে, তলার ঠোঁটটা দাঁতে চেপে বনদি দ্রুত কথা বলছিলেন, তখন জয়তী চিন্তা করছিল হেডমিস্ট্রেসের গম্ভীর, বিরক্ত আর সদা আত্মপদ-সচেতন মূর্তিই সে দেখেছে। কিন্তু বনদি খুব হাসছেন বা খুব কাঁদছেন, এমন একটা অবস্থা কি কল্পনা করা যায়? বনদি হাসলে অনেকটা হৈমদির আদল আসবে। কাঁদলে কিছুটা মার সঙ্গে মিল ঘটবে কি?

প্রথম নজরে চোখে পড়ে। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে এত রোগা আর শুকনো আর ফুরিয়ে যাওয়া—তাও যেন এই প্রথম সে আবিষ্কার করল।

বনদির সঙ্গে মার চেহারার কোথায় মিল আছে? কোথায়? কি আশ্চর্য! মিলটা ধরতে না পারায় নিজের ওপরই চটে উঠল। যেন এই মুহূর্তে এই ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করতে না পারলে সমস্ত পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। স্তব্ধ আর মিথ্যে।

আস্তে আস্তে মনে পড়ল এক বাড়িতে থাকলেও আজ কতোদিন হল মার দিকে ভাল করে তাকায় নি। অথচ কত ভাবে, কতবার দেখা হয়, কতো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলে, ঝগড়া করে। কখনো অভিমান। অথচ মাকে দেখে না। তাকানো আর দেখায় কত প্রভেদ। তাকান নিছক ইন্স্‌টিঙ্কট্‌। দেখা উইল।

বেশ যুৎসই একটা চিন্তা করে ফেলেছে ভেবে জয়তী মনে মনে খুশি হল। ঠিক তখনই মনে পড়ল মার সঙ্গে বনদির চেহারায় মিল কোথায়। চেতন মনে এই প্রশ্ন আর তাকে পীড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু সে যখন উইল এবং ইন্স্‌টিঙ্কট্‌ নিয়ে চিন্তা করছে তখন অবচেতন মনে প্রশ্নটা পাক খেয়ে খেয়ে ঠিকই উত্তর খুঁজে পেয়েছে। মিল আকৃতির ফুরিয়ে-যাওয়া ভাবে। কিন্তু মার চেহারায় একটা চিরন্তন দৈন্য আর ব্যর্থতার কান্নাভরা আক্ষেপ আছে। বনদির শরীরে, পোষাকে, ভঙ্গীতে কঠোর শাসন এবং তীব্র অভিযোগ।

চেয়ারের শব্দে চমক ভেঙ্গে তাকাল। রাধাচরণ উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা ফাইল বগলদাবা করে ধীর পায়ে হেডমিস্ট্রেসের

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চাবির গোছাটা রেখে ধীর পায়েই বেরিয়ে চলে গেল। বনদি একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন। কথার স্রোতে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়েছেন হয়তো। শকুন্তলা শর্বরীর হাঁটুতে আস্তে চিমটি কাটল। হঠাৎ এতদিনের ঝগড়া ভুলে চারুদি আর হৈমদি পরস্পরের সঙ্গে চোখাচুখি করলেন।

চা খাও সকলে।

বনদি কাপে শেষ চুমুক দিলেন। জয়তীর চায়ে কি যেন একটা ভাসছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল পোকা নয়, চা পাতা। আবার কথা শুরু হল। বনদি ভয় দেখাচ্ছেন। যেন কিছুই হয় নি, কোন গুরুত্ব নেই এমন একটা ঘটনা। তবে আগের থেকে গলা একটু চড়েছে, কথা একটু দ্রুত বলছেন। ইনডিসিপ্লিন বা ডেকোরামের অভাব তিনি সহ্য করবেন না। কোন বক্তব্য বা অভিযোগ থাকলে তা হেডমিস্ট্রেসকে জানানোই বিধেয়। সরাসরি গভর্ণিং বডির নামে চিঠি আর শিক্ষাদপ্তরে প্রতিলিপি পাঠানোর ঔদ্ধত্য তাঁর স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম। এতে ডেকোরাম থাকে না। সরকারের চোখে সুহাসিনীর প্রেস্টিজ নষ্ট হয়। গভর্ণিং বডির কাছে এমন মিস্ট্রেস পোষার জন্য লজ্জা পেতে হয়।

যখন ভুরু কুঁচকে, তলার ঠোঁটটা দাঁতে চেপে বনদি দ্রুত কথা বলছিলেন, তখন জয়তী চিন্তা করছিল হেডমিস্ট্রেসের গম্ভীর, বিরক্ত আর সদা আত্মপদ-সচেতন মূর্তিই সে দেখেছে। কিন্তু বনদি খুব হাসছেন বা খুব কাঁদছেন, এমন একটা অবস্থা কি কল্পনা করা যায়? বনদি হাসলে অনেকটা হৈমদির আদল আসবে। কাঁদলে কিছুটা মার সঙ্গে মিল ঘটবে কি?

হাসি বা কান্না কি মানুষের আকৃতি বদলে দেয়? নাকি মানুষের চেহারা হাসি বা কান্নাকে সত্য করে, মূর্ত করে?

মার করুণ চেহারায় অনর্গল কান্নার কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। অধিকাংশ সময়েই মাকে কাঁদতে দেখলে বিরক্তি জাগে। মার চেহারায় কান্না যেন মানায় না। বা, এত বেশী মানায় যে ভদ্রমহিলার অস্তিত্ব থেকে কান্নাকে কখনোই পৃথক করা যায় না। তাই মার কান্নার মধ্যে কোন নতুন নেই। বিস্ময় নেই। ধাক্কা নেই। তাই মার চোখের জলে জয়তী অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু বনদির শিথিল চামড়ার শরীর আর আঁটসাঁট পোশাক এবং খরখরে ভঙ্গিমার মধ্যে এক ফোঁটা চোখের জল কি নতুন, নতুন আর বিস্ময়। হেডমিস্ট্রেস বনদির মধ্যে কোনদিন কান্নার দৈন্য বা কারুণ্য ছিল না। তাই বনদির অস্তিত্বে এ এক অভিনব প্রকাশ। অস্তিত্বের প্রকাশ চোখের জলে।

এমন একটা পরিস্থিতির জন্য জয়তী প্রস্তুত ছিল না। কোন অসতর্ক মুহূর্তেও এমন কিছুর জন্য সে অপেক্ষা করে নি। তাই বনদির দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না, চেষ্টা করেও পারছে না, ঠিক কোন কথাটি বলার পর বনদির চোখে জল এল। কি প্রক্রিয়ায় এল।

বনদি কাঁদছেন। এই একটা কথাই নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জয়তী নিঃশব্দে উচ্চারণ করল। যেন কোন মন্ত্র আওড়াচ্ছে। অথচ কিছুক্ষণ পরেই এই কথা কটি তার মনে কোন ভাব বা

চিত্রের অনুষঙ্গ আনছে না। যেন কি এক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিতে সে মনে মনে উচ্চারণ করছে, বনদি কাঁদছেন। আর ঠিক তখনই ভাবছে শর্বরীর কথা।

এখন কি নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে শর্বরীকে। পাথরের মত মুখ করে আগাগোড়া বসেছিল। যখন বনদি সকলকে ধমকেছেন, ভয় দেখিয়েছেন—তখন যেমন, যখন নিজের মনের বেদনা, সীমাবদ্ধতা আর যন্ত্রণার কথা খুলে বলে সহকর্মীদের সহায়তা, সমবেদনা চেয়েছেন—তখনও। বনদির কথার প্রসঙ্গ বা সুর মেনে শকুন্তলার মুখ চোখের চেহারা কত ঘনঘন বদলেছে—তা জয়তীর চোখ এড়ায় নি। আর চারুদি এবং হৈমদিরও। কিন্তু শর্বরী আগাগোড়া আশ্চর্য এক নিস্পৃহতার মুখোস টেনে অপলক চোখে বনদিকে দেখেছে। মাঝে মাঝে তেমনই একটা নিস্পৃহ চাউনি বুলিয়েছে অন্যান্য সহকর্মীদের মুখে।

নিজের সমস্ত অনুভূতিকে হাতের মুঠোয় রাখার এই আশ্চর্য শক্তি শর্বরী কোথায় পেল? কোন কিছুই কি ওকে বিচলিত করে না? কোন কিছুই কি ওকে চমকায় না? কোন বিচলিত অবস্থা বা চমকের প্রকাশ কি ওর ইচ্ছা বা আয়ত্তের বাইরে নয়? যা চায়, মানুষ কি তা এত নির্মম করে চাইতে পারে? কি চাইতে হবে, মানুষ কি তা এমন নিশ্চিতভাবে জানে?

যখন না গুণে শর্বরী টাকার নোট নিয়েছিল, তখন জয়তী তার একটাই মানে করেছিল। সহজ মানে। শর্বরী মানুষকে বিশ্বাস করে। তাই রাধাচরণকেও বিশ্বাস করল। তাছাড়া বোধহয় জানতো সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়কে নতুন করে গড়ার জন্য

শুধু গভর্ণিং বডির কাছে চিঠি দিলেই হবে না। স্কুলের সব ক'টা শিক্ষিকার প্রৌঢ়, স্থবির, মামুলী মনের মূল ধরে নাড়া দেওয়ার প্রয়োজনও আছে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এর অন্য মানেও ছিল। শর্বরী জানত বনদি সকলকে কেন ডেকেছেন। শর্ববী জানত, বনদি চাকরি খাওয়ার ভয় দেখাবেন। তাই কি এমন হেলাফেলা করে টাকা ক'টা নিয়ে আগেই সে বনদিকে জানিয়ে রেখেছিল মাইনেব ক'টা টাকার ওপবই তার রুচি, তার জীবনমরণ-বোধ আর-আর মাস্টারনিদেব মত নির্ভর করে না? শর্বরী রাজনীতি করা মেয়ে। তার প্রত্যেকটি কাজেব পেছনেই ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রভাব থাকা সঙ্গত।

তাহলে এই ঘটনা থেকে রাধাচরণ সম্পর্কে শর্ববীর মনো-ভাবের কি বিশ্লেষণ সম্ভব? হেডমিস্ট্রেসের কেরাণীকে কি সে এইভাবে বুঝিয়ে দিল এমন একটা ভীরু, অপদার্থ লোককে সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গুণে নেবার মত গুরুত্ব দিতেও সে রাজি নয়? নাকি ভয়ে আর গোপনে আর সতর্কতায় যে রাধাচরণ জয়তীর সামনেই শর্বরীকে ডেকে চিঠি চেপে রাখার খবর জানিয়েছিল, তারই ক্রমবিকাশমান পৌরুষ এবং মনুষ্যত্বকে সে এইভাবে স্বীকৃতি দিল। নাকি শর্বরী—চিন্তা কবতে গিয়ে থমকে গেল। শর্বরী শকুন্তলা নয়, জয়তীও না। ওব কাজ বা ভাবনাকে চলতি ভালোলাগা এবং ভালবাসার ছকে মিলিয়ে দেখতে গেলে ঠকতে হয়।

শুধু শর্বরী নয়, কোন মানুষকেই বোধহয় কোন ছকে ফেলে দেখতে নেই। নইলে বনদি কাঁদছেন, এ ঘটনা সম্ভব হয় কি করে?

সম্ভব হল কি করে? এবং আশ্চর্য জয়ন্তীর মন। বনদি কাঁদছেন। অথচ সেই বিশেষ একটি ঘটনার সামনে বসে কি ভাবে সে এতক্ষণ শর্বরী আর রাধাচরণের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে রইল?

কিছুটা ক্ষতির আফশোষ আর খানিক অপরাধবোধ নিয়ে বনদির দিকে তাকাল। মনে হল কান্না ওঁকে সুন্দর করে নি, করুণ করে নি। তুচ্ছও না। অথচ সব মিলিয়ে ভদ্রমহিলাকে কেমন বদলে দিয়েছে।

এই? কানের কাছে মুখ এনে শকুন্তলা বলল, বড্ড বাথরুম পেয়েছে। বনদিকে বলব?

সমস্ত শরীরটা রি রি করে উঠল। এতক্ষণ শকুন্তলার যে অস্বস্তি লক্ষ্য করেছে, তার পেছনে বনদির কান্নার কোন প্রভাব নেই? অদ্ভুত মেয়ে তো! কিন্তু রাগ করতে গিয়ে নিজের মনেই হেসে ফেলল। শকুন্তলার অস্বস্তিকে মনে হচ্ছিল ভাণ। রাগ হচ্ছিল। ভাণ নয় জেনেও রাগ বাড়ছে। জয়ন্তী শকুন্তলাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

এই?

চুপ করে বস। আর তো একটু সময়। উত্তর দিয়ে জয়ন্তী আবার বনদির মুখে চোখ রাখল।

কি যেন সেই কথাটা? চোখের জলে নতুন অস্তিত্বের প্রকাশ! এক ফোঁটা চোখের জল একটা মানুষকে বদলে দিয়েছে।

বনদিকে সে ভয় করত, কারণ হেডমিস্ট্রেসকে ভয় করতে হয়। বনদিকে সে ঠাট্টা করত, কারণ আড়ালে হেডমিস্ট্রেসকে নিয়ে রসিকতা করা টিচার্স রুমের এক দস্তুর। যে ভদ্রমহিলাকে ভয়

করত আর ঠাট্টা করত—যাঁর সম্পর্কে নিজের মানসিকতার অন্য কোন পরিচয় বিশেষ পায় নি—এক মুহূর্তে তাঁকে কত অন্য মনে হচ্ছে। অন্য আর নতুন এবং অসহায়।

অসহায়। এতক্ষণে মনোমত শব্দটি খুঁজে পেল। অসহায়। সত্যিই তো। বয়েস হয়েছে। জীবন আর যৌবনের কোন স্বাস্থ্য-সম্মত বিকাশই ভদ্রমহিলার মধ্যে ঘটে নি। অনেক পরিশ্রম করে অনেক বছর ধরে একফোঁটা একটা স্কুলকে টিঁকিয়ে রেখেছেন। টিঁকিয়েছেন, বড় করেছেন। এই সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া আজ আর কি আছে ওঁর জীবনে? তাছাড়া বনদির হেড-মিস্ট্রেসি তো নিছক পেশা নয়, অভ্যাসও। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে আছে একটা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকাবৃত্তি। স্কুল যদি বড় হয়, তাহলে বনদির ঠাঁই আর ও ঘরে থাকবে না, ও চেয়ারেও না। হয়তো জয়ন্তী মুখার্জিরই পাশে একটা ডেস্ক নিয়ে তাঁকে বসতে হবে।

কারণ, ছোট হলেও একটা ইন্স্‌টিটিউশ্যনের হেড হয়ে এতো বছর কাটানোর দরুণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বনদির মধ্যে এমন কতগুলো স্বভাব আর অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে, এমন কতগুলো স্বভাব আর অভ্যাস যে এই মেজাজ বা বয়েস বা শক্তি নিয়ে আজ ওঁর পক্ষে কোন কলেজে বি. টি. ক্লাসের ছাত্রী হয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। যিনি চোদ্দ বছর বড়দিদিমণিগিরি করেছেন, তাঁর পক্ষে অন্যকে দিদিমণি বলে ডাকা সত্যিই কত দুরূহ। তাছাড়া জীবন আর জীবিকার একই আহ্নিক পথে আবর্তিত হয়ে বনদির ধী এবং মেধার যা পরিণতি, জয়ন্তী হলফ করে বলতে পারে তাতে

স্কুল পাঠ্য বইয়ের বাইরে আজ আর হেডমিস্ট্রেসের পক্ষে অন্য কোন পড়াশুনো সম্ভব নয়। অভ্যাস নেই, বয়েস নেই, সামর্থ নেই।

তাহলে মার মত বনদিও ফুরিয়ে যাওয়ারই দলে। মনে, মননে এত প্রভেদ, কান্নায় এত তফাৎ—তবু দুজনের একটা জায়গায় এসে কি আশ্চর্য মিল ঘটল! মার শত সঙ্কীর্ণতা বা অন্যায়কে জয়তী যদি সহ্য করে, তবে জীবন ও অস্তিত্বের সেই একই নিয়মে বনদির এই আপাতঃ অন্যায়কে তুল্য সহানুভূতিতে সহ্য করবে না কেন?

জীবনকে সে সমাজ বা প্রগতির জোয়ালবাহী গরু বলে কল্পনা করতে রাজি নয়। মানুষের ইতিহাস বৃদ্ধ বা পঙ্গুকে হত্যা করার বর্বরতা থেকে অনেক এগিয়েছে।

কিন্তু শর্বরীর মত জয়তীও তো জানে সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কার প্রয়োজন। নইলে অনেক ক্ষতি, অনেক ক্ষয়। সমাজের। ভবিষ্যতের। তবে বনদির কি হবে, এ প্রশ্ন কেন তাকে এত ভাবাচ্ছে? দুর্বল করে দিচ্ছে?

জয়তী মানুষের ইতিহাসের কথা ভাবছিল। কিন্তু আজীবন কি সে দেখে নি বিকৃত অর্থনীতির এই দেশে পঙ্গু সমাজব্যবস্থার দরুণ অক্ষম, জগন্নাথ আর অপদার্থেরা কোন ক্রমে নতুনকে, নতুন আর সুস্থ আর স্বাভাবিককে পথ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আঘাত দিতে হয়েছে, দিতে হয়। সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়। এই তো জীবনের ইতিহাস। ইতিহাসের জীবন!

মার চোখের জল, তাঁর কুসংস্কারের আন্তরিকতা, অন্ধবিশ্বাসের মুমূর্ষু জোর তো জয়তীকে তার প্রেম থেকে বিচ্যুত করতে পারে

নি। বনদির এক ফোঁটা কান্নাই বা তাকে তার সত্য থেকে টলিয়ে দেবে কেন ?

অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকাল। হেডমিস্ট্রেস বনদি স্কুলের সাধারণ টিচারদের সামনে কেঁদেছেন—একটা নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়ে আর জুনিয়ার মাস্টারণির ইগোকে পরিতৃপ্ত করার পক্ষে এ ঘটনা ছোট নয়। বনদির ওপর আকস্মিক সমবেদনার কারণ কি এইখানে ? না কি নিছক অসহায়ত্ব আর অনিশ্চয়তার জন্য করুণা বোধ করার মহৎ আত্মতৃপ্তি।

আপন মনে হাসল। নিজেকে অহরহ বিশ্লেষণ করার এই এক বিপদ। তুচ্ছ একটা ঘটনারও কার্যকারণ সম্পর্ক বের করতে গিয়ে নিজের মুখোস মনের কাছে খুলে ধরায় এক জাতীয় আত্মবিলাস আছে। আমি কত মহৎ, কত সত্যাশ্রয়ী, কত বিজ্ঞানসম্মত। এই মোহে পড়ে অনেক সময় সত্যিই যা নয় সেই পর্যায়ে নিজেকে নামিয়ে বা তুলে মানুষ এক বিচিত্র অহমিকায় চুর হয়ে থাকে। আজ জয়তীকেও সেই রোগে ধরল নাকি ?

মরুকগে। এই কি আর কেন-র জ্বালায় জয়তীর জীবন প্রতি মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত। বাইরে তার কোন ঢেউ নেই। কিন্তু ভেতরে সে সবসময় দেখছে। নিজেকে, অন্যকে। নিজের সঙ্গে অন্যকে এবং অন্যের সম্বন্ধের ভিত্তিতে নিজেকে। কিন্তু যদি চারুদি কি হৈমদি কি শকুন্তলার মত তুচ্ছ, চিন্তাহীন, নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করতে পারতো, তা হলে কি মুক্তি। জয়তী এভাবে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে চায় না। তবু বুঝি এই অভ্যাসের হাত থেকে একটা তাড়া খাওয়া জন্তুর মত তার কিছুতেই রেহাই নেই।

রেহাই নেই। আবেগ চাইছে বনদির সমস্ত অন্যায় আর বিরূপতা ক্ষমা করে এই মুহূর্তে তাঁকে, তাঁর অসহায়ত্বকে আশ্রয় দিতে। যুক্তি বলছে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ নয়। ক্ষমা করা এবং আশ্রয়দানের তীব্র মোহ এক ধরণের আত্মবঞ্চনা। তাছাড়া পৃথিবীতে বহুর মঙ্গলের জন্য এক বা একাধিককে আঘাত দিতেই হবে।

সত্যিইতো। সে ছাড়া স্নহাসিনীতে শর্বরীর সহায় কে আছে? হৈমদি, চারুদি, শকুন্তলা বনদির অপসারণে খুসি হবেন। কিন্তু তার জন্য শর্বরীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারবেন না। নিজেদের তুচ্ছতা, স্বার্থ আর ভয় নিয়ে তাঁরা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করবেন না, সংকটের দিনে হয়তো বনদির সঙ্গে শর্বরীর বিরুদ্ধেই মাথা তুলবেন। সেদিন? সেই মুহূর্তের শর্বরীকে, তার ক্ষোভ—ঘৃণা আর যন্ত্রণাকে যেন জয়তী এখনি চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছে। ওর চুলের বিনুনির মত উদ্ধত আর করুণ শর্বরী। প্রকাশদার মত ক্ষুব্ধ। মায়াদির মত জটিল। সেদিন জয়তীকে যদি পাশে না পায়, তাহলে মানুষের ওপর শর্বরী আস্থা রাখবে কোন ভরসায়?

এবং সে দিনতো আসবেই। শর্বরী পেছিয়ে পড়ার মেয়ে নয়। বনদিও যক্ষিণীর মত নিজের অধিকার ছাড়বেন না। সে কথা বলেওছেন। বনদি ধমকেছেন, ভয় দেখিয়েছেন সকলকে। বনদি। শিথিল চামড়ার আঁটসাঁট শরীর আর টানটান পোষাক। খরখরে ভঙ্গিমা। স্নহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস। গভর্ণিং বডির মক্ষীরানি। উনি। উনি। উনি।

হঠাৎ জয়তীর সমস্ত মানসিকতার এক দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। শত চেষ্টাতেও বনদির সেই করুণ, অশ্রুমুখী ভঙ্গীটা স্মরণ করতে পারল না। হয়তো আর কোনদিন পারবে না। ওটা ব্যতিক্রম। বনদির সত্য নয়। হয়তো ভাণ। না, ছি। কিন্তু ওটা ব্যতিক্রম। বনদির সত্য নয়। সত্য এইটুকুই—হেডমিস্ট্রেসের ঘরে মুখ নীচু করে সকলে বসেছিল। আর বনদি প্রত্যেককে ধমকাচ্ছিলেন, ভয় দেখাচ্ছিলেন।

ধমকানি এবং ভয়। জয়তী হাসল। আশ্চর্য! ভদ্রমহিলার জন্য কোন মমতা, কোন মোহ তার নেই। কোনদিনই ছিল না। থাকতে পারে না। থাকা উচিত না। জয়তী হাসল। হ্যাঁ। ঝাঁপিয়ে পড়তে না চাইলেও দূরে সরে থাকতে পারবে না। জয়তী পারে না। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়কে নতুন করতে, সুন্দর করতে শর্বরী অন্ততঃ একজনের সহায়তাও পাবে।

কিন্তু স্কুল আর সমাজের ভবিষ্যৎ-ভাবনা থেকে শর্বরীর আহ্বানের দাবীই বুঝি মনকে বেশী নাড়া দিচ্ছে। জয়তী না থাকলেও শর্বরী তার পথে এগোত। কিন্তু শর্বরী না এগোলে জয়তী বোধহয় কখনোই উদ্দীপ্ত হত না। কাজের থেকে মনের আহ্বান কেন বড় হয়? কেন জয়তী একলা চলতে পারে না? কলেজে প্রকাশদা বা মায়াদির সাহচর্য না পেলে আর দশটা মেয়ের সঙ্গে তার কোন তফাৎ থাকত কি? স্কুলে শর্বরীর একাকিত্বের অপমান ঘোচাবার তাগিদ না থাকলে কি সে এভাবে বনদির বিরুদ্ধে যেত?

হ্যাঁ। জয়তী দুর্বল। কিন্তু সে তুচ্ছ নয়। জয়তী দুর্বল।

কিন্তু তার মনটায় ঐশ্বর্য আছে। প্রত্যয়ের অবিচলতা না থাকলেও মনের এই ঐশ্বর্য নিয়েই সে শর্বরীর পাশে দাঁড়াবে।

কিন্তু তারপর? জয়ন্তী জানে না।

শর্বরীর দাবী কি গভর্ণিং বডি মানবে! নইলে কি বনদি শর্বরীকে তাড়িয়ে দেবেন? সেইসঙ্গে জয়ন্তীকেও? শর্বরী গেলে জয়ন্তীকেও যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ জোর না করলেও। কারণ শুধু সঙ্গীহীনই হয়ে পড়বে না, আত্মসম্মানেও বাধবে। বনদি তাকে শর্বরীর মত গুরুত্ব দেন না, পরিণত মনে করেন না—এই চিন্তা আত্ম-অভিমানে সত্যিই ঘা দেবে। তাছাড়া একবার মুখোমুখি বিরোধের পর বনদির স্কুলে চাকরি করা হয়তো শকুন্তলার পক্ষেও সম্ভব না। এবং জয়ন্তী যখন কিছুতেই শকুন্তলা হতে পারবে না, কিছুতেই না—তখন হেরে গিয়ে সেই স্কুলে কাজ চালিয়ে যাওয়া তার নিজের পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত না। শুধু তো আত্ম-অভিমান নয়, আত্মমর্যাদারও প্রশ্ন!

তাহলে জয়ন্তীর চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনের বাড়িটা আছে। মা আছেন, বাবা আছেন। বিল্টু আর নমু। কিন্তু জয়ন্তীর চাকরি নেই। মা আছেন তাঁর কান্না নিয়ে। বাবা আছেন তাঁর ঔদাসীন্য নিয়ে। বিল্টু আর নমু। কিন্তু জয়ন্তীর চাকরি নেই। কেঁপে উঠল। তা কি করে হয়? কি করে হবে?

অবিশ্যি আর একটা মাস্টারি জুটে যাবে। আজ না হোক কাল। তবু চাকরি খুইয়ে বাবা মার সামনে দাঁড়ানো কি যন্ত্রণা, জয়ন্তী তা বোঝে। কারণ শর্বরীর মত স্বপ্নদর্শী সে নয়।

জয়তী জানে যা উচিত এবং যাতে মঙ্গল—সহজে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে জানে পৃথিবীতে বহু অন্যায় এবং অবিচার সহ্য করতেই হয়। সহ্য করার মধ্যেও অনেক সময় জোর আছে। নিজের শক্তি না বুঝে বিদ্রোহ করায় শুভবুদ্ধির পরিচয় যতই থাকুক, পরিণত মনের প্রকাশ তাতে নেই। তাই অবস্থা এবং শক্তির পরিমাপ আগে চাই।

তাদের অবস্থা কি? শক্তি কতোটা? যাদের জন্য করতে যাবে, আগে তাদের পাশে না নিলে এই বিরোধের সার্থকতা কোথায়? চারুদি এবং হৈমদিকে শক্ত না করে তারা দুজনে কিসের শক্তিতে বনদির সামনে দাঁড়াবে? কি লাভ হবে তাতে?

না, লাভ নেই।

এতে মহৎ কাজের গৌরব আছে, কাঁচা বয়েসের রোমান্টিসিজম্ আছে, কিছুটা আত্মতৃপ্তির মিশেলও আছে বটে। শর্বরীর চোখে ছোট হয়ে যাবার ভয়ে বা চারুদি, হৈমদির ব্যঙ্গের আশঙ্কায় সে কিছুতেই বোকা, বোকা আর ব্যর্থ হতে পারবে না! অপেক্ষা করবে। শর্বরীকে বোঝাবে। চারুদিকে, হৈমদিকে, এমন কি শকুন্তলাকেও। যা চাই তা পাওয়াই বড় কথা। পেতে চেষ্টা করেছি—মূর্খের মত এই প্রবোধ বাক্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখায় কোন সান্ত্বনা নেই।

জয়তী সিদ্ধান্ত করল। আর নিশ্চয়তায় পৌঁছে অবাক হল সে। নিজের মনেই বুঝল, বড় হয়েছে। সত্যিই বড় হয়েছে। যা ভাল লাগে এবং উচিত মনে হয়—তখুনি তা না করার যে বিচক্ষণতা প্রকাশদার মধ্যে দেখেছে, মায়াদির মধ্যে দেখেছে, অনেক সময়

যে সতর্কতাকে সে মনে মনে তাচ্ছিল্য না করে পারে নি—আজ মনের মধ্যে হঠাৎ সেই পরিস্থিতিজ্ঞান এবং বিচারবোধের আবির্ভাব নিজের কাছেই জয়তীকে অনেকটা পরিণত প্রমাণ করল।

কারণ এই অবস্থায় বনদির বিরুদ্ধাচরণ করার যে উত্তেজনা, শর্বরীর সহকর্মী হওয়ার যে রোমাঞ্চ এবং শেষে চাকরি ত্যাগের যে মহিমা—তার বয়েসী একটি মেয়ের কাছে সে মোহ বড় মারাত্মক।

কিন্তু, নিজে সত্য হব—এই যার সাধ, সত্য হওয়া যার সাধ—তার সাধ্য এবং সাধনায় ত্রুটি থাকলে চলবে কেন? এই মুহূর্তে শর্বরীকে কত ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। বিল্কুর মত জেদী আর ছেলেমানুষ। অদ্ভুত মমতা হচ্ছে। কিছুটা যেন বাৎসল্যবোধ। আশ্চর্য! খানিক আগেই সে আফশোষ করছিল কোনদিনই বুঝি শর্বরীর মত হতে পারবে না।

মানুষের চাওয়ায় কত ভুল থাকে। কত ভুল। শর্বরীকে ভুল করতে দেবে না। কাল দু জনের সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। ওকে বোঝাবে। বলবে, চাকরি গেলে জয়তীর অনেক অসুবিধা। কিন্তু সে জানে জীবনের জন্যই জীবিকা। জীবনের প্রয়োজনে জীবিকা ছাড়তে সে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজই, কিন্তু এই মুহূর্তে, তার সার্থকতা নেই। সে বোঝাবে দায়িত্ব নিয়ে বাঁচা, বাঁচার জন্য অতন্দ্র প্রহরা দেওয়ার পথ নির্মম।

আশ্চর্য! অবাক হয়ে জয়তী আপন মনেই আবার বলল, আশ্চর্য। প্রতি মুহূর্তে এই বিস্ময়বোধ কি আশ্চর্য। জীবনটাই এক আশ্চর্য। পৃথিবীও বিস্ময়। আর জীবন আর পৃথিবী যে

মনটাকে আশ্রয় করে প্রতি মুহূর্তে সত্য হচ্ছে, মিথ্যে হচ্ছে, রঙ বদলাচ্ছে—তারও বিস্ময়ের সীমা নেই।

হেডমিস্ট্রেসের ঘর নয়, বনদির কান্না নয়। বনদির ধমক নয়, চারুদি আর হৈমদি আর শকুন্তলা নয়, শর্বরীও না—অথচ এই সব মিলিয়ে, সব জুড়ে, তার মধ্যে জয়তী নিজে, জয়তীর মন। যার কোন সীমা নেই।

সীমা নেই—এই তার এই মুহূর্তের উপলব্ধি। অবাক হল। আপন মনেই আবার বলল, আশ্চর্য।

॥ পাঁচ ॥

টিকিট ?

চমকে তাকাল। এতখানি চমকের কোন কারণ ছিল না। তবু কেমন যেন বোকা বোকা চোখে মুখ তুলল। কণ্ডাক্টর সামনে দাঁড়িয়ে। অল্প বয়েসী ভদ্রলোক। অন্ততঃ চোখে মুখে তাই লেখা। খাকি কাপড়ের ফুলপ্যাণ্ট আর সেই রঙেরই হাফ সার্ট। স্টেট বাস কণ্ডাক্টরদের ইউনিফর্ম। বেশ মানিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোককে।

চামড়ার ব্যাগটা তেরছাভাবে কোমরের কাছে ঝোলানো। কাগজের রিপোর্ট মনে পড়ল। এই ভদ্রলোকও কি বি. এ., এম. এ. পাস ? কিন্তু জয়তীর মনে যত সমবেদনাই থাকুক, এঁর চেহারায় কোন বিষাদের দৈন্য ফুটে ওঠে নি। কেমন সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সহজভাবে হাত পেতে পয়সা নিচ্ছেন। মধ্যবিত্তসুলভ আত্মাভিমান বা সংকোচ এঁকে এতটুকু কুশ্রী করতে পারে নি।

টিকিট ?

আবার জয়তী চমকাল। সে ভুলে গিয়েছিল পাশের ভদ্র-মহিলার টিকিট কাটা এইমাত্র শেষ হল। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলল। একতাড়া নোট। জয়তীর মাইনে, তার প্রথম উপার্জন। আশ্চর্য হল, খুশি হল। আশ্চর্য আর খুশি। জয়তী ভুলে গিয়েছিল। অথচ কেন এরকম ভুল হয় ?

এই টাকা ক'টার জন্য বাড়িতে মা অপেক্ষা করছেন। আহ্, জয়তীর একটা বাড়ি আছে। বাড়ি আর মা আর বাবা। বাবা কি খুশিতে হাসবেন ? আদর করে পিঠে চড় মারবেন ? মা কি খুশিতে কাঁদবেন ? মা ! বাবা ! খুশি আর কান্না। জয়তী খুশি,

কিন্তু তার কান্না নেই। রাস্তাটা কি অসহ্য দীর্ঘ। আর বাসটাও যেন গড়িয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে বাড়িতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। ঠিক এই মুহূর্তে, এই মেজাজে। বিল্কু রয়েছে। বিল্কু, নন্টু। নন্টুর আব্দার, বিল্কুর অভিমান। বাবা কি খুশি হবেন? আদর করে তার পিঠে চড় মারবেন? মা কি খুশিতে কাঁদবেন? মা! বাবা! খুশি আর কান্না। জয়ন্তী খুশি, কিন্তু তারও কান্না পাচ্ছে।

সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনের সেই ছোট্ট বাড়িটা স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই বাড়িটা। তাদের শোবার ঘরে ঢুকতে দরজার গায়ের দেওয়ালে সিঁদুরে আঁকা কালপুরুষের বিবর্ণ মূর্তি। তলায় কয়েক ফোঁটা ঘিয়ের অস্পষ্ট দাগ। নন্টুর মুখেভাতের সময় এক তাল ঘুঁটের ওপর কড়ি বসিয়ে তার তলায় সিঁদুরের এই কালপুরুষ চিহ্ন দিয়েছিলেন মা। সেদিন মার চোখে কান্না ছিল না। গোবর শুকিয়ে কয়েকদিন পরেই খসে গেছে। কিন্তু সিঁদুর আর ঘিয়ের চিহ্ন আজও মুছে যায় নি। অস্পষ্ট হয়েছে কিন্তু মুছে যায় নি। মার চোখও কেঁদে কেঁদে অস্পষ্ট হয়েছে কিন্তু অন্ধ হয় নি। বারান্দায় লোহার তারে জামা কাপড় শুকোচ্ছে। একটা কাক উঠোনের ছড়ানো বাসন থেকে ভাত খুঁটে খাচ্ছে আর চিৎকার করে ডাকছে। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কাক তাড়াচ্ছেন। আপন মনে বলছেন, কেউ শুনবে না জেনেও বলছেন, গেরস্থের ঘরে ডাকলে অমঙ্গল হয়।

সত্যি। তাদের মঙ্গল ছাড়া মা কোনদিন কি কিছু চেয়েছেন, কোনদিন? মঙ্গলের ধারণায় তাঁর ভুল থাকতে পারে। আর থাকবে

নাই বা কেন ? মার দীর্ঘ জীবনে ব্যাপ্তি কই, বৈচিত্র্য কোথায় ? পুরুষানুক্রমের শিক্ষা বা সংস্কারকে অতিক্রম করার স্পর্ধা তিনি কি ভাবে পাবেন ? আহা, মার যা কিছু স্বপ্ন, সাধ—সবই তো তাদের ঘিরে। তাদের মঙ্গল ছাড়া কোনদিন কি কিছু চেয়েছেন তিনি, কোনদিন ? আর জয়তী তো জানে সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনের এই ছোট্ট বাড়িটা কত নিরাপদ। গানের মতো সুরেলা মনে হল কথাটা। কত নিরাপদ এবং নিশ্চিত। এই চৌহদ্দির বাইরে যে বিরাট পৃথিবী—সেখানে কতো দ্বন্দ্ব, সংশয়।

নিজের কাছে সে কথা অস্বীকার করার তো উপায় নেই। শুধু পারিবারিক বন্ধন নয়, নিছক কর্তব্যজ্ঞান নয়, অধিকার-বোধ বা দায়িত্বের চেতনাও না—এই বাড়িটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলে নিজের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করতেই অবাক লাগে। বাইশ বছরের অভ্যাস, অভ্যাস এবং অন্য কতকগুলি বোধ আর বৃত্তি আজও তাকে কতটা পরনির্ভর করে রেখেছে। তাই শত অভিযোগ এবং বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও মাথার ওপর মা ভদ্রমহিলা আছেন—এ কথা ভেবে জয়তী স্বস্তি পায়। সারা সকাল বাইরে থাকতে হয়তো একবারও বাড়ির কথা মনে পড়ে না। কিন্তু ছুটির পর দমদমের বাসে চড়ে যখনই সে কল্পনা করে ঘরে বিল্কু তার শাড়ি-গামছা তৈরি রেখেছে, মা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন—তখনই খুশি আর আলস্যে, খুসি আর আলস্যে তার সমস্ত কটা ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে। আর ভাবতে অবাক লাগে হস্টেলে থেকে শর্বরীর দিন কাটে কি ভাবে ?

অর্থাৎ, যতোই মাস্টারি করুক—সুহাসিনীর বাইরে তার আবার এক নতুন অস্তিত্ব। তখন সে দিদিমণি নয়, জয়তী। কতগুলো

অবাধ্য মেয়েকে সামলে লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব আর নেই। এখন সে নিজেই অবাধ্য হয়ে লেখাপড়া শিখতে না যেতে পারে। আর চারুদি বা হৈমদির সঙ্গ নয়—কলেজে প্রকাশদা, মায়াদির সাহচর্য। তারপর একটি বিকেল, বিকেলের রোদ। একটি সন্ধ্যা, সন্ধ্যার আলো অন্ধকার। আসাদ!

একটা দিনে এক পৃথিবীর আয়ু তার শেষ হয়েছে। এবার অন্য পৃথিবী, অন্য জয়তী। সত্তায় তার নতুন জন্ম। জয়তীর যা বয়েস, যা স্বভাব, যা তাকে মানায়—সেই সহজ স্বাভাবিকতার পেখম মেলে ধরা। ডানা ছড়ানো।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। সকালের মতই একটা দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠতেই আর একটা দৃশ্যের শুরু। দৃশ্যের পর দৃশ্য। ঢেউয়ের মত, মিলিয়ে যায় অথচ আবার আসে। কিন্তু দৃশ্যের চেহারা পালটেছে। কারণ দিনেব চেহারার বদল ঘটেছে। মাথার ওপর সূর্য, চড়া রোদ। রাস্তায় ভিড়, ব্যস্ততা। জীবন দ্রুত। দ্রুত আর প্রকট। শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, রূপে যতদূর চোখ যায়, যা কিছু চোখে পড়ে—জীবন দ্রুত। দ্রুত আর প্রকট। প্রদোষের কলকাতা এবং উপকণ্ঠে চরিত্রেব তফাৎ থাকলেও মধ্যাহ্নের শহর এবং শহরতলীতে স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম নেই।

চিড়িয়ার মোড়ে একটি অন্ধ বুড়ো গান গেয়ে ভিক্ষে চাইছে। জয়তীর ইচ্ছে লোকটাকে কিছু সাহায্য করে। সমাজব্যবস্থার বদল না ঘটিয়ে মানুষকে ভিক্ষে দেওয়ার আত্মসন্তুষ্টি প্রতিক্রিয়াশীল—শর্বরীর মতো এ জাতীয় নীতিবোধ জয়তীর নেই। খুব যে একটা দাতাকর্ণ গোছের, তাও নয়। হঠাৎ ইচ্ছে হল, মাইনেও পেয়েছে।

কিন্তু তার জানলার পাশে ভিক্ষুক ভদ্রলোক পৌঁছবার আগেই বাস ছেড়ে দিল। একবার ভাবল পয়সাটা ছুঁড়ে দেয়, আবার কেমন সংকোচ হল। পরে যখন এই দ্বিধার জন্য নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে, তখন বাসটা আবার পরের স্টপেজে থেমেছে।

বস্তির সামনে সেই চাপা কলে এখন ভিড় নেই। সামনের এক টুকরো জমিতে অনবরত জল জমে কাদা আর শ্যাওলা হয়েছে। তার ওপব একটা বড় পাথর বসানো। এই পাথরের বুকে পাত্র রেখে সকলে জল ভরে বা বসে স্নান করে। পাথরটা অনবরত জল পেয়ে কেমন পরিষ্কার আর চকচকে। একটা ছাগল তার ওপর শুয়ে আছে। একটু দূরে একজন হিন্দুস্থানী বুড়ি অনাবৃত পিঠের ওপর একরাশ কাঁচাপাকা চুল ছড়িয়ে আঁচল থেকে ভুট্টার খই তুলে চিবোচ্ছে আর ছাগলটার দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসছে। গাছতলাটায় অনেকগুলো এঁটো শালপাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে। কিছু হিন্দুস্থানী মজুর একটা ছাতুওয়ালাকে ঘিরে বোধহয় এইখানেই দুপুরের আহাব সেরেছে। কিন্তু বুড়ি এমন নিশ্চিন্ত স্নেহে প্রশ্রয়ের হাসি হাসছে কেন? জয়তী ভেবে অবাক হল। দিদি এভাবে হাসতে পারত। দিদিটা কেমন আছে? একা রমেনদা ওর জীবনে বাবা, মা, জয়তী, বিল্কু, নন্নু—সকলের অভাব দূর করতে পেরেছে? আসাদ কি তার জীবনকেও এমনি এক নতুন ছাঁচে ঢালবে। দিদি পেরেছে, সে কি পারবে? কিন্তু কি ভাবে? পারলেও কি তা উচিত? এই দিনে, এই অবস্থায়?

আহ্। আবার সেই দুঃসহ দ্বন্দ্ব। জয়তী এখন ওকথা চিন্তা করবে না। সে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। বাবা কি খুশি

হবেন? আদর করে পিঠে চড় মারবেন? মা কি খুশি হয়ে একটু একটু কাঁদবেন? বাবা! মা! খুশি আর কান্না। কিন্তু তার হাসি পাচ্ছে, কান্না পাচ্ছে। মাইনে পেয়ে দিদিকে একটা উপহার দেবে ভেবেছিল। কি দেওয়া যায়?

সেভেন ট্যাঙ্কস্। কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে উঠল। যান্ত্রিক গলা। যে সব স্টপেজের কোন না কোন নাম আছে—সেই সমস্ত জায়গায়ই সে এমন যান্ত্রিক গলায় চিৎকার করে ওঠে। কলেজে এই গলায় ভদ্রলোক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? হাসি পেল। দুঃখবিলাস। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে টাল খেল। বলল, একটু বাঁধবেন।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জয়তীর মনে হল মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে বা অন্যকে জুড়ে এ জাতীয় দুঃখবিলাসের মানসিকতা. কেন তাকে পেয়ে বসছে? কেন সে যা বাস্তব তাকে সহজে বা অকুণ্ঠতায় মেনে নিতে পারে না? মানতে হবে, এ বোধ যখন আছে—মানতে না পারার যন্ত্রণা তখন কি দুঃসহ। জয়তী বোঝে সত্য কি, বাস্তবতা কোথায়। যদি না বুঝত, যদি অন্ততঃ মনের কাছেও বুঝতে না পারার ভাণ চলত—তা হলে কি মুক্তি। অনায়াসে যা ভালো লাগে—আহা, যা ভালো লাগে, যা ভালো লাগা উচিত, যা ভালো লাগাতে হয়—তার স্রোতে জীবনের ডিঙিটাকে ভাসিয়ে দিয়ে বহু পরিচিত কোন এক বন্দরে আশ্রয় নিতে পারতো। দিদির মত, শকুন্তলার মত।

কিন্তু এ কি করছে জয়তী? আজ দিদিকে এত সহজে শকুন্তলার আসনে বসাতে পারল? জয়তী তো জানে নিজের প্রতি

কর্তব্য করা সব সময় স্বার্থপরতা নয়। এবং কত কষ্টে, কত যন্ত্রণায় মানুষ সে পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। দিদি বেঁচেছে। রমেনদা বেঁচেছেন। জীবন আর যৌবনের দাবি যে মেটাল—তাকে কোন্ স্পর্ধায় জয়তী নিন্দে করবে?

তা হলে কি জয়তীর মনের মধ্যেই একটা চোর লুকিয়ে আছে? সেই চোরটা কি চেয়েছিল দিদি আজীবন চাকরি করে সংসার চালাবে? বাবা আদর করে পিঠে চাপড় দেবেন, মা আনন্দে আর দুঃখে চোখের জল ফেলবেন—আনন্দে আর দুঃখে। তারা ভাই বোন প্রতিটি ব্যাপারে দিদির ওপর নির্ভর করবে। দশজন বলবেন মেয়েটা কি মহৎ, কি দরদী, কি কর্তব্যনিষ্ঠ! আর দিদি দিন দিন শুকোবে, আর দিদি দিন দিন খিটখিটে হবে, আর দিদি দিন দিন মরবে অথচ দশজন অনবরত বলতে থাকবেন কি মহৎ, কি দরদী, কি কর্তব্যনিষ্ঠ! দিদির জীবনের ভাঙ্গা স্তূপ থেকে জয়তীর প্রাণের অঙ্কুরটুকু রস আহরণ করবে, মাথা তুলবে, আকাশ ছাড়াবে। দায়িত্ব নেই, ছোট বোনটি সেজে থাক এবং কলেজে যাও। সখ করে দেশের মানুষকে ভালবাসো, দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাও, আসাদের সঙ্গে প্রেম কর। তারপর বাড়ি ফিরে দিদিকে বল—সত্যি, তোমার তুলনা নেই।

এই কি চেয়েছিল? চিন্তা করতে গিয়ে সমস্ত মাথাটা গরম হয়ে উঠল। বুকের ঠিক মধ্যিখানটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বিরক্তিতে রাস্তার ওপর একবার পা ঠুকল। একটা নোংরা কালো গিরগিটি দ্রুত নর্দমার দিকে নেমে গেল। গুপ্তদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে

বাচ্চা যে ছেলেটা খুশি হয়ে আঙুলের আচার চাটছিল, সে অবাক হয়ে তাকাল।

কিন্তু জয়তীর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে যাচাই করতে হবে। নইলে গ্লানি ও লজ্জায় সে মরে যাবে। হঠাৎ যেন রাস্তার নালা থেকে সেই কুৎসিত গিরগিটিটা পিছলে উঠে এসে লাল দুটো চোখ মেলে জয়তীর দিকে তাকিয়েছে। অথচ তার শরীর ক্রমশঃ বড় হচ্ছে, সাপের মত সরু এবং লিকলিকে। তারপর একটা বিরাট ময়াল সাপ রাস্তা থেকে পিছলে উঠে পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। পাক দিচ্ছে। পাকের পর পাক। পিছল শরীরের ওপর চাকা চাকা দাগ, পিছল মনের ওপর চাকা চাকা ক্ষত। রক্ত নেই, পুঁজ নেই, বিবর্ণ ক্ষত। বালির মত রুগ্ন আর পাংশু। ক্ষত ছড়িয়ে যাচ্ছে, বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনের কালো পিচের রাস্তায় বালি, বালি, বালি। শুকনো মরুভূমির ওপর একা জয়তী দাঁড়িয়ে। জয়তী নয়, দিদি। দিদি না, হৈমদি। আর সেই ময়াল সাপটা বালির তরঙ্গ থেকে পিছলে উঠে সেই অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তিকে জড়িয়ে ধরছে। পাক দিচ্ছে। পাকের পর পাক। পিছল শরীরের ওপর চাকা চাকা দাগ। পিছল মনের ওপর চাকা চাকা ক্ষত। রক্ত নেই, পুঁজ নেই, বিবর্ণ কতগুলো চিহ্ন। বালির মত রুগ্ন, পাংশু।

আহ্। একটা দুঃস্বপ্ন যেন জয়তীকে তাড়া করছে। স্বপ্নের পেছনে অবচেতন মনের ভাবনা বা কামনা থাকে। কিন্তু জয়তী তো এ চায় নি, এ কথা ভাবে নি। চায় নি বা ভাবে নি। তবে এই দুঃস্বপ্ন কেন? এই কি মানুষের নিয়তি?

এই কি জীবনের, যৌবনের, ভাল-লাগা এবং ভালবাসার ফলশ্রুতি ?

মুক্তির পথ ছিল না, পথ নেই।

দাদা মানুষকে ভালবেসে মানুষের হাতে খুন হয়েছেন। বুড়ো বাবা রোজগেরে ছেলের হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে এই বয়েসে নিশ্চিন্ত আলস্যে পৃথিবীর স্বাদ যাচিয়ে দেখতে পারছেন না। দিদি থাকলে তাকেই দায়িত্ব নিতে হত। আজ জয়তীকে নিতে হয়েছে। বিল্কু বড় হবে, তারপর নন্নু বড় হবে, তবে জয়তীর ছুটি। হয়তো বিল্কু—না, বিল্কুকে এই দুঃসহ পথে সে পা বাড়াতে দেবে না। হয়তো নন্নু বড় হয়ে যে নতুন সন্তানটি মার কোলে আসছে—আশ্চর্য, যে নতুন সন্তানটি এই সংসারে আসছে, তার দায়িত্ব নেবে। তখন জয়তীর ছুটি। কিন্তু ততোদিনে কি তার সমস্ত অস্তিত্বটা সাপের পাকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মরুভূমির সঙ্গে মিশে যাবে না ? হয়তো সেদিন হাওয়ায় শুধু ধুলোই উড়বে। বঞ্চনা, ব্যর্থতা এবং মহত্ববোধের আত্মসন্তুষ্টির। কিন্তু ফুল ফুটবে না।

মুক্তির পথ ছিল না, পথ নেই। হয় দিদিকে মরতে হত, নয় তাকে ক্ষইতে হবে। এই জীবনের নিয়তি। তার জীবনের, যৌবনের, ভালো-লাগা এবং ভালবাসার ফলশ্রুতি। কলেজে যাবে, পরীক্ষায় পাস করবে, মাস্টারিতে কায়েম হবে। সকালে মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মানুষ বাঁচে কেন ? সে কেন বাঁচবে ? এখন বুঝছে কেন জয়তী বাঁচবে। কর্তব্য পালন করার জন্য। যতক্ষণ ভালো লাগবে ততক্ষণ, যখন ভালো লাগবে না—তখনও।

অথচ তার জন্ম হয়েছিল বাবা মার কতো স্বপ্ন, সাধ, আনন্দ, বেদনার মুহূর্ত পেরিয়ে। বিল্কুর তাই, নম্নুরও তাই। কিন্তু এই এক একটি জন্মের মাশুল গুণবার জন্য পরবর্তী কালে যেমন বাবা আর মা বদলেছেন, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন, যেমন আজ আবার একটি নতুন জন্মের সামনে দাঁড়িয়ে মা লজ্জিত, বাবা ক্ষুব্ধ— তেমনি জয়তীকেও দিনে দিনে বদলাতে হবে। এই এক একটা জন্মের মাশুল গুণবার জন্য সে নিজের চেতনায় গুমরে ওঠা সমস্ত সৃষ্টিপ্রবণতাকে গলা টিপে মারবে, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লজ্জা পাবে, ক্ষুব্ধ হবে। দিনে দিনে সেও বদলাবে। এইজন্য হৈমদি বেঁচে আছেন, এইজন্যই জয়তীও বাঁচবে।

অথচ কালও হৈমদিকে বোঝাচ্ছিল—পৃথিবীটা একদিন বদলাবে। বদলাবে, সুন্দর হবে। যেমন অনেক দেশে হয়েছে, হচ্ছে। ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং মানুষের ওপর যে বিশ্বাস গত কয়েক বছরে আয়ত্ব করেছে—তাতে সে জানে তা হবে। তা-ই হবে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, দেরি আছে। শিশুর মত হৈমদিকে বোঝানো যায়, নিজেকে না। দেরি আছে। আর ততোদিনে জয়তীর অস্তিত্ব এক হয়ে গেছে সেই মরুভূমির সঙ্গে। ফুল একদিন ফুটবে। কিন্তু জয়তী দেখে যাবে না।

প্রকাশদা বলবেন, কি হয়েছে তাতে? আমার ভূমিকা পালন করে যাই, ইতিহাসের দায়িত্ব তার কর্তব্য মানা। শকুন্তলা কোন চিন্তা না করে যেমন নিশ্চিন্তে আছে, প্রকাশদাও তেমনি নিশ্চিন্ত নিজের বিশ্বাসের যাথার্থে। হিংসে হয়। যদি ভোঁতা

হত, কিংবা প্রত্যয়ে থাকতো নিঃসংশয় আস্থা—তা হলে কি মুক্তি!

কিন্তু জয়তীর মুক্তি নেই। ভাব আর ভাবনা, স্বপ্ন আর বাস্তবতা, উপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষের দুঃসহ দ্বন্দ্বে জয়তী দুলছে। দুলছে। এই জন্যই সে বাঁচবে। এই জন্যই মানুষ বাঁচে।

॥ ছয় ॥

রোদে পুড়ে আসার পর স্নান যে নিছক ক্রিয়া নয়, একটা ঘটনা—জয়তী আজ তা আবিষ্কার করল। বালতি বালতি জল মাথার ওপর ঢালল। চোখ দুটো প্রথমে জ্বালা করে উঠল। যেন শুকিয়ে, পুড়ে গিয়েছিল। হাত দিয়ে চোখ জোড়া একবার রগড়াল। জলের স্পর্শে দুটো চোখ অভ্যস্ত হওয়ার পর মনে হল সমস্ত শরীরটাই যেন জুড়িয়েছে।

তারপর মনে পড়ল মার স্নান হয় নি, অথচ জলও বেশি নেই। চৌবাচ্চার ভেতরে শ্যাওলা পড়েছিল, ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে কেউ পরিষ্কার করেছে। বোধ হয় বিল্কু। শ্যাওলার হালকা সবুজ রং সিমেন্টের চৌবাচ্চার বুকে পাকা হয়ে গেছে। তার ওপর ঝাঁটার কাঠির সাদা সাদা দাগ।

চেয়ে দেখল শাড়ি পুরো ভেজে নি। এখানে ওখানে কাপড় শুকনো থাকলে স্নান অসম্পূর্ণ মনে হয়। কিন্তু কয়েক বালতি জল ঢেলে শাড়ি ভেজানো যেন অপচয়। কাঁধের ওপর থেকে আঁচলটা টেনে নামাল। জল তুলবার জন্য চৌবাচ্চার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ছায়া পড়েছে। জয়তীর শরীরের ছায়া। হালকা সবুজ রঙে সাদা সাদা দাগ। তার ওপর জয়তীর শরীর। জলের পাটিতে এক আশ্চর্য ছবি!

অবাক হয়ে চিন্তা করল এই শরীরটাকে আশ্রয় করে সে বেঁচে আছে। এই শরীরেই তার মন ছড়িয়ে। অথচ নিজের দেহ সম্পর্কে জয়তীর অভিজ্ঞতা কত কম। আস্তে আস্তে দুটো হাত

দিয়ে মুখ ঢাকল। জয়তীর শরীর, জয়তীর মন, সে হাত দিয়ে স্পর্শ করছে। নিজেকে ছুঁয়ে দেখছে। বিস্ময় আর পুলকে, বিস্ময় আর পুলকে তার রোমাঞ্চ। আস্তে আস্তে গালের ওপর কটা আঙুল নড়ছে। কিন্তু জয়তীর আঙুল তো এত শক্ত নয়। কার হাত? জয়তীর গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে কার আঙুল?

লজ্জায় মরে গিয়ে মনে পড়ল কার হাত। আশ্চর্য, আসাদের ছিটের জামার গোটানো হাতাটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে এত ভিক্ষুক হয়ে উঠেছে? এরপর ওর দিকে মুখ তুলে চাইবে কি করে? অন্যায় নয়, জানে। তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর জীবনের অবশ্যম্ভাবিতা নির্ভর করে না, জানে। অস্তিত্বের মৌলিক নিয়ম তার দ্বিধা বা সংশয়ের তোয়াক্কা করে না, তাও জানে। তবু নিজের কাছে এই আশ্চর্য বাস্তবতাকে স্বীকার করায় কি লজ্জা, কি দৈন্য। জয়তী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এক বালতি জল তুলে আঁচলটা চুবিয়ে নিল। বালতির দু-তিন জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। জল থাকে না। জয়তীদের বাড়িতে একটা আস্ত বালতিও নেই। এতগুলো মানুষ নিয়ে সংসার ফেঁদে আছে। অথচ কতকিছুর অভাব। নিজের বাড়ি নয়, নিজের গাড়ি নয়, ফুলের গাছ পুঁতবার জন্য এক টুকরো জমি নয়। নিজেকে সাজাবার জন্য কিছু অলংকারও না। নিত্য প্রয়োজনের সামান্য কিছু আসবাব। রান্নাঘরে, স্নান ঘরে, শোবার ঘরে। অথচ জীবন কত সুন্দর, সুন্দর আর গোছানো হতে পারে তা জয়তী জানে। জীবনকে সুশ্রী, সুপরিকল্পিত করার জন্য কত আয়োজন, তাও জয়তীব অজানা নয়।

একটা আস্ত বালতি কেনার অর্থ তাদের নেই, এ কথা সত্যি নয়। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই অভাব মানুষের রুচি বা অভ্যাসকে কি ভাবে পঙ্গু করে—জয়তী মাঝে মাঝে তা লক্ষ্য করেছে। ফুটো বালতিটা প্রত্যেককে অসুবিধেয় ফেলছে, সকলেই বিরক্ত। কিন্তু কেমন যেন বোঝাবুঝি আছে—এর জন্য আক্ষেপ করলেই যথেষ্ট। বালতিটা যতদিন না সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, ততদিন এতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। তারপর কোনভাবে টাকা যোগাড় হবে, নতুন বালতিও আসবে। যোগাড় হবে, অর্থাৎ অন্য একটা খরচ কমাতে হবে। কিন্তু এই খরচ আগে কমিয়ে সময় থাকতে একটা বালতি কেনার উৎসাহ কারোরই যোগাবে না।

গামছা দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে চিন্তা করল জমা এবং খরচ—এই দুটো শব্দ কে আবিষ্কার করেছিল ? তিনি কি জানতেন একদিন পাঁচটি মাত্র অক্ষরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর কয়েক কোটি জীবন এভাবে মেপে মেপে আয়ুর কর গুণবে ? বাড়ির হিসেবের খাতাটা মনে পড়ল। আগে দিদি লিখত, তারপর জয়তী, আজকাল লেখে বিল্টু। বাড়ির জমা-খরচ লেখবার একটা বয়েস আছে কিন্তু লেখাবার কোন বয়েস নেই। রোজ রাতে মা-ই এখনো বিল্টুকে বসিয়ে সারাদিনের হিসেব লেখান। এই বিশ্রী দায়িত্ব থেকে বছর কয়েক পরে বিল্টুও অব্যাহতি পাবে, হয়তো ভার নেবে নন্টু। কিন্তু বেঁচে থাকলে সেদিনও মা তাকে ডেকে বসিয়ে হিসেব লেখাবার দায় থেকে রেহাই পাবেন না।

সেদিন কেমন হবে মার চেহারা ? কেমন দেখাবে নন্টুকে ? জয়তী চিন্তা করতে পারল না। দিদিকে দিয়ে মা যখন হিসেব

লেখাতেন, তখন কেমন দেখতে ছিল তাঁকে? চেষ্টা করেও মনে আনতে পারছে না। বারবার মার এই একই চেহারা চোখে ভাসছে। কপালে সিঁদুর, ঘামে তেলে লেপ্টে গেছে। আর শীর্ণ, ক্লান্ত একটা মামুলী চেহারা। বাংলা দেশের মায়ের চেহারা। মা তাদের সংসারের জমা-খরচ খতিয়ে প্রতিদিন হিসেব লেখাচ্ছেন। কিন্তু নিজের জমা-খরচ কি তিনি কোনদিন কষেছেন? কোনদিন?

ভাবতে অবাক লাগল। এ প্রশ্ন মাকে করলে তিনি তাজ্জব হবেন। কারণ নিজের সম্পর্কে এ প্রশ্ন যে করা যায়, তাই বোধহয় আজো জানেন না। সরলরেখার মত জীবনকে ছকে নিয়েছেন। মা, নিজের সন্তানদের তাঁকে দেখতে হবে, বড় করতে হবে। বড় আর মানুষ। কিন্তু শুধু তো মা-ই নন, তিনি একজনের স্ত্রী। এতদিন স্ত্রীর কর্তব্য পালন করেছেন কিভাবে? পৃথিবীতে কয়েকটি প্রাণের আবির্ভাব ঘটিয়ে আর স্বামীর আয়ে সংসারের হালটা কোন রকমে ঘুরিয়েই কি সেই দায়িত্ব পূর্ণ হয়েছে? এবং শুধু তো স্ত্রী-ই নন, তিনি একটি মানুষ। মানুষ হিসেবে নিজের প্রতি তাঁর যেটুকু করণীয় ছিল, স্বামী এবং সন্তানের জন্য নিজেকে নির্বিচারে উৎসর্গ করার মধ্যেই কি তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে?

ছেলেবেলায় মার কি কোন স্বপ্ন ছিল না? স্বপ্ন আর সাধ আর সম্ভাবনা? যৌবনে মার কি কোন স্বপ্ন ছিল না? স্বপ্ন আর সাধ আর সম্ভাবনা? তা কতখানি সার্থক হয়েছে? আদপেই কি কিছু হয়েছে?

আশ্চর্য! এই দীর্ঘ জীবন মার সঙ্গে অহরহ কাটিয়ে কতটুকু সে মাকে চিনতে পেরেছে? কতটুকু? মায়ের শরীর থেকে জন্ম

নিয়ে, মায়ের আঁচল ঘিরে বড় হয়ে কতটুকু সে মাকে চিনতে চেয়েছে? কতটুকু?

ভেজা গামছাটা নেংড়াতে নেংড়াতে জয়তী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। অথচ ঐ জমা-খবচেব খাতার পাতায় মা কিভাবে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়েছেন। সংসারের যা আয়, যা প্রয়োজন, যা ব্যয়—তাব সামঞ্জস্য-বিধানে কি অসীম ধৈর্য, ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতার পরীক্ষা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে দিতে হচ্ছে। সকলে চেয়েই খালাস। তাঁকে যোগাতে হয়েছে। যখন পারেন নি, তখন আক্ষেপ করেছেন বা অভিযোগ জানিয়েছেন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। কেঁদেছেন।

ব্যস। মার অধ্যায় এইখানেই শেষ। বৈচিত্র্য নেই, জটিলতা নেই। বাংলা দেশেব একটি মা, পৃথিবীব একটি জননী—কয়েকজনকে যিনি সৃষ্টি কবেছেন এবং যাদের মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকপুরুষেব সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলবে—তাঁর জীবন এতো সহজ।

কাব্যের মত শোনাচ্ছে। জয়তী নিজেকেই ব্যঙ্গ করল। দুঃখে তার হাসি পেল। ডান পায়ের পাতাটা গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে চিন্তা করল, জীবনেব যন্ত্রণা নিয়ে কাব্য করায় সুখ আছে। যন্ত্রণার মর্যাদা ঐটুকুই।

একটা শুকনো কাপড় জড়িয়ে বাইরে এল। দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বারান্দাব তারে ভেজা শাড়ি মেলে দিল। তারপর শরীরটা অর্ধবৃত্তের মত পেছনদিকে বাঁকিয়ে শুকনো গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে চেঁচিয়ে বলল, মা ভাত।

রান্নাঘর থেকে মাও চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, তরকারিতে ফোড়ন বাকি। তুই এসে বোস না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার জয়তী বিরক্ত হল। চিরুনির শলা কয়েকটা ভাঙা। আয়নাটাও এত ছোট যে অসুবিধে হয়। চিরুনি আজই কিনতে হবে। বড় একটা আয়নার দাম কতো পড়বে? আয়না না হয় কয়েক মাস পরেই কেনা যাবে।

হেসে ফেলল। আয়নায় নিজের হাসি দেখে আবার হাসি পেল। আগে হাতে পয়সা পেলে সিনেমা দেখা বা বই কেনার প্ল্যান কষতো। আজ জয়তী মুখোপাধ্যায় মাইনে পেয়ে কেমন অক্লেশে চিরুনি, বালতি কেনার পরিকল্পনা করছে। অন্যদিন এই গৃহিনীপনায় নিজেকে সে ব্যঙ্গ করত। অথচ আজ মনে ঠাট্টার ভাষাও যোগাচ্ছে না। তা হলে জয়তী শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য মাস্টারিই শুরু করে নি, সেই সঙ্গে তার মনে সাংসারিক বৃত্তিটাও সংগোপনে দানা বেঁধেছে।

সাংসারিকতা কি মানুষের রক্তে, না এ নতুন অবস্থা বিন্যাস, দায়িত্ববোধের প্রকাশ? হয়তো দুইই। জয়তী ভাবতো সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যেই বুঝি তার দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বাইরে সে অবাধ আর ছেলেমানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রতিদিন অস্তিত্বের এই ভাঙাগড়ায় ব্যক্তিত্বেরও একটা গুণগত পরিবর্তন অনিবার্য। জয়তীর পক্ষে আর কোনদিন, কোনদিন এবং কোন অবস্থাতেই বোধহয় আগের সেই দায়িত্বহীন ছেলেমানুষিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

কালো ফিতেটা দিয়ে ঘাড়ের ওপর চুলের গোড়া শক্ত করে বাঁধল। বিল্কু ফিতে নেয় নি। কি জেদী মেয়ে! কিন্তু এখন এই জেদের জন্য রাগ হচ্ছে না। জেদ থাকা ভালো। জয়তীরও ছিল। এই জেদের জন্যই নাটকীয়ভাবে প্রকাশদার সঙ্গে আলাপ।

তখন ফার্স্ট ইয়ারের শুরু। স্কুল টিচাররা লাটসাহেবের বাড়ির সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের সমর্থনে কলকাতার সমস্ত স্কুলে কলেজে স্ট্রাইক্। স্কটিশ চার্চ কলেজের চওড়া লোহার গেটটার সামনে প্রকাশদা, মায়াদি, আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। সামনের ফুটপাত, রাস্তা আর ওপাশে হেদোর সবুজ রেলিং পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাত্র ছাত্রীরা আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে জটলা করছে। সকালের কাগজ পড়ে অনেকেই মোটামুটি উত্তেজিত। এমন সময় প্রফেসর মিস্ দাশ এলেন। তাঁর পেছনে কয়েকটি মেয়ে। প্রকাশদাকে লক্ষ্য করে মায়াদির দিকে চেয়ে বললেন, এভাবে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে হুজ্জোতি করতে লজ্জা করে না?

ছাত্ররা অনেকেই দূর থেকে মিস্ দাশকে দেখে টিটকিরি দিয়ে উঠেছে। তাঁর পেছনের মেয়ে কটি লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দোষ নেই, ডাণ্ডাস হস্টেলে থাকে। মিস্ দাশ ধরে এনেছেন।

তোমরা জোর করে কাউকে আটকাতে পার না। যাদের সমর্থন আছে তারা বাইরে থাক, যারা ক্লাস করতে চায়—তারা ভেতরে যাবে।

প্রকাশদা মুচকি হেসে সবিনয়ে বললেন, কাউকেই আমরা জোর করি নি। শুধু অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিস্ দাশ ধমকে বললেন, এই তো এতগুলি ছাত্রী এখানে দাঁড়িয়ে। এরা তোমার মত বাপ-মায়ের টাকা নষ্ট করে কলেজে পলিটিক্স করতে ঢোকে নি। এরা সকলেই যাবে।

প্রকাশদা আবার মুচকি হেসে বললেন, আমি বলছি এঁরা কেউ যাবেন না। শুধু হস্টেলের ছাত্রী কটি আপনার ভয়ে—

থামো। মিস্ দাশ ধমকে উঠলেন। কাছেই জয়তী ছাড়া কয়েকটি ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখিয়ে বললেন, এরা হস্টেলে থাকে না। বুঝলে, দে আর নট বোর্ডার্স। এগিয়ে এসে জয়তীর হাত ধরলেন। বললেন, চল, আমার সঙ্গে এস। দেখছ না সিঁড়িতে প্রিন্সিপাল দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন?

আর হঠাৎ জয়তীর কি যেন হল। কি যেন হল জয়তীর। দেখল ভেতর থেকে ডক্টর টেলার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়ে আছেন। দেখল বাইরের এতগুলো ছেলেমেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে তাকে দেখছে। আর জয়তীর কি যেন হল। স্পষ্ট বলল, না, আমি ক্লাস করব না।

সেইদিনই মায়াদি ধরে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, প্রকাশদার সঙ্গে আলাপ হল। সেই একটি ঘটনায় কলেজের প্রত্যেকে তাকে চিনে নিল। মিস্ দাশ প্রতিটি ক্লাসে অপদস্থ করতে লাগলেন। আর একটা জেদে, একটা তীব্র জেদে, জয়তী মায়াদির সঙ্গে, প্রকাশদার সঙ্গে আরো বেশি করে মিশে কলেজের প্রতিটি কাজে,

প্রতিটি ঘটনায় একেবারে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল। উত্তেজনায় যার শুরু, পরে তা-ই বিচারবোধ এবং রুচির প্রয়োগে ধীরে ধীরে একটা সহজ রূপ নিল।

হয়তো এই জেদ থেকেই বিল্কুর চরিত্রের এক বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ঘটবে। বিল্কু ফিতে নেয় নি। কিন্তু এখন সে কথা ভেবে রাগ হচ্ছে না। জেদ থাকা ভালো। ওর জন্য একটা ফিতে কিনতে হবে। ফিতে নয়, ট্যাসেল। ট্যাসেল দেখলে মেয়েটা খুশিতে আর বিস্ময়ে নিশ্চয়ই সমস্ত রাগ ভুলে যাবে। টাকা পেলে জয়তীর এই এক রোগ। কতজনকে কতকিছু কিনে দিতে ইচ্ছে করে। সম্ভব অসম্ভব অজস্র কল্পনায় মনটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অথচ কত অসহায় সে। প্রথম উপার্জন জয়তীর জীবনে যত বড় ঘটনাই হোক, এই পৃথিবীটার কাছে তার কোন আলাদা তাৎপর্য নেই। বাবার নিয়মিত রোজগার এবং জয়তীর প্রথম মাইনে—তুয়ের চরিত্রই সেখানে এক। কারণ গতিও এক।

দাঁত দিয়ে ফিতে কামড়ে ধরে মোটামুটি গোছের একটা বিনুনি বাঁধল। খেয়ে এসে শাড়ি বদলাবে। নইলে শুধু শুধু ভাঁজ ভেঙে যাবে। সাতদিন যখন চালাতেই হয় তখন একটু সতর্কতা প্রয়োজন। অবিশ্যি এই সতর্কতার পেছনে সজাগ মনের নিরন্তর প্রহরা নেই। অবস্থার সীমাবদ্ধতাজনিত অভ্যাসই অবচেতন মনে কাজ করে, চেতন মনে কাজ করায়। ব্লাউজের হাতা এখনই সেলাই করে রাখতে হবে। ঘাড়ের কাছে সুতো ছিঁড়ে আসছে। আলনা থেকে জামাটা নিয়ে কাঁধের ওপর রাখল। তাকের ওপর হরলিক্সের বোতলে সূঁচ, সুতো আর কিছু বোতাম, এ

বাড়ির সেলাইয়ের সরঞ্জাম। সূঁচে সুতো পরাতে পরাতে চিন্তা করল এই শীতে দিদিকে একটা সোয়েটার বুনে দিলে হয়।

দিদি ?

কিরে ?

রোয়াকে বসে চিৎকার করে নন্টু এতক্ষণ গাইছিল—আমি জলে নামব, জল ছড়াব, জল তো ছোঁব না। কচি কচি গলায় এই গান শুনে জয়ন্তীর হাসি পায়। মানে যদি বুঝতো, তাহলে কি এত সহজে নন্টু এ গান গাইতে পারতো ? কিন্তু বয়েসে কাঁচা হলে কি হবে, বাংলা দেশের সঙ্গীত জগতের অনেক খবর ও রাখে। শহরে এখন কোন্ গানটা সব থেকে পপুলার, তা নন্টুর সঙ্গীত চর্চায় কান পাতলে সহজে বোঝা যাবে।

এই দিদি ?

নন্টুর ধমকে জয়ন্তী ফিরে তাকাল। হেসে বলল, কি, বল্ না ?

খুব তো বলেছিলি, এনেছিস ?

কিছুতেই প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে জয়ন্তী আবার হেসে বলল, কি ?

হুঁ, কি ! নন্টু ঠোঁট ওল্টাল। যেন ভুলে যাওয়ার জন্য দিদির ওপর শুধু রাগই করে নি, কিছুটা তাচ্ছিল্যও জানাচ্ছে।

নন্টুর এই পাকাপাকা ভাবটা জয়ন্তীকে যেমন মাঝে মাঝে ভাবায়, মাঝে মাঝে বিরক্ত করে, তেমনি আবার ভালোও লাগে। আধময়লা ইজের পরনে। দড়িটা বাইরে ঝুলছে। মাথার চুল উসকো খুসকো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। স্নান ঘরে চিন্তা করছিল, এতটুকু ভাইটা তার বড় হলে কেমন দেখাবে। যতটুকু

ভাবছিল, এখন দেখছে তার থেকেও ছোট। আশ্চর্য স্নেহে জয়তীর সমস্ত বুকটা যেন উদ্বেল হয়ে উঠল। একেই কি বলে বাৎসল্য? স্নেহ আর বাৎসল্য তো এক নয়। আজ নমুর জন্য বাৎসল্য জাগার পরিপক্কতা জয়তীর মনে এল কি করে? শরীরের বয়েস যেমন ঋতু মেনে চলে, মনের কি তেমন কোন নিয়ম নেই? ইচ্ছে হচ্ছে সব কিছু ফেলে এখন নমুর এই পাকাপাকা কথা শুনতে। ওকে বিরক্ত করতে, কাঁদাতে, তারপর আদর করে মান ভাঙাতে। জানে বেশিক্ষণ ভালো লাগবে না। নিজের কাছেই কেমন ছেলেমানুষি মনে হবে, ছেলেমানুষি আর একঘেয়ে—তবু ইচ্ছে করছে নমুর সঙ্গে হঠাৎ শৈশবে ফিরে যেতে।

দশজনের মত ছেলেবেলার কথা ভেবে জয়তী দীর্ঘশ্বাস ফেলছে না। শৈশবের যে স্বপ্নমাখা দিনগুলোর মানসলোক ছাড়া বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেই স্বপ্নে আবার ফিরে যেতে চাইছে না। সে জানে শিশুত্বের স্মৃতি যতই চোখ ধাঁধাক, আসলে তা মেঘের রঙের মতই মিথ্যে, নাগালের বাইরে। যৌবন, জ্ঞান ও পরিণতির জন্য চিরদিন সে অপেক্ষা করেছে। এ তার গর্ব। আপন শিশুত্বের জন্য সত্যিই তার দীর্ঘনিঃশ্বাস নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পরিণত মনের পৃথিবীতে কিছু শিশুর আকস্মিক দামালপনার প্রয়োজন আছে। সে নিজের পরিপক্কতা দিয়ে এই দামলামো উপভোগ করবে আর প্রশ্রয় দেবে আর সামলাবে। সে যে বড় হয়েছে, তা উপলব্ধি করবে এই ছোট্টদের আশ্রয় করে।

ছু-হাতে জড়িয়ে ধরল। গালের ওপর নাক ঘষে বলল, কি রে নমু? একদম ভুলে গেছি।

তা তো যাবেই। বিজয়ীর ভঙ্গিতে নন্টু বলল। যেন সে জানত জয়তী ভুলে যাবে। তার আশঙ্কা প্রমাণিত হওয়ায় খুশি হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। জয়তী চমকাল। নন্টুও কি মানুষের স্বভাব বা চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে? আজকের শৈশবেও কি অভিশাপ লাগল! এতো জ্ঞান, যৌবন বা পরিণতির পথ নয়। হাটে, মাঠে, সিনেমায়, আসরে এরা জীবনের রহস্য কেমন অক্লেশে জেনে যাচ্ছে, আর কত তাড়াতাড়ি।

আমাকে না বলেছিলি······কিনে দিবি ?

চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কের মত শুনছিল, তাই পুরো বুঝতে পারে নি। শেষ আর প্রথম শুনে মধ্যের কথা কটা উচ্চারণ করতে নন্টুর যতটুকু সময় লাগল তার মাপে ফেলে কি কেনার কথা তা হঠাৎ মনে পড়ল। মনে পড়ল সেদিনও নন্টুকে বলেছে—মাইনে পেলে ওকে একটা মাউথ্ অর্গান কিনে দেবে। আজ ফেরার পথে একবারও মনে পড়েনি। পড়লেও উপায় ছিল না। কারণ, কয়েক টাকা দিয়ে একটা মাউথ্ অর্গান কিনলে তার প্রতিশ্রুতি-রক্ষা এবং নন্টুর সন্তোষবিধান হয় বটে, কিন্তু বাবা আর মাকেও বিচলিত করা হয় সেই সঙ্গে। ওঁরা ভাববেন নিজে উপার্জন শুরু করেই জয়তীর বেহিসেবী ছেলেমানুষি শুরু হয়েছে। এই ছেলে-মানুষির পরিণতি চিন্তা করতে গিয়ে ওঁরা হয়তো অনেক দূরের অনেক কিছু কল্পনায় মনে মনে অশান্তিতে ভুগবেন।

আগে, যখন জয়তীর কোন উপার্জন ছিল না, তখন টাকা দিয়ে যা খুশি কিনলে বা কেনার বায়না ধরলে তার মানে হত অন্য। এখন কিছুটা যেন অধিকারবোধের প্রশ্ন এসে যাবে। আসবে অগোচরে,

ক্রিয়া করবে। তারপর একদিন আত্মপ্রকাশ ঘটবে নগ্নতায়। বললে অশান্তি বাড়বে। জয়তী চটবে, কারণ তার এতদিনের স্বভাব তাকে চটাবে। খরচ করতে ভালো লেগেছে, নিজের রোজগার বলে নয়—এ কথা বুঝতে না পারায় মনে মনে সে বাবাকে, মাকে তাচ্ছিল্য করবে। আর না বললে, মেয়ের এই ছেলেমানুষির পরিণাম চিন্তা করে ওঁরা হয়তো অনেক দূরের অনেক কিছু ভেবে বসে মনে মনে অশান্তি ও অস্বস্তিতে ভুগবেন। হ্যাঁ, অবস্থা বদলেছে। আগে যা মানাতো, এখন তা সাজে না। কারণ আগে সে ছিল প্রার্থী, এখন তাকে দিতে হয়।

কিন্তু সেদিনও যেমন নন্নুকে মুখের ওপর না করতে পারে নি, আজও তেমন পারছে না। জোর করে হেসে বলল, দেবোখন। আগে দোকান ঘুরে জিনিষ পছন্দ করি!

যেন দ্বিধার সঙ্গে নন্নু বিশ্বাস করল। জয়তীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় তাদের আবদারে বাবাও এমনি করে সায় দিতেন। সায় দিতেন আর ভোলাতেন। বাববার ঠকে তাদের কান্না পেত। কিন্তু সেদিন কি কল্পনা করতে পেরেছিল তার জীবনেও ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তি হবে। বড় হয়েছে ভেবে একটু আগেও পুলকিত ছিল। কিন্তু বড় হওয়ার একি যন্ত্রণা।

মাকে বললে বিবক্ত হবেন। সংসারের কি খরচ, কত ধার—তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বলবেন, গরীবের ছেলের বাজে সখ থাকতে নেই। বিরক্ত হবেন তার ওপর অথচ শাসন করবেন নন্নুকে।

কিন্তু জীবনের সখ, সখ বা চাহিদা কি গরীব-বড়লোক মানে?

পরের ঘুড়ি কেটে এসে বাড়িতে পড়লে নন্নু যখন সুতো যোগাড় করে ওড়ায়, তখন মা বাধা দেন না। হয়তো নন্নুর খুশি দেখে খুশিও হন। কিন্তু ঘুড়ি বা সুতোর জন্য দুটো পয়সা খরচে তাঁর প্রবল আপত্তি। সেখানে নন্নুর কান্নার সামনে তিনি আশ্চর্য অসহায় অথচ নির্মম। ঐ দু-পয়সার সঙ্গে আর দু-আনা যোগ করে একটা ডিম কিনে নন্নুকে খাওয়াতে পারলে তিনি মনে করবেন মার কর্তব্য পালন হল।

কিন্তু নিছক দুটো খাওয়া আর পরা আর বয়েস হলে যেমন তেমন একটা স্কুলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসার মধ্যেই যে জীবনের বিকাশ লুকিয়ে নেই—এ কথা মা বুঝতে চাইবেন না। জয়ন্তী জানে, সে বোঝায় দায়িত্বও অনেক। কারণ দিদির গান গাইবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মার পক্ষে গানের স্কুলে মাইনে যোগানো সম্ভব হয় নি। বিল্কুর শরীর নাচিয়ের শরীর। জয়ন্তী হলফ করে বলতে পারে শিখলে বিল্কু ভালো নাচতে পারতো। কিন্তু সে খরচও মার পক্ষে যোগানো শক্ত। নন্নুর মধ্যে এক বিচিত্র প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্য মাথা ঠুকরে মরছে কিনা কে জানে! কিন্তু ও হতভাগার জন্য বাড়তি কোন আয়োজন মার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যতে জীবিকা খুঁজে পাওয়ার জন্য মোটামুটি যা প্রয়োজন—তার বাইরের সব কিছুকেই মা বাহুল্য মনে করেন। হয়তো বাস্তবতার চাপেই মা এত সীমাবদ্ধ। তাই কয়েকটা ছেলেমেয়ের মা হয়েই তিনি সুখী। কয়েকটা বড় মানুষের জননী হবার কথা চিন্তাই করেন না। কিংবা হয়তো ভাবেন, কোন পথ পান না। বাহুল্যের দোহাই দিয়ে নিজেদের

অক্ষমতাকে ঢাকতে চান। হয়তো মা জয়তীর মতই অসহায়। হয়তো তার থেকেও বেশী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি, জীবনের যন্ত্রণা অসীম। পৃথিবীতে কি এমন একটি মানুষ সে দেখেছে, এমন একটি মানুষ—যার কোন সমস্যা নেই, ব্যর্থতা নেই, যে সুখী, যে পূর্ণ? অনেকগুলো মুখ মনে পড়ল, অনেক কটা চোখ। স্বল্প পরিচয়, ঘনিষ্ঠ আলাপ, নিকট সম্পর্কের অনেকগুলো মুখ মনে পড়ল, অনেক কটা চোখ। তা হলে সুখ কোথায়? শান্তি কিসে? প্রতি মুহূর্তে এই অসহ্য কৃচ্ছ্রতা আর দৈন্যের সার্থকতা কি? জীবনের এই যন্ত্রণা মানুষকে কোন্ দিগন্তে পৌঁছে দেবে?

'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না'। আবার নমু গান ধরেছে। বাইরে এসে দেখল ছাদে উঠবার যে সিঁড়ি, তার ঢালু রেলিংয়ে চড়ে নমু যেন পক্ষীবাজের রাজপুত্তুর বনেছে। আশ্চর্য! তাদের ছেলেবেলায় মায়ের কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প শোনার সৌভাগ্য জয়তীর হয় নি। দিদির জন্মের পরই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়েছিল। একটা ঠাকুমা, কাকীমা বা ঐ জাতীয় কোন আত্মীয়ার অভাবে তাকে, দিদিকে একা একা বড় হতে হয়েছে। মা সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। বাবা তাঁর চাকরী আর তাসের নেশায় দিন-রাতের একটা বড় সময় বাইরে থেকেছেন। বড় হয়ে বইয়ে তারা সোনার-কাঠি রূপোর-কাঠির গল্প পড়েছে। বিল্টু আর নমুকেও শুনিয়েছে মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, এই ভাইবোন দুটোকে তো তারাই কোলে পিঠে নিয়ে বড় করল।

দেখতে দেখতে বিল্টু কত বড়টি হয়ে গেল। আজকাল শাড়ি

পরে স্কুলে যায়। খোঁপা বাঁধে। কথায়, বার্তায়, ভাবে, ভঙ্গিতে সব সময় বুঝিয়ে দেয়, সে বড় হয়েছে। বিল্টুকে ভয় করে। যদিও নিজের ভীতি প্রকাশে জয়তী রাজি নয়, তবু মনের কাছে এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। বিল্টু বদলেছে। এই পরিবর্তন এত অস্পষ্ট, ধীর ছিল যে হঠাৎ বোঝা শক্ত। হয়তো নিজের পরিবর্তন বিল্টুর চোখেও ধরা পড়ে নি। তবু জয়তী জানে, বিল্টু বদলেছে।

সে কথা ভাবতে গেলেই জয়তীর চোখের সামনে হুটো সন্ধ্যা আবছা আবছা ভেসে ওঠে। একটা ঘর। চোখের জল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস, অস্ফুট বিলাপ, ম্লান আলো। একটা স্টেশন। যাত্রীর ব্যস্ততা, কুলির হাঁক, এঞ্জিনের শব্দ এবং আলো, আলো, আলো।

দিদির প্রেমের ইতিহাস বাড়িতে জানাজানি হওয়ার পর সংসারে দীর্ঘকাল অশান্তি গেছে। মায়ে মেয়েতে ঝগড়া, বাবার সঙ্গে কথা বন্ধ, মাঝে মধ্যে অনাহার এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু যেদিন দিদি জানাল রেজেস্ট্রি মতে বিয়ে তার হয়ে গেছে, রমেনদার বুড়ি মা এসে একটা মিটমাট করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন, সে দিনের কথা জয়তী ভুলতে পারবে না।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার দৃশ্য জয়তী কিছু দেখেছে। কিন্তু দিদিকে দেখে মনেই হচ্ছিল না ও নতুন বৌ, যাচ্ছে স্বামীর ঘর করতে। পোশাকে প্রসাধনে রোজকার মতোই। শুধু সিঁথিতে সিঁদুরের সরু রেখা, হাতে একটা চামড়ার নতুন স্যুটকেস। বাবা দরজা বন্ধ করে তাঁর ঘরে বসে রইলেন। দিদি হেঁট হয়ে মাকে প্রণাম করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাও শিশুর মতো

কাঁদছেন। মাকে, দিদিকে দেখে নন্তু চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। মা দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মার থেকে দিদি বেশ খানিকটা লম্বা। দিদি একটু খাটো হয়ে মার ঘাড়ে মুখ রেখে কাঁদছে। দেখে জয়তীরও চোখে জল এল।

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল আর ভাবছিল। অনেক কিছু। দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল আর ভাবছিল। তাদের অতীত, তাদের ভবিষ্যৎ। অজস্র ছবি ও স্মৃতির ভগ্নাংশ উষ্ণ রক্তস্রোতের মত তার মাথা দিয়ে বুক দিয়ে সমস্ত শিরায় ছড়িয়ে পড়ছিল। সে কাঁদতে চাইছিল। কিন্তু কান্না সমস্ত শরীরে ধাক্কা দিলেও জল হয়ে চোখ ফেটে বেরোচ্ছিল না।

প্রথম একফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়তী মুক্তি পেল। সমস্ত কটা স্নায়ু তার কান্নায় শিথিল হয়ে গেল। মার সঙ্গে, দিদির সঙ্গে সেও কান্নায় মিশে এক হয়ে গেল। কিন্তু জানলার একটা রেলিং শক্ত করে চেপে ধরে বিল্টু আগাগোড়া দাঁড়িয়েছিল। কাঁদেনি। দিদি চলে যাবার পর দরজা খুলে বাবা বাইরে এলেন। মনে হল, তাঁরও চোখ লাল। কিন্তু বিল্টু কাঁদল না।

সেই মুহূর্ত থেকে বিল্টুকে জয়তী ভয় করতে শিখেছে। অথচ বিল্টু বলতে গেলে তার থেকে দিদির ন্যাওটাই বেশি। বিল্টুর জন্মের সময় দিদি ছিল বড়। নন্তু হলে, জয়তীই তাকে সামলেছে। কারণ তখন দিদি আরও বড় হয়ে কলেজে যাচ্ছে। তাই নন্তু যেমন জয়তীর ওপর বেশি অনুরক্ত, বিল্টু তেম্‌নি অনেক বয়েসেও দিদির পাশে না শুলে ঘুমোতে পারত না। সকলেই ভেবেছিল, দিদি চলে গেলে বিল্টুই সব থেকে বেশি ভেঙে পড়বে।

অথচ ও ভাঙল না। গম্ভীর হল। কঠিন আর অবাধ্য। মুখে মুখে তর্ক করত না। কিন্তু একবার যদি না বলত, তা হলে কিছুতেই হ্যাঁ করানো যেত না। বকলে, মারলে, চুপ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। স্থির আর অসহ্য সে দৃষ্টির সামনে সকলকে হার মানতে হত। কিন্তু নিজে কিছুতে চোখ নামাত না।

চোখ নামায় না! কালও বিল্কু মার খেয়ে এমনি ভাবে তাকিয়ে ছিল। জয়তী এক একটা চড় মেরেছে আর বলেছে, মুখ নীচু কর। কিন্তু বিল্কু মুখ নামায়নি। মার খেতে খেতে চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়েছে। মা এসে জয়তীর পক্ষ নিয়ে আবার ওকে মেরেছেন। বলেছেন, চোখ নীচু কর। কিন্তু বিল্কু চোখ নামায়নি।

চোখ নামায় না। অথচ সেদিন বিল্কু মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। আসাদ ট্রেনে করে তাকে কলকাতা থেকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। একই ট্রেনে বিল্কু আর বাবাও সোনাকাদের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। মিনিট দুয়েকের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছে। সমস্ত দমদম স্টেশনটা আলোয়, ব্যস্ততায় দিশেহারা। বাবা দেখতে পাননি, কিন্তু বিল্কু দেখেছে। আসাদ এবং জয়তীও ওদের দেখে দূরে সরে যেতে চাইছে। বিল্কু বোধহয় চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু দুজনকে এ ভাবে পালাতে দেখে কিছু বলেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। জয়তী জানে না সে কেন ভয় পেয়ে পালাল। জয়তী জানে না বিল্কু হাত তুলে ডাকতে গিয়ে আবার কেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। জয়তী জানে না কেন বিল্কু বাড়িতেও তাকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি।

কিন্তু তারপর থেকে বিল্কুকে দেখলে কি যেন হয়। একটা অপরাধবোধ, হীনমন্যতার চেতনা, একটু বা সন্দেহ। কি যেন হয় জয়তীর। বিল্কু বোধহয় সব বুঝতে পেরেছে। বোঝার মতো বয়েসও তো হয়েছে। তাই বুঝি মুখ টিপে টিপে সব সময়ই হাসছে। তার চোখ দুটো হাসছে। হাসছে আর চাবকাচ্ছে।

তাই বিল্কু একটা সমস্যা। ও কি চায়? কি ভাবে? জানার উপায় বা বোঝার পথ নেই। বয়ঃসন্ধির মেয়ে। এই বয়েসে যখন পৃথিবীটা ছোট আর নিজেকে ছাপিয়ে ওঠার মানসিকতা প্রবল হবার কথা, তখন বিল্কু নীরব, নীরব। নীরব ও গম্ভীর। সংসারের যেটুকু কাজ তার বাঁধা, করে। চুপচাপ স্কুলে যায়, ফেবে। চুপচাপ খায়-দায়, ঘুমোয়। পালার বাইরে কোন কাজেব কথা বললে ইচ্ছেমত করে, নইলে না। কিছুতে না।

কিন্তু ওভাবে বিল্কু কেন তাকিয়ে থাকে? মনে হয় চোখ দুটো ছাড়া তার অন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। মনে হয় সমস্ত শরীর আর মন যেন এই চোখ জোড়ায় গুটিয়ে এসেছে। বয়ঃসন্ধির মেয়ে—যে নতুন শাড়ি পবছে, নতুন খোঁপা বাঁধছে, যেই বয়েসে পৃথিবীটাকে ছোট মনে হয় এবং নিজেকে ছাপিয়ে যেতে সাধ যায়—সেই বয়েসের বিল্কু যেন তার চোখ দুটো দিয়ে প্রত্যেকের সব কিছু দেখে ফেলছে, বুঝে নিচ্ছে। আর চোখ দুটোও চিৎকার করে সেই কথাই ঘোষণা করছে। জানি, জানি! দিদি চলে গিয়েছে, তা জানি। তুমি চলে যাবে, তা জানি। বাবা নিজের বাৎসল্য এবং পিতৃত্বের অধিকারবোধের দ্বন্দ্বে পুড়ে মরছেন, জানি। মা নিজের উদ্বেগ ও অসহায়ত্বে কাঁদছেন, জানি। নন্তু একটা

অপদার্থ হবে, জানি। আমি বুড়ো বাবা-মাকে ত্যাগ করে সুখে ঘর বাঁধার আগে গলায় দড়ি দিতাম, জানি। আমি জানি, জানি, জানি....

'ফুলের আসরে তুমি নাই আমি জানি'। নন্টুর গানের 'জানি' শব্দটি জয়তীর চিন্তাসূত্রের শেষ কথাটির সঙ্গে যখন নাটকীয় ভাবে একতালে মিলে গেল, তখন জয়তীর চমক ভেঙেছে। কি ভয়ংকর। শিউরে উঠল। বিল্কু কি ভাবতে পারে—এই ভাবনার সিঁড়ি বেয়ে সে কোথায় গিয়ে থেমেছে? কোন্ পাতালে? এতো বিল্কুর কথা নয়, জয়তীর আপন মনের প্রতিফলন। বিল্কুর মন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ হয়েছে নিজের কথায়। যে কথা দিদিকে লক্ষ্য করে জয়তী নিজেকে শুনিয়েছে।

কপালে ঘাম জমেছে। আহ্, কেন চিন্তা করে, কেন চিন্তা করতে পারে। যদি মূর্খ হত, পাগল হত, যদি নিশ্চিন্ত সহজ জড়ভরত হতে পারত—তা হলে কি মুক্তি। কিন্তু সে আর পারে না। কিন্তু সে আর পারে না।

বিল্কু বদলেছে, এ কথা সত্যি। বিল্কু অস্বাভাবিক, এ কথা সত্যি। বিল্কু কি চায়, কি ভাবে, কি দেখে—তা কেউ জানে না, এ কথাও মিথ্যে নয়। কিন্তু নিজের অপরাধ চেতনা দিয়ে এ ভাবে বিল্কুর ভাবনাগুলোকে আবিষ্কার করার চেষ্টা কি তুচ্ছ, কি অশ্লীল।

রাগে আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল। আসাদকে ভালবাসে—বাড়ির কেউ তা কল্পনাই করতে পারে না। তবু থেকে থেকে ভয় হয়, বুঝি বিল্কু বুঝে ফেলেছে। যখন মা আফশোষ করেন সংসারের

জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে জয়তীর শরীর ভাঙছে, তখন বিল্কুর চোখের দিকে তাকিয়ে কেন ভয় হয়, মনে মনে ও হাসছে। বলছে, এ আর কতোদিন ? তুমিও তো দিদির মতোই—

আসলে কি এইভাবে জয়তী নিজের সেই বিশ্রী বাসনাটাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে ? ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কায়স্থের ছেলেকে বিয়ে কবেছে বলে বাবা-মা দিদির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে মুসলমানের ছেলেকে ভালবাসে—যেই মুসলমান জাত কিনা তার স্বপ্নের মত দাদাকে কুপিয়ে মেরেছে—এ কথা শুনলে মা হার্টফেল করবেন, বাবা বিষ খাবেন। জয়তী তা জানে। তবু কি সে নিজের মনের এতবড় আনন্দ আর বেদনা, জীবনের এতবড় আনন্দ আর বেদনা—চেপে রাখতে পারছে না ? সে কি চাইছে দিদির মতো তার সঙ্গেও মা ঝগড়া করুন, বাবা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলুন। তা হলে বিবেকের কাছে মুক্ত থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। না কি সে চাইছে বাড়ির সকলে জানুক বাবা-মার তুচ্ছ কয়েকটা সংস্কারের জন্য জয়তী কি রকম নীরবে নিজের ভালো-লাগা, ভালবাসাকে গলা টিপে মেরে এই সংসারেরই ভার বহন করছে। মা তার পছন্দকে ঘৃণা করবেন, বাবা তার রুচিকে ধিক্কার দেবেন—অথচ মেয়ের ত্যাগ, কর্তব্যবোধেব মহিমায় অভিভূত হয়ে গৌরবে বেদনায় চোখের জলও ফেলবেন। জয়তী কি এত তাড়াতাড়ি, এত তাড়াতাড়ি এই কৃতজ্ঞতাবোধের কাঙাল হয়ে উঠল ?

না, না। আমি তা নই। আমি তা চাইনে। নিজের মনে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু সে কি চায়, চাইতে পারে? কতটুকু চাওয়ার স্পর্ধা রাখে জয়তী? তার কতটুকু চাওয়া উচিত?

জানি না। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে জয়তী আপন মনে বলল, আমি জানি না।

মা এসে দাঁড়ালেন, কিরে, সেই থেকে ভাত বেড়ে ডাকছি। মাছি বসবে না?

ব্লাউজের হাতায় সূঁচের শেষ ফোঁড়টা দিয়ে দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে জয়তী হাসার চেষ্টা করে বলল, হয়ে গেছে। যাচ্ছি।

॥ সাত ॥

ভাত তোল।

মা শাসন করে বললেন, এই কটা ভাত আবার তুলব কি?

বিরক্ত হল। রোজ খেতে বসে ভাতের পরিমাণ নিয়ে মার সঙ্গে কিছু বাক্য বিনিময় হবেই। প্রতিদিন মা এক আশঙ্কা প্রকাশ করবেন, জয়তী শুকিয়ে যাচ্ছে। এই বয়েসে কম খেয়ে এত পরিশ্রম করলে মানুষ কদিন বাঁচবে?

মার উদ্বেগ জয়তীকে বিব্রত করে। বিব্রতবোধটাই পরে বিরক্তির রূপ নেয়। খানা যে নিতান্তই আপরুচি, একথা মাকে সে বোঝাবে কি করে?

কিন্তু জয়তী জানে এ ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ নির্মমতা। তাই তাকে হাসতে হল। আর হেসেই আবার বলল, দুটিখানি তোল। সত্যি খেতে পারব না।

মুঠিটা মস্ত বড় করে পেতে কি আশ্চর্য কৌশলে মা সামান্য কটা ভাত আলতো ভাবে তুলে নেন, জয়তী তা প্রতিদিন লক্ষ্য করেছে। হাসি পায়, ভালও লাগে।

ভাত তুলতে তুলতে আজও মা বললেন, তোদের বয়েসে আমরা এর চারগুণ খেতাম। তাই না এখনও শরীরের রথটা টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছি?

এর জবাবেও আস্তে করে হাসতে হল। কারণ এ অবস্থায় হাসাটাই রীতি। কিন্তু মাকে সে কেমন করে বোঝাবে এই বয়েসের সেদিনের মা আর সেই বয়েসের আজকের জয়তী এক

নয়। কারণ আজ খেতে না পাওয়ার মত খেতে না পারার সমস্যাও কম না। নিজের বাড়ির অভিজ্ঞতায়ই সে দেখেছে ঋতু মেনে পালা পার্বণ উদ্‌যাপনের রীতি দিনে দিনে কমে আসার সঙ্গে কি ভাবে ভোজনের আর্টও তারা ভুলে যাচ্ছে। প্রতিদিনের খাওয়া নিছক অভ্যাসবোধের পুনরাবৃত্তিতে কত একঘেয়ে অথচ সহজ হয়ে আসছে।

একটা সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন যে এতে স্পষ্ট উঁকি দিচ্ছে, জয়তী তা জানে।

সমবয়েসী ছেলেরা এক হাঁড়ি রসগোল্লার থেকে একটিন সিগারেট পেলে বেশি খুশি হয়। মেয়েরা বাড়ির রান্না থেকে দোকানের ভাজা খাবার বেশি পছন্দ করে। এর কার্যকারণ সম্পর্ক সে মাকে বোঝাবে কেমন করে? বললে বক্তৃতার মত শোনাবে। বিরাট একটা ট্র্যাজেডি ধরতে না পেরে মা ভাববেন, জয়তী ঠাট্টা করছে।

কিন্তু মা-ই আবার অভিযোগ করবেন, জয়তী কম খায়। এখনকার ছেলেমেয়েদের এই এক দোষ। সমাজের যে বর্ধমান বাস্তবতা, মা তাকে প্রত্যক্ষ করছেন। হৃদয় দিয়ে বুঝছেন। কিন্তু বিচার করে, বিশ্লেষণ মারফৎ কোন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারছেন না। মা পারেন না।

এই বাঁদর, পাখাটা এনে দিদির ভাতে বাতাস দিতে পারছিস না? ঝাঁঝিয়ে উঠে নন্তুকে ডাকলেন। তারপর আক্ষেপ করে বললেন, ছেলে তো নয়, শত্তুর। কারো জন্য একটু যদি মায়াদয়া থাকতো।

ভাত গরম, জয়তী মাখতে পারছে না। মাঝে মাঝে

আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ওপর ওপর ভাতগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিঃশ্বাসের মত ধোঁয়া উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সাদা, ভারী ধোঁয়া।

বাতাস করা নমুর আসে না। তারওপর মার গলার সুর ওকে চটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সেও ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল, বয়ে গেছে।

শুনলি? কথাটা শুনলি? মা আরম্ভ করেই হঠাৎ থেমে গেলেন। এ রকম অবস্থায় মার আকস্মিক নীরবতা নতুন। নতুন ও অস্বাভাবিক। জয়তী কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল, এইবার সচকিত হল।

মার রেখায় ভরা রুগ্ন মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। নমুর কথায় কি আঘাত পেয়েছেন? আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় রাগ না দুঃখ—মার মুখে কিসের ছায়া? ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি কি বিচলিত? প্রতিক্রিয়ায় চিন্তা না আফশোষ—মার মুখে কিসের ছায়া?

এক ঝলক মার দিকে তাকাল। মার মুখে যেন লজ্জার অস্পষ্ট ছাপ। কি আশ্চর্য! রাগ নয়, দুঃখ নয়, চিন্তা নয়, আফশোষ না, লজ্জা। নমুর কথা শুনে মা লজ্জা পেয়েছেন। কিন্তু কেন? তাঁর ছেলে একটা অশোভন কথা বলেছে, তাই? নমু দুদিন আগেও ঝগড়া করে যখন দিদির চুলের মুঠি ধরে টান মেরেছে, তখন তো মার চোখে লজ্জা ছিল না? উল্টে রেগে তিনি নমুকেই পিটিয়েছেন। বাইরের কোন অতিথির সামনে পরিবারের বাচ্চা ছেলে যদি হঠাৎ অশোভন গাল দিয়ে বসে, তাহলে বাড়ির বয়স্করা যেমন লজ্জায় সঙ্কোচে কুঁকড়ে যান—আজ

মার মনেও কি তেমনই লজ্জা এবং সঙ্কোচের আবির্ভাব ঘটল। তাহলে কি মার সঙ্গে জয়তীর এবং জয়তীর সঙ্গে নন্তুর সম্পর্কের চেহারা এই? কিন্তু নন্তু তো শুধু মারই ছেলে নয়, তারও ভাই। আজ হঠাৎ সে কথা ভোলার মত কি কারণ ঘটল? মার রেখায় ভরা রুগ্ন মুখটায় রাগ না, দুঃখ না, চিন্তা নয়, আফশোষও নয়, লজ্জা। মা লজ্জা পেয়েছেন।

শুনলি? একবার শুনলি কথাটা? মা যথারীতি দুর্বল গলায় দুর্বল বিরক্তি ছিটিয়ে বললেন, আদরে আদরে হতচ্ছাড়া কি ভাবে বয়ে যাচ্ছে একবার দেখ্।

হাত ধুয়ে কাঠের ছোট্ট পিঁড়িটা এগিয়ে নিয়ে মা পাখা হাতে বসলেন। বাতাস করতে করতে তিক্ত গলায় নন্তুকে শুনিয়ে বললেন, বয়ে তো যাবেই। দিদি রক্ত জল করে টাকা আনবে। সেই টাকায় খাবে, দাবে, ধাস্টামো করে টকির গান গেয়ে বেড়াবে। দিনকালই এমন, কৃতজ্ঞতার বালাই বলে কিছু নেই।

কৃতজ্ঞতা শব্দটা হঠাৎ কানে বাজল। যেন মার মুখে এই সময়ে, এই প্রসঙ্গে এমন একটি কথা শোনার জন্য জয়তী প্রস্তুত ছিল না। অবাক হয়ে উপলব্ধি করল দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে একটা শব্দ প্রয়োগ হঠাৎ সমস্ত পরিবেশটাকে পাল্টে দিতে পারে। নন্তুর অবাধ্যতা স্বাভাবিক। মার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবাধ্যতা আর বিরক্তির মধ্যে কৃতজ্ঞতা শব্দটি যেন মানায় না। সমস্ত পরিবেশ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। গম্ভীর আর ভারী! মার চোখে লজ্জা দেখে জয়তীর মনে যন্ত্রণা ছিল। কিন্তু সেই যন্ত্রণা গোটা ঘরটার বাতাস এমন ভারি করতে পারে নি।

আর আশ্চর্য। মা নন্নুর কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করছেন? কৃতজ্ঞতার কি বোঝে ও? তাছাড়া জয়তীর সঙ্গে নন্নুর সম্পর্ক কি কৃতজ্ঞতার? এবং কৃতজ্ঞতাই বা কিসের, কেন? জয়তী মাইনে পেয়েছে, সেই টাকায় সংসারের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হবে, নন্নুর জন্যও কিছু খরচ হবে—তাই? বাবাও তো কতকাল ধরে সংসার চালাচ্ছেন। জয়তীর জন্যও তাঁর খরচ কম হয় নি। তাহলে কি বাবার কাছেও তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত?

বাবা সম্পর্কে নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখল—ভয় আছে, ভক্তি আছে, কি রকম একটা ভালোবাসাও যেন। কিন্তু নিছক কোন কৃতজ্ঞতা নেই। থাকার কথা মনেই হয় নি। যে ব্যক্তিটি তাকে গড়েছেন, বড় করেছেন—তাঁর ওপর একটা অন্ধ নির্ভরতাবোধ স্বাভাবিক। কিন্তু পিতা পুত্রীর সম্পর্কের ভেতর কৃতজ্ঞতা শব্দটা আমদানি করা যেন অশ্লীল।

নন্নুও তো তার ভাই। যদি ছেলেমানুষ না হয়ে বড়টি হত, তাহলেও কি জয়তী ওর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করত? পেলে খুশি হত? বাবাও কি জয়তীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন? তাঁর প্রতি এতদিনের সহজ ভীতি, স্বাভাবিক পরিচর্যাকে সেই কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ মনে করেন? বছর কয়েক পবে চাকরি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারও কি তাঁর চলে যাবে? কোনদিন অর্থ উপার্জন করেন নি বলে কি মা তাব কাছ থেকে ও জাতীয় কোন কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন না? বরং মা-ই কি নিজের মেয়ের কাছে কৃতজ্ঞ?

যেন চাবুক খেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কি?

আত্মীয়তা, স্নেহ, প্রেম আর বন্ধন জাতীয় মধুর কতগুলি শব্দ দিয়ে জীবনের যে বাস্তবতাকে মানুষ সর্বদা ঢেকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনেও বুঝি অর্থনীতির সেই আশ্চর্য অনুশাসন।

বাবা রাগি, খিটখিটে। ঠিক তা নয়, একটু যেন গম্ভীর। ঠিক তাও নয়। কখনো হাসিখুশি, কখনো ছেলেমানুষ, কখনো গম্ভীর আর রাগি আর খিটখিটে। বাবা বাড়ির কর্তা।

কিন্তু সংসার পরিচালনায় বাবার থেকে মার ভূমিকাই তাদের কাছে বেশি প্রত্যক্ষ। বাবা নিজের সামর্থমত টাকা এনে দিয়ে খালাস আর মাঝে মধ্যে সোহাগ, শাসন এবং খবরদারি করে খুশি। কাছে থেকে মাকেই তারা দেখেছে সংসারের দশ দিক সামলাতে। অথচ সকলে বাবাকে বলেছে বাড়ির কর্তা। তারাও মনে মনে তাই জেনেছে। কিন্তু এই বোধের পেছনে কি সেই মনোভাব কাজ করে নি?

তাছাড়া যে রাগ, যে বদমেজাজকে ভাবতো বাবার স্বভাব—সেই মেজাজটি গড়ে ওঠার পেছনেও বোধহয় এমন এক মানসিকতা দায়ী। উপার্জনকারীর কাছে উপার্জনভোগীর কৃতজ্ঞতা আস্তে আর গোপনে, পরস্পরের মধ্যে এক ব্যবধান এবং হীনমন্যতা-বোধের সৃষ্টি করে। তারপর কৃতজ্ঞতা পেতে অভ্যস্ত উপার্জন-কারীর স্বভাব পাল্টায়, দাবী বাড়ে। ক্রমে তা অধিকারের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সকলের কাছেই সেই অধিকারবোধ কেমন স্বাভাবিক। তার জন্য দুঃখ করা চলে কিন্তু নালিশ জানাবার উপায় থাকে না। এমন কি নিজের কাছেও না।

দিদি চাকরি করতো, বিয়ে করে স্বামীর ঘরে গেছে। সংসারের

৮

অভাব, তাই নিছক সেই ফাঁকটুকু ভরাবার জন্যই জয়তী মাস্টারি নিয়েছিল। একটা কীর্তি বা কর্তব্য করছি গোছের মনোভাব কখনোই তার মনে প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু মা এই যে নন্টুকে শেখালেন উপার্জনকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে, জয়তীকে বোঝালেন এ তার প্রাপ্য—এই সুরুর শেষ কোথায়? কৃতজ্ঞতা পেতে হয় বা পাওয়া যায় যখন জানল, তখন আজ ভাবতে যতোই খারাপ লাগুক, নানাভাবে ও বস্তুটি পেতে অভ্যস্ত হলে একদিন কি তার অভাব জয়তীর স্বভাবকে আহত করবে না? বাবার মত রাগ করে, শাসন করে সেও কি চাইবে না নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে?

ভাবতে বুক হিম হয়ে এল। ত্যাগ করছি, কর্তব্য কর'ছি—এই বোধগুলি মনে দানা বাঁধলে তার পরিণতি শুভ নয়। তখন নিজের সম্ভাবনা শেষ হলেও আত্ম-অভিমানটা প্রবল হয়ে ওঠে। নিজের জন্য রাগ, নিজের জন্য বেদনা, নিজের জন্য বিরক্তি, নিজের জন্য মহিমা। আস্তে আস্তে সব মিলিয়ে কেমন যেন সিনিক হয়ে উঠতে হয়। বিষাদ, বিরক্তি আর ঔদাসীন্যের ধূসরতায় ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবী আবছা হয়ে ওঠে।

নিজের কাছেও জয়তী অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অন্যমনস্কের মত ভাতের দলা চিবোচ্ছিল। চোখ থালায় কিন্তু মন অজস্র চিন্তার সূত্র ধরে পাক খাচ্ছে। চোখ যার দিকে তাকিয়ে, সেদিকে কিছু নেই। মন যা ভাবছে, তা দেখছে। চোখ দেখছে না, মন দেখছে। ভাবনা, দেখা আর খাওয়া—তিনটে প্রক্রিয়াই এক সঙ্গে চলছে।

হঠাৎ একটা বড় গোছের কাঁকড় চিবিয়ে ফেলেই জয়তী অস্ফুট শব্দ করে উঠল। মা আক্ষেপের সুরে বললেন, ইস্। আর কাঁকড় ভাঙ্গার শব্দ, জয়তীর অস্ফুট আর্তনাদ এবং মার সরব অভিব্যক্তি পরপর, ঠিক পরপর অথচ সময়ের একই মাত্রা আর ছন্দে বেজে উঠল। বাইরে নন্নু তখন কি একটা গান গাইছে।

হারামজাদী মেয়েটাকে এত করে সকালে বললাম—ওরে, চালগুলো একটু বেছে দে। তা মহারানির কানেই উঠল না। বসে বসে ইস্কুলের পড়া করলেন। কি কপাল করেই যে এসেছি।

মার আক্ষেপ শুনে জয়তী বুঝল বিল্কু সকালে চাল বাছে নি। কিন্তু ভদ্রমহিলা কেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন? ভাতে কাঁকড় থাকায় তাঁর এত লজ্জা বা কুণ্ঠা কিসের? আজকের দিনে চালে পাথর কিছু একটা ঘটনা নয়। আর তার জন্য মামুলি গোছের আফশোষ করলেই চলতো। কিন্তু বিল্কু কথা শোনে নি, কথা শোনে না—জয়তীর কাছে এমন অভিযোগ কেন? ওর শাসনই যদি অভিপ্রায়, তাহলে মা নিজেই তো মারতে, বকতে পারতেন। চিরকাল কেন তিনি কাউকে আশ্রয় করে আপন অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে চান? আগে বাবাকে আশ্রয় করতেন, পরে দিদিকে। এখন জয়তীকে চাইছেন আঁকড়ে ধরতে। অথচ এ বোধ তাঁর নেই যে তিনি এ বাড়ির কর্ত্রী। তাদের মা। মায়ের অধিকার নিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে যদি দাঁড়ান, যদি আদেশ করেন—তাহলে অমান্য করার সাধ্যি কারোর থাকবে না। বিল্কুকে যদি বলেন তোমায় কাঁকড় বাছতে হবে, নন্নুকে যদি বলেন এসে বাতাস কর, জয়তীকে যদি বলেন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

তাহলে সে জানে সংসারটা দিনদিন এমন আলগা বা খেয়ালী হতে পারত না। তা হলেই সংসারে মায়ের আসনটি ঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হত।

কিন্তু তা হবার নয়। কারণ এ ব্যাপারে মা আশ্চর্যরকম অচেতন। কি ভাবে হবে, তা জানা দূরে থাক—এ যে হয়, তাই বোধহয় মা কল্পনা করেন না। আমি মা, আমার কিছু পেতে নেই, চাইতে নেই—এই বোধ বা সংস্কারই মাকে আস্তে আস্তে সংসারে সকলের কাছে খেলো করে দিয়েছে। ঠিক খেলো নয়, তবে মাব কথা যে অনায়াসে না শুনলেও চলে—এমনকি নন্তুও তা বুঝে ফেলেছে। এর শুরু হয়েছিল সম্পর্কের গভীরতাজনিত ছেলেমানুষী থেকে। কিন্তু শেষ হচ্ছে নিছক অশ্রদ্ধা আর মাকে গুরুত্ব দিতে না শেখার মনোভাবে।

একদিকে সংসার সম্পর্কে বাবার ঔদাসীন্য। অন্যদিকে মার একজাতীয় হীনমন্যতাবোধ। ঠিক কি তাই? হয়তো নির্ভর চেতনা। হয়তো তাও নয়। ব্যক্তিত্বের অভাব।

দিদি রমেনদার প্রেমে পড়েছে একথা মা-ই সব থেকে আগে বুঝেছিলেন। কিন্তু কখনো দিদিকে সাবধান করেন নি। পরে যখন বিয়ের প্রশ্ন এল, তখন জাত-কুলের প্রশ্ন তুলে মা-ই লুকিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। এবং তখনও তাঁর ইচ্ছে, কথাটা যেন বাবার কানে না যায়। বাবা জানতে পারলেন। দিদিকে ডেকে যথারীতি বুঝিয়ে দিলেন, তা সম্ভব নয়।

তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, স্বাধীনতা দিয়েছি। তার অপব্যবহার করে আমার মাথা নীচু করো না।

দিদি তর্ক করছিল। ছু কথা শোনার পরই দিদির গালে একটা চড় মেরে বাবা বেরিয়ে গেলেন। স্তম্ভিত সেই ঘরে জয়তী পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর আশ্চর্য, সমস্ত আপত্তি ভুলে দিদিকে বুকে টেনে কাঁদতে কাঁদতে বাবার বিরুদ্ধেই মা অজস্র নালিশ শুরু করলেন। দিদির পক্ষে যুক্তি তৈরী করলেন।

কিন্তু পরদিন দিদি যখন বাড়ি ছিল না, তখন মা আর বাবার দীর্ঘ তর্কাতর্কির মধ্যে হঠাৎ জয়তী শুনতে পেল কখন মা বাবার পক্ষ নিয়ে দিদির জেদ, দিদির রুচির নিন্দে শুরু করেছেন।

এই হলেন মা। দুর্বল। কোন ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত নেই। সকলের মতে সায় দিয়ে, পক্ষ নিয়ে, সব কিছু সহ্য করে তিনি সংসারে শান্তি চান। নীতির প্রশ্ন নেই, ভালোলাগার প্রশ্নও না।

একটা চিরকেলে প্রক্রিয়ায়, সরল কাঠামোয় সকলে থাকুক, বড় হোক। সকলে বেঁচে থাকুক, এর থেকে বড় কামনা মার আর নেই। কিন্তু মানুষের মত বাঁচুক, এ কল্পনা কি মার মনে কোনদিন জাগে নি? মোটামুটি সৎ, মোটামুটি ভদ্র—এ তিনি নিশ্চয়ই চান। কিন্তু মানুষের মত বাঁচা কি, মা কেমন করে তা বুঝবেন?

বছর বারো বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। বছর চোদ্দ পনেরোয় স্বামীর ঘর করতে এসেছেন। তারপর ছু যুগ কেটেছে শহরতলির এই বাড়িতে। মা আজ পর্যন্ত থিয়েটার দেখেননি। যাছুঘর দেখেন নি। ছেলেমেয়েরা বড় হলে একবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছেন আর বার তিনেক সিনেমায়। ছু ছুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে, বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদের দেশে পৃথিবীর উপনিবেশ গড়ার পরিকল্পনায় মশগুল। মা

জানেন না পৃথিবী কোথায় এগিয়েছে, কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মা রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি, যামিনী রায়েব ছবি দেখেন নি, কর্ণার্জুন ও পথের পাঁচালিব তফাৎ খেয়াল করেন নি—অথচ তিনি এই উনিশশো সাতান্ন সালে বেঁচে আছেন। দু দুবার সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। ছেলে শান্তির মিছিলে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বড় মেয়ে কায়স্থের ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। ছোট মেয়ে তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে, যেদিন ভারতবর্ষ একটি মহাসঙ্গীতের সুরে সুব মেলাবে।

কি আশ্চর্য বিবোধ, কি আশ্চর্য দ্বন্দ্ব। অথচ এ-ই তাদের সমাজের চেহারা। এমনি অসমান বিকাশের মধ্য দিয়েই তাদেব জাতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

সমাজ বিকাশের এই ধাবা সম্পর্কে প্রকাশদা একটা কূট বক্তৃতা দিয়ে ফেলতেন। নানা ঘটনা, চবিত্র তুলে তিনি বুঝিয়ে দিতেন দেশ এগোচ্ছে, পৃথিবী বিবশিত হচ্ছে।

কিন্তু দেশ মানে তো মানুষ। মানুষের গোষ্ঠী। মা কেন এগোতে পারলেন না। তাহলে জয়ন্তীর জীবন কত সহজ হত। সহজ আব নিশ্চিন্ত আব সুন্দর।

নে, খা।

ভালো বরে বুঝবার আগেই মা হাতায় তুলে মৃগেল মাছের মুড়োটা পাতে ঢেলে দিলেন।

কি করলে বলতো? ক্ষোভে, বিরক্তিতে যেন ধমকে উঠল।

মা হাসলেন। বললেন, খা না তুই। কলেজের দেরি আছে।

এই বয়েসে মুড়ো খেতে কার না রাগ হয়? কাঁটা বাছতে

প্রচুর সময় লাগবে অথচ এমনিতেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে সত্যিই চটে উঠল। কোন মানে হয়? তার সামান্য সুবিধে অসুবিধেও কি মা বুঝবেন না, শুধু নিজের ভালো আর মন্দের বোধকে আশ্রয় করে থাকবেন?

জয়তীর গলা শুনে নন্নু উঁকি মারলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, একি? মুড়ো দিদিকে দিলে কেন? কথাটা শেষ করার আগেই রাগে কেঁদে ফেলল। কান্না আর কথা এক হয়ে মিশে গেল।

নন্নুর কান্না দেখে জয়তীর হাসি পেয়েছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। মাছের মুড়ো নিয়ে দাদা, দিদির সঙ্গে প্রায়ই তার ঝগড়া হত। কারণ বাড়িতে রোজ আস্ত মাছ আসে না। তাই মুড়োও নিয়মিত জোটে না। মা এক এক দিন এক এক জনকে দিতেন। দাদাকেই দিতেন বেশি। দিদি বা জয়তী রাগ করলে বলতেন, ও কলেজে যায়, পরিশ্রম করে। তোরা তো শুধু গিলে বেড়াস। জয়তী মনে মনে ভাবতো মা দাদার ওপর পক্ষপাত করছেন। আর তাতো করবেনই। মা'রা চিরকালই ছেলেদের ভালোবাসেন, মেয়েদের দু চোখ পেড়ে দেখতে পারেন না।

জয়তীকে মুড়ো দেওয়ার পেছনেও আজ নিশ্চয়ই মার সেই একই যুক্তি। পরিশ্রম করে বেশি, ওর একটু ভালমন্দ খাওয়া দরকার। জানে হাজার বলেও মাকে পাল্টানো যাবে না। কিছুতেই তিনি বুঝবেন না ছোট ছেলের সখ, আহ্লাদ বা বাসনার প্রশ্রয় কোথায়, কি ভাবে দেওয়া দরকার। বুঝবেন না, এতে শিশুমনের প্রতিক্রিয়া কি হয়। নিজের হিসেবে চলবেন।

কার দরকার, কার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে বা হতে পারে—সেই হিসেব।

আজ নন্টুও নিশ্চয়ই মনে মনে সিদ্ধান্ত করছে, মা পক্ষপাতী। কিন্তু পক্ষপাতের কারণ হিসেবে ও কি ভাবছে মায়েরা ছেলেদের থেকে মেয়েদেরই বেশি ভালবাসে?

জয়তীর হাসি পেল।

কিন্তু হাসিটা ঠোঁটের কোণ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ার আগেই যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া খেয়েছে। শুনল নন্টু বলছে, নিজে যে মিথ্যে কথা বলো—তখন? সকালে আমাকে দেবে বলেছিলে কেন?

মা সকালে বলেছিলেন নন্টুকেই মুড়োটা দেবেন। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে দুজনের মধ্যে আগেই আলোচনা হয়েছে। নন্টু আশা করেছিল অথচ মা কথা ভাঙ্গলেন। কিন্তু কেন? কেনইবা নন্টুকে বলেছিলেন, দেব। কেন তখন ওকে বোঝান নি, এ ভাবে চাইতে নেই, যাকে যা দেবার আমিই দেব। যখন বলেন নি, তখন জয়তীকেই বা মুড়োটা দেওয়া কেন? একদিন একটা ছোট মৃগেলের মুণ্ডু চিবোলে কি জয়তীর স্বাস্থ্যবিষয়ক যাবতীয় অভাব দূর হবে? নন্টুর কাছে নিজেকে, সেই সঙ্গে জয়তীকে এভাবে খেলো করার কি প্রয়োজন ছিল?

এক মুহূর্ত আগে চিন্তা করেছিল সে মুড়ো খাচ্ছে আর নন্টু খাবে ল্যাজা, এই নিয়ে ভাইকে কিছু ক্ষ্যাপাবে। কিন্তু এখন আর রুচি নেই। লজ্জা করছে। লজ্জা এবং ভয়। আশ্চর্য! ভয় কি নন্টুকে? আশ্চর্য। নন্টুকেও ভয়?

মা কিন্তু হাসছেন। আসলে ঘটনাটা তাঁর কাছে কোন

সমস্তাই নয়। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় অনেক কিছু চায়। কিন্তু কাকে কি দিতে হবে না হবে, তা তিনি বোঝেন। আর এ নিয়ে সংসারে একটু আধটু অশান্তি তো হবেই।

বুড়ো ধাড়ি ছেলে, আর সঙের মত কাঁদতে হবে না। মা হাসতে হাসতেই বললেন, যাও। স্নান করে খেয়ে আমার গুষ্টিকে উদ্ধার কর।

মা সোজা করে বলবেন না, যাও। স্নান করে খেতে এস। এমন করে বলবেন না, নন্তু যা না শুনে পারবে না। এক ফোঁটা ছেলে নন্তুর সঙ্গে মা যে ভাষায় কথা বলবেন, জয়তীর সঙ্গেও সেই ভাষায়ই তাঁর আলাপ, বাবার সঙ্গেও তাই।

খাবো নাতো। নন্তু মুখ ভেংচে বলল, তোমার ওই গুয়ো রান্না আমি খাবো না।

বাবারে বাবা। পরের দিন তোকে দেবো 'খন। বিল্কুকে না দিয়ে তোকে দেবো, তাহলে হলতো? যা, আর জ্বালাস নি। এর থেকেও বড় মুড়ো—

জয়তী লক্ষ্য করল প্রতিশ্রুতি কবে রক্ষা করবেন সে সম্পর্কে কোন চিন্তা না করেই মা আবার নন্তুকে কথা দিচ্ছেন। এমনকি বিল্কুর সঙ্গে একটা রেষারেষির স্পষ্ট সুযোগও সৃষ্টি করছেন। নন্তুর ওপর রাগ হচ্ছে। একেবারে ছেলেমানুষ তো নয়। ইচ্ছে হল ধমক দেয়। কিন্তু পাতের মুড়োটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ল। চুপ করে রইল।

পিঠটা একটু চুলকে দিবি? মার দুটো হাতই এঁটো। আদর করে ডাকলেন, এই ভোঁদর?

দূর্। নন্টু প্রচণ্ড অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল। মা উঠে দেয়ালের গায়ে পিঠটা বার কয়েক ঘসলেন। দেয়ালের এখানে ওখানে হলুদমাখা হাত পোঁছার ছাপ। কিছু ঝুল জমেছে। ঝুরঝুর করে একটুখানি বালি পড়ল। মা অস্ফুটে স্বগতোক্তি করলেন, কবে যে এ বাড়ি ছাড়বো।

জয়তীর মনে পড়ল এই ভদ্রমহিলারও কিছু আশা আছে। এর থেকে একটা ভাল বাড়ি, নিজের হলে—আহা, নিজের হলে! আর কিছু বাসন-পত্র, তৈজশ। কয়েকটা মানসিকের পুজো। বড় জোর দু একটা তীর্থে যাওয়া। একটি জীবনের এই হল মোট চাওয়া। ছোটয় বড়য় মিলিয়ে জয়তীর অনেক বাসনা আছে, জানে তাব অধিকাংশই মিটবার নয়। কিন্তু মা চাইতেই জানেন না।

কিরে, তাড়াতাড়ি খা?

হুঁ, এই যে। জয়তী ভাতের থালায় মন দিল। সত্যিই দেবি হয়ে যাচ্ছে। এস-এন-বির ক্লাসটা হল না। মায়ের যা কাণ্ড। আর নন্টুটা কি ছেলেমানুষ।

কি ছেলেমানুষ। ভাবতে বেশ লাগল। দেরি আছে। কৃতজ্ঞতার কথা বুঝতে অনেক দেরি নন্টুর। ও এখনও মাছের মুড়ো নিয়ে রাগারাগি করে। রোজগেরে দিদিকে গাল দিতে ছাড়ে না।

হ্যাঁ, এই সংসারে এখনও একটি নিষ্পাপ প্রাণ আছে। একটি নিষ্পাপ প্রাণ। যে বয়েসের ধর্ম মেনেছে, দড়কচা মেরে যায় নি বিল্টুর মত।

বিল্টুকে মাছের মুড়ো দিলে টান মেরে ফেলে দিতে চাইত, না

দিলে জয়ন্তীর পাতের দিকে তাকিয়ে হয়তো মুখ টিপে হাসত। কিন্তু বিল্টু হাসতো কেন? ওকি বুঝতে পারত তাদের বঞ্চিত করে মা নিজের রোজগেরে মেয়েকে মাছের মুড়ো খাওয়াচ্ছেন।

না না, ছি। বিল্টু কি একথা ভাবতে পারে? না, না, ছি। বিল্টু কি একথা ভাবতে পারে? কিন্তু বিল্টু আর ভাবনা, বিল্টুর ভাবনা জুড়ে তার মনটা বারবারই কতগুলো বিশ্রী চিন্তার পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে কেন? অবচেতন মনে কি এখন এই চিন্তাই কাজ করেছে যে নমুকে কথা দিয়েও জয়ন্তীকে মুড়োটা দেওয়ার পেছনে মার মনে সেই কৃতজ্ঞতাবোধ, স্পষ্ট করে বললে রোজগেরে মেয়েকে খুশি করার মনোভাব কাজ করেছে? জয়ন্তী মাইনে পেয়েছে বলেই কি আজ হঠাৎ আস্ত মাছ এল?

কি ভয়ঙ্কর। লজ্জায়, ঘৃণায় শিউরে উঠল। কোথায় নেমেছে সে, কোন্ পাতালে? মায়ের স্নেহ ও উদ্বেগকে এমন কদর্য মুখোশ পরাবার স্পর্দ্ধা বা রুচি কোথা থেকে এল? আহ্, কোথা থেকে? কোথায় নেমেছে জয়ন্তী, কোন্ পাতালে?

সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে যেন বমি এল। অভিমানে, কান্নায় গলাটা ভার। ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলে তার কোন দোষ নেই। সবই মার কুশিক্ষা। এই কৃতজ্ঞতা ও অধিকারবোধের যে চেতনা, তার জন্ম দিয়েছেন ঐ মহিলা। জয়ন্তী কোনদিন একথা ভাবে নি আর ভাবতে শেখেনি এবং ভাবতে চায় না। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন-বাসনার দরজায় খিল তুলে দিয়ে এই একটা তুচ্ছ, মামুলি, ভীরু আর স্বার্থপর সংসারের জন্য নিজেকে এভাবে টিঁকিয়ে রাখার প্রহসন চালাতে সে চায় না।

মার সামনে বসে থাকতে সাহস হচ্ছে না। একবার ভাবল ছুটে পালায়। কিন্তু মা বুঝবেন না। মনে করবেন মাছের মুড়ো দেওয়ার জন্য রাগ করে উঠে গেছে। দুঃখ পাবেন অথচ কাউকে জানাবেন না। এ বড় নাটকীয়, বিশ্রী।

রাগ হলে মাঝে মাঝে বাবা ভাত ফেলে যান। মা জয়তীর কাছেই তা নিয়ে নালিশ করেন, কাঁদেন। আজ মা কাকে সামনে রেখে হাল্কা হবেন? নন্নুকে? এ বড় নাটকীয়, বিশ্রী। আর মা কি অসহায়। হয়তো ভাববেন, আজকাল জয়তীও ভাত ফেলে যেতে শিখেছে। হয়তো ভাববেন, তা-ই স্বাভাবিক। দুঃখ পাবেন কিন্তু কাউকে জানাতে পারবেন না।

মাথা নীচু করে বড় বড় গ্রাসে ভাত খেতে লাগল। এই তার শাস্তি। ইচ্ছে না থাকলেও সব গিলতে হবে।

মা নীরবে একটা ভাঙ্গা কাপে তেঁতুলের টক পাতের পাশে রাখলেন। কথা বলছেন না কেন? চমকে মুখ তুলে তাকাল। মার চোখে যেন লজ্জা আর ব্যথার কুয়াশা। মা কি বুঝতে পেরেছেন? শিউরে উঠল। মা একটু হাসলেন। হাসলেন কেন? বললেন, নন্নুটা আর মানুষ হল না।

হায় ভগবান। জয়তীর ইচ্ছে হল চীৎকার করে হাসতে, চীৎকার করে কাঁদতে। এই এতোটা সময় জুড়ে নন্নুর সেই কথা নিয়ে মা ভেবেছেন, লজ্জা পেয়েছেন। জয়তীর প্রতিক্রিয়া তাঁর চোখেই পড়ে নি। পড়লেও অন্য মানে করেছেন। কিন্তু কেন? কেন? কেন মা এভাবে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন? কেন তিনি সংসারে জয়তীর নিতান্ত সহজ, সাধারণ ভূমিকাকে এত

বড় করে দেখে তার মূল্য অকারণে কাঁপিয়ে তুলছেন? কেন মা আজ নিজের মেয়েকে ভয় পেতে শুরু করলেন?

আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই। জয়তী যেন ঘুম পাড়ানি গানের সুরে নিজেকে বোঝাতে লাগল। আমি এ ছাঁদে ভাবি নি, ভাবতে চাই নি। মা মামুলি, তাই আমাকেও চলতি একটা ছকে ফেলে তুচ্ছ ভাবছেন, তুচ্ছ করে তুলছেন।

নন্টুটা গাইছে না কেন? নন্টু গান গাক। নন্টু গান গাক। ও এখনও ছেলেমানুষ, এখনও নিষ্পাপ, এখনও মাছের মুড়ো না পেলে রোজগেরে দিদিকে গালাগাল দেয়। এই অসামান্য তুচ্ছ আর জটিল একটা পৃথিবীতে জয়তী বড় হতে চায় না। নন্টুর সারল্যের ছোঁয়ায় সে নিজেকে সুস্থ, স্বাভাবিক করবে।

বাবার ট্র্যাডিশ্যন্, মার কন্‌ভেন্‌শ্যন্ ভাঙতে পারার যোগ্যতা যদি না থাকে তা হলে জয়তী বড় হয় নি, হতে চায় না। নন্টুর সঙ্গ তাকে পবিত্র রাখবে।

এই মুহূর্ত থেকে জয়তীর স্বাভাবিকতার সাধনা!

॥ আট ॥

বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠোনের ওপর ঝুঁকে মুখ ধুলো। কুলকুচো করে ফেলার সময় লক্ষ্য করল সূর্যের আলোর কয়েকটা রঙ জলের গায়ে ঝিকমিক করে উঠেছে। বাড়িওয়ালাদের বাড়িতে কে যেন রেডিও খুলে দিয়েছে। সেই পরিচিত সুরটা, বেশ লাগে শুনতে। দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হবে।

সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে শাড়ি টেনে নিল। তাড়াতাড়ি নিল। কিন্তু এরই মধ্যে চোখ জোড়া সব কটা শাড়ির ওপর বুলিয়ে একটিকে পছন্দ করেছে।

জয়তী সুন্দর নয়। সেজেগুজে যে ঘুরে বেড়ায়, তাও না। তবু ঐ শাড়িটা না নিয়ে এটি পরার কাবণ কি ? কাঁধের ওপব দিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে আঁচলটা গুঁজতে গুঁজতে আপন মনে প্রশ্ন করল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে একবার দেখল। আঁচলেব ভেতর থেকে টেনে বের করে বিনুনীটা পিঠেব ওপর ঝুলিয়ে দিল। কেমন ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। হেসে ফেলল। হাসিটুকু ভারি সুন্দর তো। সুন্দর আর স্মার্ট। এই শাড়িতে জয়তীকে যেন হাল্কা দেখায়। মনে হয় ছোট মেয়ে, স্কুলেব উঁচু ক্লাসে পড়ে। বিকেলে যখন আসাদকে পাশে নিয়ে রাস্তা হাঁটবে, তখন অনেকেই ভাববেন ভাই বোন কাজে যাচ্ছে। আবার হাসল। দেখল এবারের হাসিটা ঠিক আগের মত নয়। একটু যেন পাকা পাকা। আব তাতে লজ্জা নয়, গৌরব আছে। অবাক হয়ে উপলব্ধি করল, ভালবাসতে পারার জন্য মনে মনে তার গৌরববোধের অন্ত নেই। ভালো না বেসে পারে না,

তা-ই জানত। কিন্তু প্রেম যে গৌরবের, মহত্ত্বের—একথা এমন ভাবে কখনো মনে হয় নি।

এই নে, বিল্টুকে দিয়ে লিখিয়ে রেখেছিলাম। মা বারান্দা থেকে বলতে বলতে একটা কাগজের টোকা হাতে ঘরে ঢুকলেন। বাড়িয়ে ধরে বললেন, ফেরার পথে কিনে আনিস।

জয়তী চোখ বোলাল। টুকিটাকি প্রয়োজনের জিনিস। মনে পড়ল কিছু টাকার দরকার। মাইনে পেয়েছে, অনেকেই আজ ছেঁকে ধরবে। এমন অবুঝ সকলে! তার উপার্জন যে প্রয়োজনে, এ কথা জেনেও ভাববে জয়তী এখন স্বচ্ছল। এমনকি প্রকাশদার মত বাস্তববাদীও প্রথম-মাইনে পেলে পেট পুরে খাওয়াতে হবে বলে শাসিয়ে রেখেছেন।

আসাদের প্রসঙ্গ যে মনে আর নেই এবং বন্ধুদেব অবিবেচনায় সে ক্ষুব্ধ—হঠাৎ তা উপলব্ধি করে জয়তী হকচকিয়ে গেল। মনটা কি আশ্চর্য যাদুঘব। যাদুঘর নয়, মেলা। জীবন্ত। আর হাসিতে, কান্নায়, বৈচিত্র্যে নাগরদোলার মত পাক খাচ্ছে। কখন উঠছে, কখন নামছে।

উঠছে আর নামছে। নিজেকে শাসন করল। বন্ধুদেব অবিবেচনায় সে ক্ষুব্ধ। কিন্তু জয়তী নিজেও কি এমনি অবিবেচক ছিল না, নেই? তার রোজগেরে সঙ্গীদের পয়সায় সেও কি আনন্দ করেনি? তখন কি সেই ব্যক্তিটির সমস্যার কথা একবারও ভেবেছে?

ভাবা যায় না। সমস্যা যে আছে, বাইরে থেকে তা বোঝার নয়। একজন প্রথম উপার্জন করেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তার অংশ নিয়ে বন্ধুরা ঘটনাটা সেলিব্রেট করতে চায়। যে উপার্জন করে,

সেও তাতে খুশি। তাকে ঘিরেই সকলের আনন্দ, একথা ভেবে খুশি। কিন্তু প্রথম উপার্জন থেকে নিজের খুশি চরিতার্থ করার জন্য টাকা চাওয়ায় কি যন্ত্রণা!

কি ভাবে কথাটা পাড়বে মনে মনে তার মহড়া শুরু করল। বড় বিশ্রী দেখায়। অথচ আগে কিছু চাইতে এত সংকোচ ছিল না। আবার না নিলেও সমান বিশ্রী দেখাবে। বন্ধুরা ভাববে জয়তী হিসেবী হয়েছে। মার পেছন পেছন পাশের ঘরে ঢুকল।

আঁচলে বাঁধা রিং থেকে চাবি বেছে মা বাক্স খুললেন। যা যা কিনতে হবে, হিসেব করে তার পয়সা দিলেন। তারপর একটা দশটাকার নোট তুলে ধরে ফিক্ করে হেসে বললেন, এই নে। উনি তোকে দিতে বলেছেন। ইচ্ছে মত খরচ করিস।

জয়তী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। স্ফীত পেট, রুগ্ন শরীরের কাঠামোয় মার হাসিটা কি আশ্চর্য। মা কি সব বোঝেন? বাবা বলেছেন? বাবা! মার চেহারার পাশে বাবার মূর্তিটা হঠাৎ জেগে উঠল। মনে হল মা আর বাবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাও এমনিভাবে ফিক্ করে হেসে ফেলেছেন।

সংসারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বাবা চিরকাল উদাসীন। মোটা মোটা কয়েকটা খবর ছাড়া কি ভাবে কি হয় না হয়, সে ব্যাপারে তিনি কোনদিনই কৌতূহলী নন। যেন কর্তব্যের জমিতে বেড়া তুলে এদিকটা তিনি মায়ের এক্তিয়ারে ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রথম উপার্জনের পর জয়তীর কিছু খরচ করার প্রয়োজন বা বাসনা থাকতে পারে, সে বিষয়ে বাবা সচেতন হলেন কি করে? মা কি তার হয়ে ওকালতি করেছিলেন? নাকি, বাবা-

মা দুজনেই তাঁদের মামুলি বাস্তববোধ দিয়ে সংসারে উপার্জনকারীর অধিকারের প্রশ্নে মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন?

জয়তী নিজেকে ধিক্কার দিল। নিজেকে ধিক্কার দিল। বাবা এবং আত্মসমর্পণ—দুইই এত পরস্পরবিরোধী যে চিন্তা করতে হাসি পেল।

কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ল। স্কুল-ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবার পর বাবা তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলেছিলেন, নে, তোর যা খুশি খরচ করিস। সেদিনও জয়তী অবাক হয়েছিল। অবাক আর খুশি। তখন সে উপার্জন করে না। সুতরাং বাবার টাকা হাত পেতে নেওয়ার সময় মনে কোন সংশয় জাগার অবকাশ থাকে নি। ভেবেছিল, বাবা খুশি হয়েছেন। আর সে-ও যে বড় হয়েছে, তার নিজের কিছু খরচের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে—টাকা ক'টা দিয়ে বাবা এই সত্যকেই স্বীকৃতি জানালেন।

আজও তো তাই। বাবা খুশি হয়েছেন। আর সেই সঙ্গে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন জয়তীর বিকাশকে। এই তো তার বাবা। এক বাড়িতে থেকেও দূরে দূরে। অথচ দূরে থেকেও কত কাছে। জয়তী জানত না। ভাবত তিনি উদাসীন। অথচ বাবা নিশ্চয়ই দিনে দিনে মেয়ের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করেছেন। হয়তো আড়ালে মার সঙ্গে কত কিছু আলোচনা করেছেন। আজ যখন সে সন্তানের কর্তব্য করল, উপার্জনের টাকা এনে দিল মার হাতে—তখন পিতার স্নেহে, গর্বে, তিনি শুধু উচ্ছ্বসিত নন, বাবার কর্তব্যেও অবিচল। মেয়ের প্রয়োজনের দিকে তাঁর নজর। জয়তীর বয়েসকে তাঁর স্বীকৃতি।

এই কি আত্মীয়তার বন্ধন? পুরুষানুক্রমে এইভাবেই বুঝি মানুষের পারিবারিক সম্পর্কের অস্তিত্ব চাকার মত ঘুরে ঘুরে এগোয়। আবেগে গায়ে কাঁটা দিল। যেন কান্না পাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে অশ্রু-বিসর্জন বড় নাটকীয়। হাসিমুখে সে মার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বাবার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

মা বললেন, বেবোবার আগে ওখানে প্রণাম করে যাস।

দেয়ালে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার যুগ্ম প্রতিমূর্তি আছে। পুবনো, কিছুটা বা বিবর্ণ। বিশেষ বিশেষ দিনে মা ওখানে প্রণাম করতে বলেন।

জয়তী সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অনেক আগে একটা মালা ছবিটাব গায়ে ঝোলানো হয়েছিল। অনেক আগে, হয়তো পয়লা বৈশাখে। ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে। সুতোটা আছে, দু-একটা শুকনো পাতা, ফুলের শুকনো বোঁটা। ছবিখানা ডানদিকে একটু বেঁকে গেছে। সুতো খুলে ফ্রেমটা ঠিক কবে রাখল। দুটি প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়ার ছবি। এঁদের জয়তী দেখে নি। বাবা-মাব কাছে বিচ্ছিন্নভাবে শোনা কয়েকটা টুকরো ঘটনা ছাড়া ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সম্পর্কে সে আর কিছুই জানে না। তবু এই ছবিটির সামনে দাঁড়ালে কি এক আশ্চর্য বোধ— হয়তো শ্রদ্ধা, হয়তো ভক্তি, হয়তো অন্য কিছু—কিন্তু কি এক আশ্চর্য আবেগ তাকে অস্পষ্ট ভাবে নাড়া দেয়। সম্ভবতঃ সম্পর্ক-বোধের চেতনা।

কিন্তু আজ ভক্তি নয়, শ্রদ্ধা নয়, এক অপরিসীম বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল। তার বাবার বাবা এবং মা। জয়তী দেখে নি,

জয়তী চেনে না। কিন্তু এঁরা একদিন বেঁচেছিলেন। তাদেরই মত যেমন তেমন একটা বাড়িতে সংসার পেতোছলেন। তারপর বাবা জন্মালেন। আশ্চর্য! বাবা চিরকাল পৃথিবীতে ছিলেন না। কিন্তু তখনও সূর্যের চারপাশে এই গ্রহটা ঘুরতো। আর জয়তী দেখে নি, জয়তী চেনে না। ওঁরা বেঁচে ছিলেন। তারপর বাবা বড় হলেন। এণ্ট্রান্স পাশ করলেন। সেদিন কি তার ঠাকুর্দাও বাবার হাতে পয়সা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ইচ্ছে মত খরচ কর? আর বাবাও কি তার মত খুশিতে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে ছিলেন? এবং জয়তী দেখে নি, জয়তী চেনে না। কিন্তু তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বেঁচেছিলেন। তারপর বাবা বি-এ পরীক্ষা না দিয়েই চাকরি নিলেন। প্রথম উপার্জনের দিনে কি ঠাকুমা বাবার হাতে এমনিভাবে পয়সা তুলে দিয়েছিলেন? সেদিন কি বাবাও তাঁর ঠাকুর্দা, ঠাকুমার ছবির সামনে একই বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন?

সে ছবি কোথায় গেল? এ ফোটো কোথায় যাবে? দিনে দিনে বিবর্ণ হবে, পোকায় খাবে। তারপর একদিন খসে পড়বে দেওয়াল থেকে। ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার সমস্ত অস্তিত্বের চিহ্ন মুছে যাবে। বাবা-মার মৃত্যুর পর মনে মনেও তাঁদের স্মৃতি বহন করার কেউ থাকবে না। অথচ সূর্যের চার পাশে এই পৃথিবী একই নিয়মের শাসনে ঘুরবে।

হিম হয়ে গেল। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার মত তার বাবা-মাও একদিন মারা যাবেন। হ্যাঁ, যাবেন। কিন্তু সেদিন? সেদিন আর সে অবস্থা, আহ্, জয়তী কল্পনা করতে পারছে না।

মৃত্যু, এই ছোট্ট কথাটা কতবার কানে শোনা। শব্দ নাকি ভাবের প্রতীক। কিন্তু মৃত্যু শব্দটি মরণের যথার্থ ভাবকে কতটুকু প্রকাশ করে? কতটুকু? সব থাকবে। যেমন ছিল তেমন থাকবে। মনের মধ্যে স্মৃতি থাকবে। একসঙ্গে দিন কাটাবার অভ্যাস থাকবে। অথচ যে মরে যায়, সে থাকবে না। মা থাকবেন না, অথচ জয়ন্তী স্নানঘর থেকে চীৎকার করে, মা ভাত দাও, এ কথা বলার স্বভাব হঠাৎ কি করে ত্যাগ করবে? বাবা থাকবেন না, অথচ বাইরে কড়া নাড়াব শব্দ শুনে হাতের উপন্যাস টেবিলে রেখে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াব যে অভ্যাস, তা কি ভাবে যাবে?

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানে। কিন্তু যা জানা যায়, তা মানা কত শক্ত! মানা বা মানিয়ে নেওয়া।

এই তো পৃথিবী। ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার জীবনেও কত দ্বন্দ্ব ছিল, আশা ছিল। আশা এবং আশাভঙ্গের সমস্যা। মিটে গেছে। মার কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা। বাবাব কত ব্যর্থতা, কত বেদনা। তাও মিটে যাবে। দাদার মৃত্যু, দিদির অসবর্ণ বিয়ে, সংসারের ভবিষ্যৎ—সমস্ত ভাবনা, যন্ত্রণার অবসান হবে। কিন্তু তারপরও সূর্যের চার-পাশে পৃথিবী ঠিকই ঘুরবে।

কেউ মনে রাখবে না, মনে রাখে না। ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে রাখে নি, বাবা মাকেও রাখবে না। কেউ জানবে না—একটি প্রাণ, তাব অভিজ্ঞতা, তার প্রয়াস, যন্ত্রণা। ভুলে যাবে, ভুলে যায়। কিন্তু পৃথিবী ঘুববে।

এই তো জীবনের নিয়তি। এত করে মানুষ কোথায় পৌঁছয়? জীবন কতটুকু। কত ছোট! কত সীমাবদ্ধতায় ভরা! দেশ,

মানুষ, ভবিষ্যৎ, তার প্রেম, আসাদ, ভালো-লাগা আর কর্তব্যের দ্বন্দ্ব—এ সবও তো একদিন থাকবে না। এই এককোঁটা জীবনের জন্য মানুষ এত অন্যায়, এত পাপ কেন করে? এই এক ফোঁটা জীবনের জন্য মানুষ এত অন্যায়, এত পাপ কেন সয়? এই এককোঁটা একটা জীবনেব জন্য জয়তীর এত যন্ত্রণা কিসের?

যদি পৃথিবীটা বদলায়, জয়তী যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে—সেই দিন আসে, যদি অর্থগত, জাতিগত, দেশগত কোন বিভেদ না থাকে, তার এবং আসাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ, বাবার ক্ষোভ, মায়ের চোখের জলের অদৃশ্য বাধা, সমতা ও সৌন্দর্যের তরঙ্গে ভেসে যায়—তবে সেদিনও তো এই ক্ষোভ, সংশয়, ভয়, যাবার নয়। সেদিনও পৃথিবীটা রূপে, রসে, গন্ধে ভরে থাকবে অথচ জীবন হবে সীমাবদ্ধ। যাবার আগে একটা তীব্র বেদনা ও অতৃপ্তি নিয়ে মানুষকে মরতে হবে। আহ্, মৃত্যুকে কি কোনদিন, কোনদিন জয় করা যাবে।

হঠাৎ প্রকাশদার কথা মনে পড়ল। প্রকাশদা যেমন জানেন পৃথিবী সুন্দর হবে, তেমনই আশা রাখেন মানুষ একদিন মৃত্যুকে জয় করবে। যে বিজ্ঞানে হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছে, সেই বিজ্ঞানই সাইবেরিয়ার বরফে ফুল ফুটিয়েছে। যে সভ্যতা চাঁদের দেশে উপনিবেশ গড়ার স্পর্ধা রাখে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাকে হটিয়ে দিতে পারে, সেই সভ্যতা একদিন পৃথিবী থেকে মরণকে নিশ্চিহ্ন করবে।

প্রকাশদা আশা করেন। আশ্চর্য ওঁর আস্থা মানুষের জীবনে, পৃথিবীর ইতিহাসে। চোখ দুটো দিয়ে সামনের ভবিষ্যতটা যেন

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—এমন প্রত্যয়ে কথা বলেন। কি করছেন এখন প্রকাশদা? ইস্, কত দেরি হয়ে গেল। ছি ছি! জয়তীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সীমা নেই। কলেজে প্রকাশদা, মায়াদি, রঞ্জিত। আরও কতজন, কত কাজ। এখানে জয়তী অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের কেন্দ্রে নিজেকে, নিজের চিন্তা, দ্বন্দ্ব, সমস্যাকে দাঁড় করিয়ে ভাবনার জাল বুনছে।

চোখের সামনে কলেজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে। লাল সুরকি ঢালা কম্পাউণ্ড, ধাপ ধাপ সিঁড়ি। উত্তর দক্ষিণে টানা বারান্দা, কাঁচের পাল্লা দেওয়া কয়েকটা নোটিস বোর্ড। অনার্স লাইব্রেরি, হল, কমনরুম—কি আশ্চর্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনদিন কলেজটা লক্ষ্য করে নি। তবু দিনের পর দিন দেখে বাড়িটার বিভিন্ন অংশ এত চেনা, জয়তী তা নিজেই জানত না।

চীৎকার করে বলল, মা, যাই।

মা রান্নাঘর থেকে জবাব দিলেন, যাওয়া নেই, এস।

এক রকম ছুটতে ছুটতে বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে খেয়াল হল এইটুকু পথ হেঁটে দরদর করে ঘাম ঝরছে। অথচ যতক্ষণ হাঁটছিল, তেমন গরম লাগে নি। একবার আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি হবে নাকি?

ক'দিন ধরে গরম ছিলই, আজ আবার কেমন একটু গুমোট। কান্নার আগে বনদি এমনই থমথম করছিলেন। হেডমিস্ট্রেসের চোখের জলের মত একরাশ বিস্ময় নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে যদি আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামতো!

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। অকূল বৃষ্টি। অসীম বৃষ্টি। অশেষ বৃষ্টি। অকূল, অসীম, অশেষ। আর? অপরিসীম, অবিশ্রাম, অপর্যাপ্ত। আর? অবিরাম। অনলস। অফুরাণ। পরপর শব্দগুলো মনে পড়ায় খুশি হয়ে নিজের পিঠ চাপড়ালো। গুণগুণ করে গেয়ে উঠলো, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

দিদিকে মনে পড়লো, নিজের শৈশব, কাগজের নৌকো। আয় বৃষ্টি আয়'। নন্মু, গান। নন্মু নৌকো ভাসায় না। শেলী সেন কি গান জানে, কিংবা নৌকো ভাসায়? শেলীর মা কি কোনদিন বাদলা ঋতুর ছড়া কেটেছেন? দাদার মৃত্যুতে মার গান বন্ধ হয়েছে।

'ধানের ওপর পোকা, জামাইগুলো বোকা'। মার দুই মেয়ে কিন্তু একটিও জামাই নেই, থাকবে না। মার গায়ে ঘামাচি। গুমোট।

মাসের হিসেবে শরৎ আসছে। কিন্তু প্রকৃতির ঘরকন্নায় বর্ষা এখনও কনে বৌর কুণ্ঠা ছেড়ে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক আর অভ্যস্ত ভূমিকা নেয় নি। আজকাল বাংলা দেশের ঋতুগুলো পঞ্জিকার বিধান মানছে না।

আণবিক অস্ত্রের পবীক্ষায় পৃথিবীর জল হাওয়া সত্যিই বদলাচ্ছে নাকি? ওয়েল্‌স্‌ বেঁচে থাকলে 'দি স্টার' গল্পটি বোধহয় নতুন করে লিখতেন। যে মহাপ্রলয় তিনি কল্পনা করেছিলেন, তা আজ আর আকাশের গ্রহ-তারা নির্ভর নয়। প্রশান্ত মহাসাগর বারবার বিক্ষুব্ধ হয়েছে। স্বপ্নের মত কয়েকটা দ্বীপ এখন বিষাক্ত। গান গাইতে গাইতে যে জাপানী জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরছিল—

পরমাণবিক বোমার বিস্তৃত পরীক্ষাগারে মূষিকত্ব লাভ করে এখন তারা কোথায়? জাপানের অনুনয় এবং প্রতিবাদ সত্বেও মানব-মুক্তির পতাকাবাহী ব্রিটেন দু-দুবার ঐ প্রশান্ত সাগরেই হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা করল। বৈজ্ঞানিকরা বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। শিল্পী সাহিত্যিকদের কণ্ঠে আর্তনাদ। কিন্তু মানুষ কত অসহায়।

অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য, বিকাশের জন্য তার নিজের কিছুই করার নেই। কেউ ঘরের পাশে মারণাস্ত্রের পরীক্ষা যদি করে, ফুলের মত শিশুদের রক্তে যদি বিষের হাওয়া ঢুকে যায়—তা হলেও সে বাধা দিতে পারবে না। শুধু একজন মানুষ বা একটি দেশ নয়—আজ সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে কয়েকটি মাথার ওপর। আর সেই ক'টা মাথাকে কেন্দ্র কবে একটি শ্রেণী। তাদের ব্যবসা, তাদের বাজার, তাদের রাজনীতি, তার পলিসি। চাল পাওয়া যাবে কিনা, কাপড়ের দাম কি হবে, উৎপাদনের কতটা সমুদ্রে ডুবিয়ে বা বশম্বদ রাষ্ট্রে দান করে বাজার দর চড়বে, আর যে দেশ উৎপাদনে অনগ্রসর তার উৎপন্ন দ্রব্যেব কতটা অংশ গুদামে আটক রাখলে দাম উঠবে, কোথায় ছোটখাট যুদ্ধ বাধলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসর গরম থাকবে—সবই ছকে দিচ্ছে সেই ক'টা মাথা।

বাবা বলেন যোগ্যতা অর্জন করলে, পরিশ্রমী হলে, জীবনে সাফল্য নিশ্চিত। মিথ্যে, মিথ্যে। যে রাজমিস্ত্রিটা ওই ওখানে মল্লিকদের পুরনো বাগানে নতুন বাড়ি তুলছে, তার যোগ্যতা আছে, সে পরিশ্রমী। কিন্তু কোনদিন ওর উন্নতি হবে না। সেই জাপানী

জেলে ক'টারও যোগ্যতা ছিল, শ্রম ছিল। কিন্তু কপালে জুটেছে বীভৎস মৃত্যু। আলজিরিয়ার যে-মা এখন তার ঘুমন্ত শিশুকে স্তন দিচ্ছে, সে জানে না একটু পরেই তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে কিনা।

আশ্চর্য! সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ কি নিয়তি। এমন দিন নাকি আসছে যেদিন পৃথিবীতে প্রাণ থাকবে না।

আহ্, ঘাস নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর রবিশঙ্করের সেতার নেই। পারীর মিউজিয়াম এবং বলশয় থিয়েটার নেই। কয়েক লক্ষ বছরের মানবীয় অস্তিত্বের যে ঐতিহ্য জয়তীর শিরায়, স্নায়ুতে বইছে—তার অবসান ঘটেছে। জয়তী নেই, আসাদও নেই। সমস্ত ইতির পরিসমাপ্তি।

একটু আগে মানুষের আয়ুর সীমাবদ্ধতায় শিউরে উঠেছিল। এই মুহূর্তে জীবনের সামগ্রিক বিনাশের কল্পনায় সে কি করবে, কি করতে পারে?

রাস্তায় পা ঠুকল। বাস আসছে না। স্টেট বাস হয়ে এই এক বিপদ। আগে এমন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু এই সুযোগে রাজনৈতিক গল্পের নায়িকার মতো সে কিছুতেই স্বাধীনতার অসারতা প্রসঙ্গে মনে মনে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবে না।

ভাবতেই হাসি পেল। আর তখনই আবার উপলব্ধি করল, ঘামে জামার পিঠটা ভিজে গেছে। ও হ্যাঁ, হঠাৎ যেন গরমটা চেপে পড়েছে। কিছু গুমোট ভাবও আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। গরম পড়েছে, গুমোট, হয়তো সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামবে। এই তিনটি সূত্রকে কেন্দ্র করে এক মুহূর্তে তার মন সমস্ত পৃথিবী—তার অতীত,

বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে পরিক্রম করে এল কি ভাবে? শুধু তো ঘোরে নি, প্রত্যক্ষ করেছে! সমুদ্র, একটা নৌকো, কয়েকটা মানুষের আবছা মূর্তি। নৌকোটা অবিশ্যি তাদের দেশী ছাঁদের। জেলে ক'টার চেহারায়ও কিছুটা বাঙালী শরীরের আদল আসে।

বোধহয় এমনই হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় মানুষের ভাবনা কল্পনায় এমনই বাস্তব অথচ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির সৃষ্টি করে। জয়তী ছবিতে বলশয় থিয়েটার দেখেছে, বইয়ে পারীর মিউজিয়ামের বিবরণ পড়েছে, সিনেমায় রবিশঙ্করের বাজনা শুনেছে এবং ফোটোতে রবি ঠাকুরকে চিনেছে। অথচ যখন চিন্তা করছিল, তখন তার পাঠ্য জ্ঞান ও লব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এমনি ভাবেই বাস্তব আর অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো সে একে একে ফ্রান্স, মস্কো, রবিশঙ্কর এবং রবীন্দ্রনাথকে চোখের সামনে দেখেছে। আলজিরিয়ার যে মা-টির কথা চিন্তা করছিল, এখন বুঝল তাকে দেখতে হুবহু তার নিজের মায়ের মত। কিন্তু যে খোকাকে তিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন, তার কোন রূপ নেই। এই শিশুটি কি সে, যে তাদের পৃথিবীতে আসার ঘোষণা জানিয়েছে মার শরীর জুড়ে?

আশ্চর্য! একটি শিশু জন্ম নিচ্ছে। অথচ জয়তী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে পৃথিবী থেকে প্রাণের চিহ্ন মুছে যাবে। দূর, তাও কি হয়? ছেলেমানুষের মত নিজেকেই প্রশ্ন করল। আর ভাবতে তার ভালো লাগল, এ কথা সে বিশ্বাস করে না, করতে পারে না। একবার চারদিকে তাকাল। বাড়ির ছাদ পেটাতে পেটাতে মজুর মেয়েরা বিলম্বিত সুরে কি যেন গাইছে। প্রতিটি আঘাত জানিয়ে দিচ্ছে, আছি আছি। মানুষ আছে, শ্রম আছে, ভবিষ্যতের

আয়োজন আছে। শত দৈন্য আর যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রাণ আছে। গান আছে! রবিশঙ্করের সাধনালব্ধ সুরই নয়, শ্রমের আবেগে জীবনের সহজাত সঙ্গীত।

মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচতে তাকে হবেই। কারণ বাঁচা আর বিকশিত হওয়া প্রাণের ধর্ম। এই ধর্মের তাগিদে বারবার সে ইতিহাস তৈরি করেছে। ইতিহাস এগিয়েছে, মানুষ এগিয়েছে।

আশ্চর্য! এক স্থির বিশ্বাস এবং দূরদৃষ্টি জয়তীর সমস্ত অনুভূতিকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। প্রত্যয় ও সাধনার এমন এক মাটিতে দাঁড়িয়েই বুঝি প্রকাশদা এত নিশ্চিত। আহ্, নিশ্চয়তা কি আশীর্বাদ। মানুষ সুন্দর হবে, পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, সে দিনের আর দেরি নেই—এমন বিশ্বাস করতে পারায় কি মুক্তি। জয়তীর প্রত্যয় আছে কিন্তু সাধনায় স্থিরতা নেই। স্থৈর্য চাই। যে শিশুটি আসছে তার জন্য, জয়তী আর আসাদের ভালবাসার জন্য—সমস্ত পৃথিবীর কাছে মানুষ হিসেবে তার যে দায়িত্ব এবং ইতিহাসে যে ভূমিকা, তা জয়তীকে পালন করতে হবে।

আছি, আছি। মানুষ আছে, ভবিষ্যতের আয়োজন আছে। বাড়ির ছাদ পেটাতে পেটাতে মজুর মেয়েরা বিলম্বিত সুরে গান গাইছে। শত দৈন্য আর যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রাণ আছে, গান আছে। জয়তীর ইচ্ছে হল, সে-ও গুনগুন করে গেয়ে ওঠে। শত জটিলতা এবং যন্ত্রণা সত্ত্বেও তার প্রেম আছে, গান আছে। মনে হল দিকে দিকে এই অস্তিত্বেরই ঘোষণা।

হাত দেখাল।

স্টপেজ থেকে কয়েক পা দূরে গিয়ে বাসটা থমকে দাঁড়াল। এঞ্জিন চালু অথচ গতি নেই। এক প্রচণ্ড অস্থিরতায় গোটা গাড়ি থরথর করে কাঁপছে। গজরাচ্ছে। কয়েকজন যাত্রী তাড়াহুড়ো করে নামলেন। একটি মেয়ে জয়তীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। জয়তীও পরিচিতের ভঙ্গিতে অল্প হেসে বাসে উঠল। ভাবতে লাগল মেয়েটি কে? কিছুতেই চিনতে পারছে না তো?

চিন্তা করতে করতে বাইরে তাকাল। দ্বিপ্রহরের দমদম রোড। এ দিকটা প্রায় নির্জন। কালো পিচের রাস্তা রোদ্দুরে চকচক করছে। দূরে তাকালে সত্যিই মরীচিকা দেখা যায়। গ্রীষ্মকালের দুপুরে এই পথটুকু আশ্চর্য স্তব্ধ আর নিবাসক্ত। দু-দিকে সারি সারি গাছ, ছায়া। এখানে ওখানে পাখি ডাকছে। বারোটার পরই দমদম রোডের এই অংশটা কেমন বদলে যায়।

বাঁ দিকে সেই ভাঙা প্রমোদ উদ্যান, তারপর একটা নতুন বিলাস কুঞ্জ। দু-একখানা ছোটখাট দোকান আছে কি নেই। ডান দিকে বিরাট এলাকা জুড়ে কাশীপুর ক্লাব। মাত্র দুটো স্টপেজ। কিন্তু এই একফালি রাস্তা গাছের ছায়ায়, পথের মরীচিকায়, পাখির ডাকে আর দু-একজন পথিকের ক্বচিৎ পদচারণায় কেমন যেন শান্ত, স্তব্ধ। জটিলতা নেই, সমারোহ নেই। জেগে আছে, অথচ তার কোন সোচ্চার ঘোষণা নয়।

ফাঁকা পথে গাড়ি ছুটেছে, হাওয়ার ধাক্কা। উষ্ণ বাতাস জয়তীর

চুল উড়িয়ে দিল। পথের গাম্ভীর্য, গাড়ির গতি, হাওয়া—সব মিলিয়ে জয়তীর চৈতন্যে কি যেন এক নতুনের জন্ম। সকালে যখন যায়, স্কুলের তাড়া থাকে। দুপুরে যখন ফেরে, তখন ক্লান্তি। কিন্তু যখন আবার কলেজের জন্য বাস ধরে, তখন জয়তী স্পষ্টই বুঝতে পারে সূর্যের গতির সঙ্গে তাল রেখে শুধু দমদম রোডই বদলায় নি, অনিবার্য মানসিক প্রক্রিয়ায় জয়তীরও পরিবর্তন ঘটছে।

জয়তী বদলাচ্ছে। বিল্টু, নমু, বাবা, মা—কিছু আর মনে নেই। যুদ্ধ, শান্তি, জীবন, মৃত্যু—এখন কোন সমস্যা নয়। এখন সত্য দমদম রোডের এই দুটি স্টপেজ। একটি প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে, একটি বিলাসকুঞ্জ নতুন উঠেছে আর ডানদিকে কাশীপুর ক্লাব নিজের শ্রী এবং ঐশ্বর্যে অবিচল। রাস্তার মরীচিকা, গাছের ছায়ার রেখাচিত্র, পাখির ডাক। ক্বচিৎ দু-একজন পথচারী হেঁটে গেল। জয়তী কলেজে যাচ্ছে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

সেই জলের কলটা আসতেই ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকাল। কেউ নেই। হাসি পেল। সে কি আশা করেছিল বুড়ীটা এই রোদে, গরমে এখনও তেমনি ভাবে বসে একটা ছাগলছানার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসবে?

চিড়িয়া-মোড়ের আগ থেকে রাস্তাটা আবার যেন জ্যান্ত। দোকান, পসরা, বিড়ির স্টলে রেডিও বাজছে। কে গান গাইছে? নমু হয়তো গলা শুনে বলতে পারত। ও, মনে পড়েছে। মেয়েটি বিপ্রদাসবাবুর ভাগ্নী। বাংলা দেশে বেড়াতে এসেছে। সেদিন প্রণতিদের বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। প্রণতি কি এখন ক্লাসে?

শুধু শুধু দুটো পিরিয়েড নষ্ট হল। এমনি করলে পার্সেন্টেজ থাকবে না। অবিশ্যি নীরেনবাবু আছেন। ভদ্রলোক আজকাল জয়ন্তীদের স্নেহের চোখে দেখছেন।

হাসি পেল। নীরেনবাবুর স্নেহ! মানুষটা কিছুতেই বদলালেন না। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়? এক রাস্তা, অথচ দিনের আলোর হেরফেরে পথের চেহারার এই পরিবর্তন। প্রতিদিন যায়, বারবার যেতে হয়। অথচ প্রত্যেক বার চোখ দুটোর সামনে এক নতুন আবিষ্কারের দরজা খুলে যায়। বাড়িগুলো এক, দোকান ক'টা এক, সাইনবোর্ডও আলাদা নয়। তবু কিছু না কিছু চোখে পড়ে, আগে জয়ন্তী যা দেখে নি।

জয়ন্তী কোনদিন দেখে নি পাইকপাড়া রাজবাড়ির লম্বা দেয়ালের একটা অংশ সম্প্রতি গাঁথা হয়েছে। দু-ধারে পুরনো ইট আর মধ্যিখানে একফালি নতুন দেওয়াল কি অদ্ভুত। বিচিলি কাটার এই দোকানটাও কি সে এর আগে লক্ষ্য করেছে? রাশি রাশি কাটা খড়ের ওপর একজন বসে, একটি মজুর হাতের জোরে কলের চাকা ঘোরাচ্ছে। টিনের চালার মাথায় হনুমানজীর নিশান উড়ছে। আর, ইস্কুল থেকে ফেরার সময় যে প্রাণচাঞ্চল্য বি. টি. রোডকে দুর্বার করে তুলতে দেখেছে, এই মুহূর্তের এই রাস্তার সঙ্গে তার মিল কোথায়?

মিল নেই। সূর্যের আলো শুধু দৃশ্যের চেহারাই পাল্টায় না, মানুষের দিন যাপনকেও নিয়ন্ত্রিত করে। টালা পোলটা পেরোল। পোলের ওপাশ দিয়ে পরপর কতগুলো মোষের গাড়ি সরষের তেলের খালি টিন বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়োয়ান কিছুটা

যেন নিশ্চিন্ত মনে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় লাগাম পেঁচিয়ে দু-হাতে খইনি টিপছে, গান গাইছে। কাজ আছে। শহরের জীবন থেমে নেই। কিন্তু কিছু আগের ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা এখন মিলিয়েছে।

পোলের তলা দিয়ে এঁকে বেঁকে রেললাইন চলে গেছে। অনেকগুলো মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। যেতে আসতে হামেশাই কিছু মালগাড়ি আর ট্রেণের কামরা যাযাবরের এলোমেলো আস্তানার মত এঁকে বেঁকে হুমড়ি খেয়ে থাকতে দেখে। যেন দূরে পা বাড়াবার জন্য কি এক নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু চলন্ত গাড়ি কদাচিৎ নজরে পড়েছে। রেললাইন ধরে যতদূর চোখ যায় তাকালো। ডানদিকে আর একটা ব্রিজ। এই সাদা সিমেণ্টের অর্ধবৃত্ত ছাঁদের সেতুগুলো দূর থেকে দেখতে অদ্ভুত লাগে। বাঁ-দিকে দিগন্ত অনেক দূরে। জটিল গতিতে পাক খেয়ে রেললাইন যেন দিগন্ত ছুঁয়েছে। আর লাইনের মাঝে মাঝে কয়েকটা কামরা যেন এক একটা দ্বীপ। এদিকে ওদিকে কিছু সাইডিং-এর ছাউনি। দূরে কি একটা কারখানার চিমনি থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে।

ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু তাতেও যেন এক নিশ্চিন্ততা। গলগল করে যখন ধোঁয়া ওঠে, পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে, ওপরটা কালো হয়ে যায়—তখন দূর থেকে দেখলে মনে হয় মাটির ব্যস্ততা আকাশেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন তাড়াহুড়ো নেই। লম্বা, কালো চিমনিটা এক পোড়খাওয়া অথচ সমর্থ ভূয়োদর্শীর মতো আয়েস করে একটু একটু গড়গড়ার নল টানছে।

অবাক হয়ে দেখল চারদিকে জীবন ছড়ানো, চারদিকে আয়োজন। অথচ সব জড়িয়ে কেমন এক অবসর। ঠিক অবসর

নয়, কিসের এক নিশ্চিন্তি। আস্তে আস্তে জয়তীর মনে এই নিশ্চিন্ত ভাবটা প্রশ্রয় পাচ্ছে, দানা বাঁধছে। হ্যাঁ, এখন তার অবসর। ঠিক অবসর নয়, কলেজের নানা বৈচিত্র্য ও উপকরণের মধ্যে তার এক সহজ নিশ্চিন্ততা। এখন সে ইস্কুল মিস্ট্রেস নয়, পরিবারের উপার্জনকারী নয়। ছাত্রী।

গানের মতো কথাটা কানে বাজল। ছাত্রী। কি আশ্চর্য আর মধুর এই ছাত্র জীবন। কি নিশ্চিত। বাড়িতেও অনেক উদ্বেগ। বাবা, মা, বিল্কু, নন্তু, পরিবারের ভবিষ্যৎ। ভুলতে চাইলেও পারে না, কেউ ভুলতে দেয় না—জয়তী সংসারের একজন উপার্জনকারী। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সেভেন্ ট্যাঙ্কস্ লেনের এই ছোট্ট বাড়িটা। কিন্তু কলেজে কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। ক্লাস করা, ফাঁকি দেওয়া, পড়া, না-পড়া, আর আড্ডা, আর কাজ, আর দুষ্টুমি এবং ছেলেমানুষি—

আহ্। জয়তী ছেলেমানুষ হয়ে গেল। অধীর আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে সে অপেক্ষা করছে। একটু আগেও কলেজে যাবার কোন তাড়া ছিল না। কিন্তু এখন কলেজটা—অনেকগুলো মুখ, অনেকগুলো ঘর, একফালি লন তাকে টানছে। টানছে। সমস্ত মন দিয়ে সে উপলব্ধি করছে কি যেন এক নাড়ির বাঁধন রয়েছে ঐ কলেজের সঙ্গে।

কিন্তু কেন? খুব একটা ভালো ছাত্রীর মতো নিয়মিত ক্লাস করতে যায় না। জয়তী বুঝে ফেলেছে, যে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা থাকলে উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট করা যায়, পারিপার্শ্বিক এবং নিজের মানসিকতা তার প্রতিকূল। প্রকাশদা বা মায়াদির মতো রাজনীতি

করার বাড়তি আকর্ষণও তার নেই। কিংবা স্তুতপা—যার মা বিখ্যাত ফিল্ম স্টার, যে নিজে নানা গুণ আর নেশায় বিশিষ্ট—তার মতো সকলের কাছে আপন ওজন যাচাই করে নিছক সময় কাটাতেও কলেজে আসা নয়। বা দীপালি, মোটামুটি সাধারণ একটি মেয়ে—ক্লাসের ভেতরে বা বাইরে সব কিছুতেই যার সমান উৎসাহ অথচ সব সময় যে একজন উপযুক্ত জীবন-সঙ্গী খুঁজছে, কলেজে আসার পেছনে যা নাকি মুখ্য কারণ—তার সঙ্গেও জয়তীর মিল নেই। অথচ তবু কি এক অমোঘ আকর্ষণে কলেজটা টানে। শতকরা নব্বইটা মেয়ের মতো এক বিশেষ বয়েস অবধি কলেজে পড়তে শেখার সাধারণ মানসিকতা বা কয়েক বছর কলেজে যাওয়ার নিছক অভ্যাসবোধই না, আরও যেন কিছু।

শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে নামল। একটা ট্রাম যাচ্ছে। বাসের জন্য অপেক্ষা করবে কি? ভাড়া এক পয়সা কম। কিন্তু এই আকস্মিক হিসেবীপনা মনের পরিণতি না সংকীর্ণতা? চিন্তা করতে করতে তাড়াতাড়ি ট্রামটাতেই উঠল।

কলেজের কয়েকটি ছেলে ঠিক সামনের সিটে বসেছে। জয়তী ওদের মুখ চেনে। ওরাও নিশ্চয়ই তাকে জানে। হ্যাঁ, নানা কারণে জয়তী বিখ্যাত। ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ছে। দু-দিন আগেও সমস্ত কাজে কর্মে প্রথম সারিতে ছিল। আস্তে আস্তে যে পিছিয়ে পড়ছে, সে খবর অন্তরঙ্গ অনেকেও জানে না। তাছাড়া ইউনিয়ন ইলেকসনে বরাবর তাদের ক্লাসে সব থেকে বেশি ভোট পেয়ে জিতেছে। কিন্তু ছেলেগুলো এদিকে এখন কি করছিল? নিশ্চয়ই অফ্ পিরিয়ডে মোড়ের ইউনাইটেড কফি হাউসে আড্ডা

মেরে গেল। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে জয়তী অনেকদিন যায় নি। আজ কি প্রকাশদার সঙ্গে, না, ওখানে অনেক চেনা মুখ। কথা বলার অসুবিধে হবে।

হাতিবাগানের মোড়ে পুলিস হাত দেখাল। জয়তী অধীর হয়ে উঠেছে। ঘড়িও নেই। শ্যামবাজারে একটা ঘড়ির দোকানে উঁকি মেরেছিল। কিন্তু হাজারটা ঘড়িতে হাজার রকম সময়ের নির্দেশ। একবার ইচ্ছে হল ছেলেদের একজনকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু লাভ কি? নিশ্চয়ই দেড়টা বাজে। আশ্চর্য, ট্রামে সে ছাড়া একটিও মেয়ে নেই। না, হয়তো পৌনে দুই। সে ছাড়া মেয়ে নেই, অথচ সব কটা সিট ভর্তি। এমন বড় একটা দেখেনি। ছেলেগুলো উত্তেজিত হয়ে কি তর্ক করছে? ও, আজ বুঝি খেলা আছে? উয়াড়ী আর মহামেডান স্পোর্টিং? একবার ইচ্ছে হল মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। কিন্তু লজ্জা করল। এসব লজ্জার কোন মানে আছে? দেখতে দ্বিধা অথচ শুনতে সংকোচ নেই। নিজের কাছেও না। অদ্ভুত!

জানিস? বটুকদা নিজে বলেছে আবিদ ওর কাছে এসেছিল। পাঁচশো টাকা অফার করেছে। মাঠে গিয়ে লাভ কি? মহামেডান জিতবেই।

রাখ্ বাপু, মেলা গুল দিস না। মিটার ফেটে যাবে। বটুকদা বলেছে, তমুকদা বলেছে। আজকাল আর এ সব চলে না। কেন, মহামেডান স্পোর্টিং লীগ পেলে গায়ে ফোস্কা পড়বে বুঝি?

কিছু কিছু বুঝল। অনেক আগে জয়তী ফুটবল খেলার

খবর রাখত। তাদের বাল্যকালে গোলকিপার কে, দত্ত ঘুষ খাওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু উয়াড়ী আবার কি টিম? ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, ক্যালকাটা ক্লাব—এ সবের কি হল? কে, দত্ত কোন্ দলে খেলতেন কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। যেন এই মুহূর্তে কথাটা মনে না পড়লে সব কিছু রসাতলে যাবে।

তা ভাই গায়ে একটু লাগবেই। ভারী ভারী গলা শুনে জয়তী আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ও কোণ থেকে বুড়োমতো এক ভদ্রলোক হঠাৎ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। বলছেন,শত হলেও মান ইজ্জৎ বলে তো কথা। আমি ভাই মোহনবাগানের সাপোর্টার। কিন্তু আজকের খেলায় মহামেডান জিতলে ওরা লীগ পাবে। ড্র গেলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমান সমান পয়েণ্ট হয়ে রি-গেম হবে। তবু ইস্টবেঙ্গলই লীগ পাক।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সমস্ত ট্রামে আলোচনাটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়েছে। হরেক বয়েস এবং নানা ছাঁদের ভদ্রলোক। কিন্তু আলোচনায় সকলেরই মনে সমান উৎসাহ। যাঁরা জয়তীর মত খেলার জগতে হালের খবর রাখেন না, তাঁরাও আভাষে ব্যাপারটা বুঝে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আর জয়তী বুঝল, এঁরা কেউই মহামেডান স্পোর্টিংকে জয়ের গৌরব দিতে চান না। তা হলে নাকি বাঙালীর সম্মান যাবে।

কিন্তু সেই ছেলেটি একা, একেবারে একা সকলের সঙ্গে সমানে তর্ক করে যাচ্ছে, যারা ভালো খেলেছে, তারা জিতবে। আরে মশাই, আপনাদের টিম্ তো ম্যাড্রাস থেকে, বম্বে থেকে প্লেয়ার

ভাড়া করে আনে। কলকাতার কোন্ দলে এখন বাঙালী খেলোয়াড় বেশি বলতে পারেন? তবু মহামেডান স্পোর্টিংই—

মুখ ঘুরিয়ে দেখল। খাকি রঙের ট্রাউজার পরা, নিতান্ত অল্প বয়েস। চোখে একটা খেলো সানগ্লাস। কব্জিতে ঘড়ি। অন্য সময় মনে হত বকাটে, এখন ইচ্ছে করছে ডেকে আলাপ করতে।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক হেসে ট্রামের উত্তেজনাকে হাল্কা করতে চাইলেন। বললেন, দাদু, চটেন কেন? ওরা জিতলে পাকিস্তানের কাগজে সাত কলম এডিটোরিয়াল বেরোবে। আপনার আমার কি?

দাদু সম্বোধনটা কি অশ্লীল। দাদা বা দাদুর মাত্রা না রেখে মানুষ কি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না? আর আহ্., এই তুচ্ছ রসিকতার পেছনে সমাজমানসের কতবড় সত্যই না উঁকি দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের আজও এঁরা বাঙালী বলে স্বীকার করতে পারেন না। অথচ ভারতবর্ষ একটি সেকুলার স্টেট!

আশ্চর্য! জয়তী জানে ট্রামের এতগুলো মানুষ কিছু আর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নন। দাঙ্গা চান না, বিপদের দিনে হয় তো বন্ধু মুসলমানকে আশ্রয়ও দেবেন। অথচ মহামেডান স্পোর্টিং লীগ জিতলে সহ্য করতে পারবেন না। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার কোন ক্ষেত্রে হিন্দু হিসেবে হেরে যেতে এঁরা রাজি নন। সংখ্যালঘু জাত হয়ে মুসলমানরা আছে, থাক। সুখেই থাক। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব যেন প্রতিটি ব্যাপারে সংখ্যাগুরুদের দাক্ষিণ্য এবং করুণার ওপর নির্ভর করে।

ইতিহাসের ছাত্রী জয়তী বুঝল কয়েকশো বছরের হিন্দু আধিপত্যের মনোভাব এমনি তুচ্ছ ব্যাপারেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। অজ্ঞাতে করে। কেউই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেন না। নইলে ইওরোপ বা আমেরিকার বর্ণ বিদ্বেষে এঁদের এত ক্ষোভ কেন ?

ততক্ষণে ট্রাম হেদোর মোড়ে থেমেছে। জয়তী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সেই ছেলেকটিও নেমেছে। বসন্ত কেবিনের সামনে ভিড়। ক্লাস ভেঙেছে, একদল ছেলে ঢুকছে। পরের ক্লাসে যাবে বলে আগের পিরিয়ডে যারা আড্ডা মেরেছে, তাদের অনেকেও বেরিয়ে আসছে। বসন্ত কেবিন স্কটিশ চার্চ কলেজের কমনরুম যেন। ক্লাসে অধ্যাপকরাও ঠাট্টার সুরে একথা বলেন। কবে যে একটা মোটামুটি ভদ্রগোছের কমনরুম হবে। দু-বছর হুজ্জোতি করায় টেলার সাহেব যে ঘর দিয়েছেন, তাতে পঞ্চাশজন ছেলেরও বসার ব্যবস্থা নেই।

দ্রুত হাঁটতে লাগল। ফুটপাতের এখানে ওখানে আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে ছেলেরা জটলা করছে। পান-সিগারেট খাচ্ছে। তিনটি মনিপুরী মেয়ে তাদের জাতীয় পোষাকে সেজে কলেজের দিকে যাচ্ছে। ওরা ডাণ্ডাসে থাকে, অফ্ পেলেই হস্টেলে চলে যায়। অফ্ পিরিয়ডে ছাত্রদের যেমন বসন্ত কেবিন, ছাত্রীদের তেমনি ওয়ান-সি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের ক্যান্টিন কিংবা ডাণ্ডাস হস্টেল। মেইন্ বিল্ডিংয়ের অপ্রশস্ত কমনরুমে ছাত্রীদেরও বসার জায়গা হয় না।

কলেজের সামনের রাস্তাটা যেখানে বিড্ন্ স্ট্রীটের সঙ্গে মিশেছে, সেই মোড়ে, ফুটপাতের ওপর, হেদোর সবুজ রেলিংয়ের

গা ঘেঁষে একটি হিন্দুস্থানী বুড়ো রোজকার মতই পান-সিগারেটের অস্থায়ী দোকান ফেঁদেছে। বুড়োর চোখে পুরু কাঁচের চশমা রূপোর ফ্রেমের একটা ডাঁটি ভাঙা। দেখে কম, কথাও বেশি বলে না। তাই সহানুভূতিতে ওর কাছেই সকলে কেনাকাটা করে। আগে উল্টো ফুটের এক চিল্‌তে ঘরটায় পান বিক্রির যে স্থায়ী দোকান, সেখানেই বুড়োটা বসত। তার ভাইপো না কে যেন তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ঐ দোকানের বিক্রি কমে গেল, ফুটপাতের এদিকে ক্রেতার ভিড় বাড়ল। এখন নাকি সেই ভাইপো খুড়োর জন্য হায় হায় করে। কিন্তু দিদিমা ওকে বুদ্ধি দিয়েছে, খবরদার, চোখের জলে ভুলো না।

ছাত্রীরা অবিশ্যি পান কেনার প্রয়োজন হলে দূরে যেতে বাধ্য হয়। সব সময় ছেলেদের যা ভিড়। তাছাড়া এখানে লেডিজ্‌' ফার্স্টের চল নেই। গায়ে পড়ে অনেকে ঠাট্টাও করে। সেকেণ্ড ইয়ারের বাচ্চা একটি ছেলে নাকি স্নুতপাকে পান কিনতে দেখে সিগারেট অফার করেছিল!

বুড়োর পানের দোকান পাশে রেখে মোড় ফিরল। কলেজের উল্টো দিকের ফুটে হেদোর রেলিংয়ের গায়ে ভর দিয়ে আরো অনেকে দাঁড়িয়ে। গেটের বাঁ-দিকে দক্ষিণ বরাবর সায়েন্স বিল্ডিং, জানলা দিয়ে গ্যালারি দেখা যায়। তারপব একফালি রাস্তা পেরিয়ে একের-সি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট। প্রথমে ইওরোপিয়ান স্টাফদের কোয়ার্টার। তারপর ছাত্রীদের ক্যান্টিন আর খেলার জায়গা। দোতলায় বি, টি, ক্লাস। গেটের ডান দিকে উত্তর বরাবর অফিস। জানলা দিয়ে নরহরিবাবুর টাক দেখা যায়।

তারপর ছাত্রীদের কমনরুম। একটু এপাশ ঘেঁষে দাঁড়ালে হঠাৎ দু-একটি মেয়ের চলাফেরা চোখে পড়ে। কমনরুমের জানলার ঠিক সামনে, কিন্তু আইন বাঁচিয়ে হেদোর ফুটে, মশলা-মুড়ি, বাদামভাজা আর আইস্‌ক্রিমের ব্যাপারী তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। ছেলেরা তো কেনেই। মেয়েরাও অনেকে জানলা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, পয়সা ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বলে কি দিতে হবে। ব্যাপারী মোড়কটা জানলা গলিয়ে ভেতবে ছুঁড়ে দেয়। লেডিজ্‌ কমনরুমের সঙ্গে সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজের সীমানাও শেষ। তারপর পুব-পশ্চিমে টানা বিড্‌ন্‌ স্ট্রীট।

গেটের ঠিক উল্টো দিকে, হেদোর ভেতর কাগজের বাক্সের মত ছোট একটা পাকা ঘর। বোধহয় কোন ক্লাব। রেলিংয়ের গা ঘেঁষে ক্লাবের পেছনের দেয়াল। তাদের যাবতীয় পোস্টার এই ছোট্ট আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেওয়ালটাতেই লাগাতে হয়। কারণ কলেজ বিল্ডিংয়ের গায়ে কাগজ সাঁটা বারণ। অন্যমনস্কের মত সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের সমর্থনে মাত্র কাল লাগানো পোস্টারগুলোর ওপর কোন এক প্রকাশকের লোক ইন্টারমিডিয়েট ইতিহাসের নোটের ঝকঝকে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে গেছে। চোখ ফিরিয়ে নিল।

গেটের মুখেই দিদিমা ধরল, এই যে দিদি। সক্কলে যায়, সক্কলে যায়। তোমাকে আর দেখি না। আমি ভাবি ব্যাপার কি ? সেই থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি।

জয়তী হাসল। বলল, কিছু না। আমাদের আর কি হবে বল ?

ষাট ষাট বাছা। অমন কথা মুখেও আনতে নেই। বুড়ী

জয়তীর একটা হাত চেপে ধরে শাসনের সুরে বলল, না দিদি। এমন করে কক্ষণো বল না।

বুড়ীর অনেক বয়েস। বিধবা। মাথায় পাকা চুল, ছাঁটা। পরণে আধময়লা থান। মুখটা পাকা আর বাসি ফলের মত টসটসে। পনের বছর ধরে নিয়মিত কলেজের সামনে ভিক্ষে করছে। পনের বছর ধরে এই কলেজকে দেখছে। অনায়াসে যে কোন ছেলে-মেয়ের হাত চেপে ধরে ভিক্ষে চায়। হাসে। না দিলে ধমকায়। সকলেই ওকে প্রশ্রয় দেয়। কারণ ভর্তি হওয়ার সময়ই দেখে আগে থেকে ও প্রশ্রয় পেতে অভ্যস্ত। তাছাড়া কলেজ সম্পর্কে বুড়ীর যে অধিকারবোধ, কেউই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। শুধু পয়সা নয়, পূজোর সময় পুরনো পোষাক, বছরের শেষে নতুন বই— বুড়ীর দাবি অনেক। আর এই করে এক নাতনির বিয়ে দিয়েছে, অন্য নাতিটাকে স্কুলে পড়াচ্ছে। নিজেই গায়ে পড়ে গল্প করে। তার। কলেজের। পনের বছরের গল্প। অনেক বিখ্যাত ছাত্র-ছাত্রীর কথা। পরবর্তী জীবনে কে কি করছে, সেই ইতিহাস। পুরনো অধ্যাপক ও প্রিন্সিপালের কাহিনী। এখনকার ছেলেমেয়েদের কেলেঙ্কারী। বুড়ীর পুঁজি অনেক। কার কাছে কতটুকু বলতে হয়, তাও জানে।

ব্যাগ থেকে দুটো পয়সা বের করল। তারপর কি ভেবে একটা দুয়ানি বুড়ীর হাতে গুঁজে দিল। একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছে দেখে হেসে বলল, আজ মাইনে পেলাম কিনা।

বুড়ী খুশিতে চোখ মুছল। তারপর বলল, বেঁচে থাকো দিদি। রাজরানি হও। আজকাল টিউশুনি করছ বুঝি?

না, মাস্টারি। ক্লাস আছে দিদিমা। পরে গল্প করব, এখন যাচ্ছি। হেসে ঢুকে গেল।

অনার্স লাইব্রেরিতে উঁকি মারল। গোল টেবিলটার ওপর প্রকাশদা বসে, একধার ঘেঁষে। চেয়ারগুলোও ভর্তি। বোধহয় কোন মিটিং করছেন। না, আড্ডা। ওদিকে ছোট টেবিলে পৃথ্বীশ কিসের পোস্টার লিখছে।

ওঃ, বারান্দায় এতো আলো দেখেই বুঝেছি কে আসছেন। প্রকাশদা হেসে বললেন, ঘেমে নেয়ে গেছ যে। আহা, এতদূর আসতে বড্ড পরিশ্রম হয়েছে বুঝি?

সকলে হেসে উঠল। মায়াদি বলল, কি ব্যাপার রে তোর?

দাঁড়াও বাপু। ক্লাসটা করে আসি। এখন তোমাদের তো আর ও সবের বালাই নেই। প্রকাশদা, ছুটির পর আপনার সঙ্গে একটু ইয়ে আছে।

ধন্য হলেম। সামনের দিকে ঘাড় নুইয়ে প্রকাশদা অল্প হাসলেন। তারপর গীতাকে বললেন, যাও মনু সাহেব, বিজয়ীদির সঙ্গে তুমিও ক্লাসটা করে এস।

দূর। গীতা মুখ গোঁজ করে বলল, পড়াশুনোই বোধহয় ছেড়ে দিতে হবে। তুমি বলছ এখন গিয়ে হরেনচন্দ্রের বকুনি শুনতে।

মনু সাহেব, তুমি একটা গপা। প্রকাশদা খানিক শাসন আর কিছুটা কৌতুক মিশিয়ে বললেন, এতো স্বাস্থ্য-বাই থাকলে কি চলে?

তুমি কি বুঝবে? গীতা ভারী গলায় বলল, ডাক্তারের রিপোর্ট—

নিকুচি করেছে। রিপোর্টটা আগে বেরোকই। সর্দি, কাশি, জ্বর কি কারোর হয় না? তুমি হাঁদা, তাই এক্স-রে করিয়েছ। দেখ তো আমি কেমন আছি? বুকের তস্‌বির নিলে কয়েক জায়গায় কাঁকন-পরা হাতের ছাপ বেরোবে। তাই তো ডাক্তারের ধার ঘেঁষেও যাই নে।

আচ্ছা? সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা না করলে কি নিজের গুরুত্ব কমে যায়?

থাম্ রঞ্জিত। ডেঁপোমি করিস নে। প্রকাশদা গম্ভীর হয়ে বললেন, মন্নু সাহেব তোর মতো দরকচা মেরে যান নি। আমার কথার মানে ঠিকই বুঝবেন। কি বল মন্নু সাহেব, অন্ততঃ তোমার হাতের ধাক্কাই কি আমার হৃদয়ের কয়েক জায়গায় লাগে নি?

গীতা হেসে ফেলল। আস্তে একটা চড় মারল প্রকাশদার হাতে। বলল, বাঁদর, ভাল্লুক, গাধা কোথাকার।

তারপর?

গালাগাল শুনতে খুব ভালো লাগে, না?

রামো বল। প্রকাশদা জিভ কেটে বললেন, অন্য কেউ হলে তাকে দেখে নিতাম না? তবে তোমার মুখে, মানে—এই আর কি।

গীতা খুশিতে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, যা হচ্ছ না দিন দিন।

এই তো। হাসি ফুটেছে, মুখ দিয়ে গালাগাল বেরিয়েছে। এতোক্ষণ কেমন চারদিক অন্ধকার করে বসেছিলে। এবার যাও।

ক্লাস করে এস। ভয় কি মন্নু সাহেব? প্লুরিসি যদি হয়ও, তার চিকিৎসা আছে। তুমি আমি কি সহজে মরতে পারি?

জয়তী দেখল গীতার পাণ্ডুর মুখটা যেন আশায় জ্বলে উঠেছে। উঠে দাঁড়াল। তারপর আবার ক্লান্ত গলায় বলল, নাঃ, বাড়ি যাই। বিশ্রী লাগছে। মায়ার সঙ্গে একটু পরেই রিপোর্ট আনতে যেতে হবে। বুঝলে, হয় অসুখ আমাকে শেষ করবে, না হয় আমি অসুখকে শেষ করবো।

শেষ কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করল যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন কি প্রকাশদাও। টেবিলের ওপর থেকে বই আর ব্যাগটা তুলে নিল। সকলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, যাই।

শোন? কাল কিন্তু বিকেলে যাচ্ছি। খাওয়াতে হবে মন্নু সাহেব।

এসো। গীতা হেসে বলল, যা না খাইয়ে। দরজা ঠেলে চলে গেল।

মায়াদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অসুখে অসুখেই মেয়েটা গেল। ঠিকমতো চিকিৎসাও হয়তো হবে না।

ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখে প্রকাশদা হেসে বললেন, ঝাঁসির রানি, এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে? হরেনবাবু অনেকক্ষণ ক্লাসে গেছেন।

এই রে। জয়তী অন্যমনস্কের মতো জিভ কাটল। কেটেই সচেতন হল। কলেজে ঢুকে তার কি পরিবর্তন। ছেলেমানুষের মতো জিভ কাটা যায়, দেরিতে ক্লাসে ঢুকতে হবে বলে বুক ঢিপঢিপ করে। কিন্তু গীতাটাব কি প্লুরিসি হবে?

শোন। ছুটির পরে একটা মিটিং আছে।

আচ্ছা। জয়তী প্রফেসর্স রুমের সামনে দিয়ে হলে ঢুকল।

হলের বেঞ্চিগুলোয় ছাড়াছাড়া ভাবে বসে অনেকে গল্প করছে। পত্রিকার স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে জনকয়েক কাগজও পড়ছে। হলের দু-ধারে সার সার ক্লাস রুম। ও মাথার দরজা পেরিয়ে লাইব্রেরি আর দোতলায় উঠবার সিঁড়ি।

বারো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দেখল বাইরে কয়েকজন অপেক্ষা করছে। অপরেশ, থার্টি ফাইভ আর নাইন্টি ওয়ান। দু-জনে একটু সরে জয়তীকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিল। অপরেশ হেসে বলল, কি খবর?

এই। জয়তীও হাসল।

সারাদিন দেখি নি যেন? ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে ছিলেন নাকি?

অন্যমনস্কের মত বলল, নাঃ, আসতে দেরি হয়ে গেল।

অন্যমনস্ক। কারণ তখনও গীতার কথা চিন্তা করছে। ডাক নাম মনু, ক্ষেপাবার জন্য প্রকাশদা বলেন, মনু সাহেব। এবং এই নামে তাঁরই মনোপলি। অন্য কেউ ভুল করে ডেকে বসলে জরিমানা দিতে হয়। প্রকাশদা যখন সত্যি সত্যিই জরিমানা আদায় করতে শুরু করলেন, তখন কারোর আর ভুল করার সাহসও রইল না।

গীতা বলত, কিন্তু সাহেব কেন? আমি তো মেয়ে। ঘটে কি ইংরিজি ব্যাকরণের জেণ্ডার জ্ঞানটুকুও নেই?

প্রকাশদা বলতেন, আছে বলেই তো সাহেব। তুমি মেয়ে নও মনু, ছেলে।

কথায় বার্তায় স্মার্ট, হাশি খুশি। বাইরে থেকে কে বুঝবে

একদা ওরা রেঙ্গুনের লক্ষপতি ছিল। যুদ্ধের সময় হাঁটা পথে পালিয়ে এসেছে। পথে বাবা মারা গেলেন, কলকাতায় পৌঁছে দাদা। মামার বাড়িতে থাকে। কষ্টে পড়াশুনো করে। প্রায়ই অসুখ লেগে আছে। টিউশনি বা অন্য কোন পার্টটাইম চাকরি করতে পারে না। বাড়ি বসে দুরূহ ডিজাইনের ব্যাগ তৈরি করে। কলেজে বন্ধুদের মারফৎ নিঃসঙ্কোচে তা বিক্রিও করায়। অতীত ঐশ্বর্যের রোমন্থনে যেমন অন্যকে চমকাতে চায় না, বর্তমানের দৈন্য ঢেকেও তেমনি নিজেকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই।

তাই গীতাই পারে। একমাত্র গীতাই পারে প্রকাশদাকে চড় মারতে, গালাগালি দিতে। এমনকি, মায়াদিও না, জয়তীও না। আর প্রকাশদাও গীতার সঙ্গে আশ্চর্য ছেলেমানুষ। হয়তো একপাল মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছে, সামনে পেয়ে একটু আড়াল রেখে জিভ ভ্যাংচালেন। একদিন অনার্স লাইব্রেরিতে বসে কি একটা কথার পিঠে প্রকাশদা গীতার মাথায় গাঁট্টা মেরেছিলেন আর বইয়ের ফাঁক থেকে একটা ব্লেড বার করে গীতা শাসাচ্ছিল, তোমার একগালের দাড়ি কামিয়ে দেব—এমন সময় দরজা ঠেলে ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল ভেতরে ঢুকেছেন। অন্য কোন প্রফেসর হলে না দেখার ভান করে চলে যেতেন। কিন্তু সরকার থমকে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, কি ব্যাপার? ব্লেড হাতে কি স্যুইসাইড্ ক্লাব খুলেছ?

সকলেই লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করেছে। গীতা কিন্তু হাসিমুখে জবাব দিল, না স্যার। বার্বার্'স্ অ্যাসোসিয়েশন। এরা কলেজের ডিসেন্সি রাখে না।

সি ইজ করেক্ট। সরকার কিলটা হজম করে প্রকাশদাকে বললেন, ব্যানার্জী, ইউ মাস্ট শেভ। কালই আমি দেখতে চাই।

পরদিন প্রকাশদা সত্যিই দাড়ি কামিয়ে ভাইস্-প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করলেন। মজা দেখবার জন্য বাইরে গীতা, জয়ন্তী, রঞ্জিত আরও কে কে যেন দাঁড়িয়ে। মাথা চুলকে আস্তে আস্তে বললেন, স্যার, শেভ্ করে এসেছি। কিন্তু স্যার, পূর্বাভাষের লেখাগুলো কাল আপনার সই করে দেওয়ার কথা ছিল। আজও—

ইয়েস্। তোমাদের এডিটোরিয়ালটা চলবে না বাপু। বাকি-গুলো নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, কালকের সেই মেয়েটি—কি নাম ওর? আই মাস্ট কনগ্র্যাচুলেট হার। শি ইজ রিয়েলি স্মার্ট।

অথচ আজ একটু আগেই গীতা বলে গেল, হয় অসুখ আমাকে শেষ করবে, না হয় আমি অসুখকে শেষ করব। আশ্চর্য। এই জীবনটা কি আশ্চর্য।

চলুন?

হ্যাঁ।

অপরেশ হেসে বলল, কি ভাবছেন এত?

হরেনবাবু এসে দরজা খুলে দিয়েছেন। রোলকলের মধ্যে ওঁর ক্লাসে কেউ ঢুকতে পারে না। শেষ হলে তিনি নিজেই ডেকে নিয়ে যান। তারপর আর ভেতরে যাওয়ার আদেশ নেই।

দেরিতে যেই ঢুকুক, তাকে নিয়ে ক্লাসে একটা অস্ফুট গুঞ্জনের সাড়া পড়ে। পাত্র বা পাত্রী বিশেষে তার মাত্রা বাড়ে, কমে। নানা ধাঁচের মন্তব্য এদিক ওদিক থেকে ছিটকে ওঠে।

প্ল্যাটফর্মের ডানদিকের বেঞ্চি কটা আর সামনের গ্যালারির

প্রথম তিনটে সারি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। এই ক্লাসে রোল মেনে বসতে হয়। জানলার তলায় ডানদিকের শেষ বেঞ্চিটার কোণে জয়তীর আসন। এদিকের সব কটি মেয়েই মুখের দিকে তাকাল। কেউ কেউ বা মৃদু হাসল। হঠাৎ মনে হল আর হঠাৎ জয়তী বুঝল —এইজন্যই কলেজটা তাকে টানে। এতগুলি মেয়ে তাকে দেখে খুশি হয়। তার জন্য অপেক্ষা করে। অকারণ খুশি, অকারণ প্রতীক্ষা। স্কুলের মত নয়, বাড়ির মতও না। অকারণ খুশি, অকারণ প্রতীক্ষা।

হঠাৎ মনে হল, হঠাৎ জয়তী বুঝল—এইজন্যই কলেজটা তাকে টানে।

জানিস ? আগের পিরিয়ডে কেলেঙ্কারী হয়েছে।

ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, কি রে ?

সামনের খোলা বইটার দিকে তাকিয়ে গৌরী বলল, প্রফেসর সেনের ক্লাস তো ? ঢুকে দেখেন টেবিলের ওপর এক গোছা ফুল আর বোর্ডে লেখা দেড় লাইন কবিতা—

প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল।

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

ফিক্ করে হেসে ফেলে জয়তী বলল, কোন মানে হয় ? নিশ্চয়ই—

হ্যাঁরে। গৌরী আর বইয়ের দিকে তাকাবার ভান করতে পারছে না। সরাসরি জয়তীর চোখে চোখ রেখে বলল, বিমান আর রোল নাম্বার ইলেভন। আমরা তো দেখলাম।

তারপর ?

ঝাড়া আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস ভেঙে দিলেন। সত্যি, এত বাড়াবাড়ি কিন্তু ঠিক হয় নি।

যেন চোখের ওপর দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। সাদা সেরওয়ানি আর ছাই রংয়ের লং কোট পরে প্রসাদ সেন। মাথায় বড় বড় চুল, চোখে পুরু চশমা। মুখটা পোড়া দাগে বীভৎস। হাসলে আরো খারাপ দেখায়। অথচ প্রসাদ সেনের চোখে মুখে যেন সব সময়ই হাসি। আশ্চর্য ইংরিজি উচ্চারণে সেক্সপিয়ার পড়াতে পড়াতে যখন অভিনয়ের ঢং এসে যায়, তখন ভুলে যান এটা ক্লাস। আর ঐ

অদ্ভুত পোষাক ও কিম্ভুত চেহারায় মধ্যযুগের রিচার্ড দি থার্ড যেন আর্তনাদ করে ওঠে : A horse. My kingdom for a horse.

স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রসাদ সেন একটা মিথ্। এখানকারই বিখ্যাত পুরনো ছাত্র। আজও ওঁকে ঘিরে একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী চালু আছে। ক্লাসের কোন্ মেয়েকে নাকি ভালোবাসতেন। অথচ তিনি বিয়ে করলেন একটি নিতান্ত সাধারণ ছেলেকে। প্রসাদ সেন তারপর অ্যাসিড খেয়েছিলেন। কিন্তু এক চুমুক গিলেই বাকিটুকু মুখ থেকে ফেলে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মরতে পারলেন না। সেদিন থেকে এই পোড়া দাগ। প্রসাদ সেন মরলেন না। পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত ঘুরে এলেন। তারপর বেশ কয়েক বছর এই কলেজেই অধ্যাপনা করছেন।

পরের গল্প প্রসাদ সেনের বিয়ে। মাথার চুলে পাক ধরার পর মাত্র বছর তিন আগে ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন। এই কলেজেরই একটি মাদ্রাজী ছাত্রীকে। প্রসাদ সেন ক্রিশ্চান। মেয়েটিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছে!

খবরটা একদিনের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার থেকেও সংঘাতিক গুজব কানে কানে ছড়াল। জয়তীদের বছর দুয়েকের সিনিয়ার ছাত্র, বর্তমানে সহপাঠী, কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন বিমান মল্লিক নাকি সেই মেয়েটিকে ভালবাসত, অথচ—। অবিশ্যি এ গল্প কেউ বিশ্বাস করে নি। হয়তো বিমান সত্যিই ভালবাসত। কিন্তু সে খবর কৃষ্ণার জানার কথা নয়। আর জানলেও দক্ষিণ ভারতের সেই আশ্চর্য মেয়েটি, যে প্রসাদ সেনকে ভালবাসার সাহস রাখে, সে কি ভাবে বিমানকে স্বীকার করবে?

কিন্তু তারপরই কলেজে ভদ্রলোকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। উঁচু ছুটো ক্লাসে ওঁর প্রতিটি পিরিয়ডে টেবিলে থাকে ফুল আর বোর্ডে লেখা ছড়া, কবিতা, ছবি। প্রথমদিন সকলেই ব্যাপারটা মনে মনে উপভোগ করেছিল। কিন্তু প্রসাদ সেন ছিলেন নির্বাক। দ্বিতীয় দিন কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছিল, কেউ কেউ হয় নি। কিন্তু প্রফেসর সেন আর উপেক্ষা না করে টেবিল থেকে একটা ফুল নিজের বাটনহোলে লাগিয়ে একটি সুন্দর ইংরিজি সনেট আবৃত্তি করেছিলেন। তৃতীয় দিনে ব্যাপারটায় বাড়াবাড়ি ঘটল। আগের অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে বোর্ডে এবার কৃষ্ণার ছবিও আঁকা হল। ক্লাসের অনেকেই সেদিন চটল। প্রতিবাদ করল, কিন্তু শক্ত গলায় নয়। কারণ বিমান মল্লিকের দলের সঙ্গে শক্ত গলায় কথা বলার সাহস সেদিন স্কটিশে কারোর ছিল না। অধিকাংশই রইল নির্বাক। আর প্রসাদ সেন ক্লাসে ঢুকলেন। বোর্ডের দিকে এক পলক তাকিয়ে সোজা গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে ডেকে আনলেন। তখন প্রিন্সিপ্যাল কেলাস সাহেব। বুড়ো, এমনিতেই পাদরি-গোছের মানুষ, তার ওপর রিটায়ার করছেন। যিশুখৃস্টের উপদেশ শুনিয়ে সকলকে সৎ এবং সুন্দর হতে বলে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু ঘটনাটায় প্রসাদ সেন আরও অপ্রিয় হলেন। অনেকেই ভাবল সামান্য ব্যাপারকে এভাবে পাকিয়ে তোলা ওঁর স্বভাব। আর সেই থেকে নানাভাবে প্রফেসর সেনকে অপদস্থ করার শুরু। আজ তিন বছর পরেও ক্লাসে তার জের চলছে। প্রসাদ সেনের একটি ছেলে হয়েছে। কি ভাবে সেই খবর মুখে মুখে রটেছে। তাই বোর্ডে এই দু-লাইন কবিতা।

জয়ন্তী সমস্ত ব্যাপারটা আজ তলিয়ে বুঝতে চাইল। ছাত্ররা অধ্যাপকদের সাধারণভাবে দূর জগতের মানুষ মনে করে। কারণ শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এদেশে নেই। অধ্যাপক জীবন শুরু করার পর ভালবাসা, বিয়ে করা, ছেলে হওয়া বা এ জাতীয় কোন ঘটনা বোধহয় তাদের চোখে অধ্যাপকত্বের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। অবিশ্যি প্রফেসারি শুরু করার আগে ও-পাট চুকিয়ে নিলে ক্ষতি নেই। প্রসাদ সেনের সমস্ত দুর্বিপাকের পেছনে ছাত্রদের এই অপরিণত মনোভাবই কি কাজ করেছে? নাকি প্রফেসর সেনের বেশি বয়েসেব জন্য এই কৌতুক? কিংবা একটা পোড়া মুখকে উপলক্ষ্য করেই কি যত ব্যঙ্গ?

এভাবে কোনদিন চিন্তা কবে দেখে নি। ঠাট্টা করতে হয়, করেছে। মাত্রাধিক্য ঘটলে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এভাবে উপলব্ধি করে নি, এ জাতীয় ঠাট্টা প্রফেসর সেনের পক্ষে কি মারাত্মক। আহ্, কি মারাত্মক।

প্রসাদ সেনের পড়ানো সকলের ভালো লাগে না। ওতে জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু পরীক্ষা পাশের সুবিধে নেই। তা ছাড়া ভদ্রলোকের উচ্চারণও সকলে বোঝে না। তারা বলে, সবই চালিয়াতি। জয়ন্তী মুখ টিপে হাসল। কিছুটা চালিয়াতি অবিশ্যি আছে। সুযোগ পেলেই ইওরোপ বাস আর নানা মনীষী সঙ্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তার কিছু কিছু বিশ্বাস করাও শক্ত। সুযোগ পেলেই যে কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে দেন। অনেক জানেন, এ কথা বোঝাবার কেমন একটা প্রবণতা যেন আছে। ছাত্রদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিশ্রী আর উদ্ধত ব্যবহার করেন। মাঝে

মাঝে আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ এবং মধুর। কখনো আবার কেমন যেন নির্বিকার।

সুতপা বলে ওর মার মতে প্রসাদ সেন আধা অমিত রায়, সিকি হ্যামলেট আর সিকি ডন কুইকসোট্। তিনিও এ কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে পোষাকে, ভঙ্গিতে, বাচনে ভদ্রলোকের স্বাতন্ত্র্য আছে।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে প্রফেসর সেন নিজের পোড়ামুখের হীনমন্যতাবোধ থেকে এক জটিল মানসিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। নিতে বাধ্য হয়েছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আবার ভালবেসে বিয়ে করে পৃথিবীকে একটি জীবন উপহার দিয়েছেন। এর ভেতর তাঁর দেশে-বিদেশে দীর্ঘ কয়েক বছরের ছাত্র এবং অধ্যাপক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কিন্তু সব মিলিয়ে মানুষটা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? জয়তী অবাক হল।

অবাক লাগল নিজেদের কথা ভেবে। প্রফেসর সেনের জন্য শ্রদ্ধা ও সমবেদনা আছে অনেকের। অথচ সুযোগ পেলেই একটু ব্যঙ্গ করে নেয়। কেউ রসিকতার সূত্রপাত করলে মনে মনে উপভোগ করে। এ কি বিচিত্র মানসিকতা! জয়তী নিজে নানা প্রসঙ্গে প্রফেসর সেনকে ঠাট্টা করেছে। সেই বিয়ের পর টেবিলে ফুল রাখার গল্প শুনে মুখে হাল্কা গোছের প্রতিবাদ জানালেও আসলে ব্যাপারটায় প্রচুর কৌতুক বোধ করেছে। অথচ সে ভদ্রলোকের যন্ত্রণা বোঝে!

এ কি আশ্চর্য বিরোধ। একজনের যন্ত্রণা বুঝি অথচ তাকে

যন্ত্রণাও দিই। কিন্তু যতই সীমাবদ্ধতা থাক, ব্যবহারে যতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাক—অধ্যাপক হিসেবে, মানুষ হিসেবে প্রসাদ সেনকে দিনের পর দিন, আহ্, দিনের পর দিন এ ভাবে অপমান করার কি ক্ষমা আছে ?

হঠাৎ কেমন যেন বিতৃষ্ণা এল। গৌরীর ওপর, যে কিছুটা দুঃখিত আর অনেকখানি খুশি হয়ে তাকে আজকের গল্প শুনিয়েছে। বিতৃষ্ণা এল অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে, যারা গোড়াতেই বাধা দেয় নি এবং পরে বিরক্ত হয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করেছে। বিমান মল্লিক স্কাউণ্ড্রেলটাকে জয়তী—কিন্তু কি করবে? প্রকাশদাটাও আচ্ছা, ক্লাসে থাকবে না। ছাত্রদের ভদ্র না করে অধিকারের চেতনা দিতেই ব্যস্ত। সখের রাজনীতি এমনই হয়!

চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। এইট্টি থ্রি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে। কি প্রশ্ন জয়তী তা শোনে নি। কিই-বা তেমন হবে। মানুষের কত রকম মোহ যে থাকে। এই ছেলেটা প্রত্যেক ক্লাসে কিছু না কিছু প্রশ্ন করবেই। রোগা, লম্বা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ভাবে নিজেকে জাহির করে ও কি চায়, কি পায় ? আর এইট্টি থ্রিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেই সকলে হাসে, অধ্যাপকরাও হাসেন। কিসের একটা রোখে যেন সবকিছুকে উপেক্ষা করে ও প্রশ্ন করে। আশেপাশের কয়েকজন ছেলে তাকে চুপি চুপি উত্তেজিত করে মুখে টিপে টিপে হাসে। কিন্তু কি চায় এইট্টি থ্রি, কি পায় ?

আজ স্পষ্ট করে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। চোখ জোড়া আপনিই গোটা ক্লাস ঘুরে এল। অজস্র মাথা, অসংখ্য ভঙ্গি, নানা

ছাঁদের মুখ। পোষাকেও বৈচিত্র্য। বেশে এবং কেশে। পানিংটা তো মন্দ নয়! কিন্তু আশ্চর্য, এই বয়েসের একটি ছেলে চুল আঁচড়াবার জন্য এতোটা মনোযোগ ব্যয় করে কেন? কিছু কি চায়? কিছু কি পায়?

একটা ক্লাসের আয়নায় এই অজস্র মাথা, অসংখ্য ভঙ্গি, নানা ছাঁদের মুখ আর প্রসাধন এবং কেশ বিন্যাসের যে আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও বিরোধ—মনে হল গোটা দেশের আর্থনীতিক অবস্থা বা সংস্কৃতি-মানের প্রতিটি স্তর-বিন্যাসের স্পষ্ট প্রতিফলন তাতে পড়েছে। সমাজ চিত্রের প্রদর্শনী! জয়তীকে যদি এই প্রদর্শনীর রিভিউ লিখতে দেওয়া হয় তা হলে প্রথমেই যে কমন ফিচারটি তার চোখে পড়বে, তা হল চশমা। ছেলে মেয়ে অধিকাংশের চোখেই চশমা। বাংলা দেশের চোখ এ ভাবে দুর্বল হচ্ছে কেন? সমালোচনার শেষে যৌবনের দুর্দশার ওপর একটা আবেগময়ী অনুচ্ছেদ জুড়ে দিলে জয়তী রাতারাতি নায়িকা। হঠাৎ নায়িকা বনার সখ জাগল নাকি? না জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে হালকা পরিহাস করে নিজের কাছ থেকেই বাহাদুরি পাবার চেষ্টা?

মরুকগে। বিরক্ত হয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল। দেখল সাবিত্রী ফাইল থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে কি লিখে স্লিপটা বেঞ্চে চালু করে দিল। কি লেখা আছে? সকলেই সতর্কভাবে পড়ছে আর হেসে ফেলছে। কি লিখেছে সাবিত্রী? আরো সতর্কতায় পাশের দিকে কাগজটা ঠেলে দিচ্ছে। একই লেখা। অথচ কত রকমের হাসি। একজনের চেহারার সঙ্গে যেমন অন্যের মিল থাকে না, তেমনি দুজনের হাসির ধরনেও কোন সঙ্গতি নেই। হাসি কি

সত্যিই চরিত্রের দর্পণ ? জয়তী কি এই মেয়েগুলোর মন বুঝতে পারছে ? কিন্তু কি লেখা আছে ?

এই ? সামনের বেঞ্চি থেকে মুখটা অল্প ঘুরিয়ে কিরণ বলল, এই জয়া, দেখ্।

কি রে ?

সাবধানে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। প্রথম বেঞ্চের একদম দক্ষিণে সাধনা বসেছে। এমন একটা জায়গা, সমস্ত গ্যালারির চোখ যেখানে পড়বে। ডান পাশে ঘাড়টা সামান্য কাত করলে সেও ওদিকে ইচ্ছেমত নজর দিতে পারবে। ডানা মেলা প্রজাপতির ঢঙে সাধনা আজ খোঁপা বেঁধেছে। তার ওপর রূপোর ঝুমকো কাঁটা গোঁজা। হালকা নীল রঙের ফিনফিনে ভয়েল পরেছে। পাড় নেই। ব্লাউজটার রং একটু গাঢ় নীল কিন্তু কাপড় আরো পাতলা। তলার জামার ফিতে পিঠের ওপর স্পষ্ট দুটো দাগের মত ফুটে রয়েছে। আঁচলটা ডানদিকের বুক থেকে সরে বাঁ কাঁধ ছুঁয়ে পেছনে উথলে পড়েছে। জয়তী পেছনে বসেছে। সাধনার মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে। ও চোখে মুখে কতখানি অন্যমনস্কতার ছায়া ফেলেছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

লজ্জা হল। মেয়েরা সস্তা—এই কুৎসিত ধারণা এরাই কলেজী ছাত্রদের মনে ঢোকায়। পরে বাস্তবে তার সায় না পেয়ে সেই ছেলেরাই সিনিক হয়ে ওঠে।

কিন্তু সাধনার মনস্তত্ত্ব জয়তী ঠিক বুঝতে পারে না। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বিরাট বড়লোকের মেয়ে। পরে জেনেছে ওরা নিতান্ত গরীব। দুই বোন স্টাইপেণ্ড নিয়ে পড়ে।

অথচ রং কালো হলেও সাধনা সুন্দরী। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা লাবণ্য ও স্নিগ্ধ শ্রী ঝরে পড়ে। তাই প্রসাধনের অশ্লীলতা সত্ত্বেও তাকে দেখলে ভালো লাগে। পড়াশুনোয় খারাপ নয়, নিয়মিত ক্লাস করে। কথায় বার্তায় ভদ্র। ইংরিজীতে চমৎকার অভিনয় করে, কলেজেও করেছে। প্রসাধনের সঙ্গে ওর রূপ, গুণ, আচরণের হঠাৎ মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। অথচ এই প্রসাধন ছাড়াও সাধনা যেন কিছুতেই সাধনা নয়।

সুতপাকে বুঝতে পারে। দেখতে সাধনার মত না হলেও প্রসাধনে প্রায় এক। বরং সুতপার রূপচর্চায় উগ্রতা কম। ক্লাসের বাইরে সিনেমা, একজিবিশান, খেলার মাঠ, অনেকে বলে রেসকোর্স আর বারেও নাকি তার অবাধ যাতায়াত। অজস্র ছেলের সঙ্গে আলাপ। প্রত্যেকের সঙ্গেই এমন অন্তরঙ্গ ভাবে মেশে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে সুতপা নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে হেসে বলে, না রে। ফ্লার্ট করছি।

ওর মা নায়িকার ভূমিকায় একদা যে সংলাপটি আউড়ে প্রচুর হাততালি পেয়েছিলেন, সুতপাও তার পুনরুচ্চারণ করে বলে, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ, বন্ধুত্ব, যৌন চরিতার্থতা, এমন কি বিয়ে করে ডিভোর্স পর্যন্ত চলে। কিন্তু প্রেমে একমাত্র মেয়েদের সঙ্গেই পড়া যায়।

অথচ সাধনার সঙ্গে ছেলেদের আলাপ নেই বললেই চলে। মেয়ে বন্ধুর সংখ্যাও খুব কম। নানাভাবে আকর্ষণ করে, অথচ কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

এমন নয়, সাধনা ছেলেমানুষ। নিজের যে শরীরটাকে

বিভিন্ন ছাঁদে সাজিয়ে অজস্র ভঙ্গিতে প্রদর্শন করছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ও বোঝে না। এমন নয়, রূপে অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনেক ছেলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য এক নির্মমতা আর রহস্যে সাধনা নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। রাখতে পেরেছে। তাই কলেজে সুতপার থেকেও ওর বদনাম বেশি। কিন্তু সাধনা কোনদিন নিজেকে বদলায়নি, কোনদিন না।

কিরণ বলল, আর ওই দেখ্।

জয়তী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মেয়েদের সারির পরের পরের গ্যালারিতে একদম ধারে বসে যে নেপালী ছেলেটি, একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সাধনার দিকে। জয়তী জানে আরও কিছু চোখ সাধনাকে দেখছে, দেখে। কিন্তু কিরণ হঠাৎ এই নেপালী ছেলেটিকেই বিশেষভাবে আবিষ্কার করল কেন? কে কার দিকে কিভাবে তাকিয়ে আছে, ও কি বসে বসে তাই লক্ষ্য করে? ছেলেটির চোখে মুখে কোন ভাব অভিব্যক্তি স্পষ্ট নয়। কিন্তু কি দেখছে? সাধনার অনাবৃত বুক? অন্যমনস্কের মত নিজের আঁচলটা আরও ভালো করে জড়িয়ে বসল। বসে সচেতন হল।

জয়তী সাধনা নয়, দেখতেও সাধারণ। তা ছাড়া তার দিকে এভাবে ক্লাসের কেউ তাকায় না, তাকাবে না। তবু আঁচলটা আর একটু টেনে দিয়ে সে কি অবচেতন মনে নিজের নীতিবোধ আর রুচিজ্ঞানের অহমিকাকে একটু প্রশ্রয় দিল? কিন্তু কি ভাবছে ছেলেটি? তার দেশের কোন কথা? পাহাড়ী গাঁ, ঘাঘরা পরা একটি মেয়ে, সূর্যমুখী ফুল? ছেলেটি কি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছে?

ভালবাসা কি ?

জয়তী ভালবাসে। প্রসাদ সেন ভালবাসতেন। ভালবাসা জয়তীর কাছে কোন সমস্যা নয়। কিন্তু ভালবাসার দরুণ তার জীবনে প্রচুর সমস্যা। প্রসাদ সেনের কাছে প্রেমই ছিল সমস্যা। আর প্রেমের দরুণ জীবনেও তাঁর সমস্যার অন্ত নেই। কিন্তু জয়তী এবং প্রফেসর সেনের সমস্যার চেহারা এক নয়। অথচ দুয়েরই জন্ম ভালবাসায়।

জয়তী ভালবাসে। কারণ, একটু ভেবে স্থির করল, কারণ ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসা কি, একথা তো কোনদিন ভাবে নি।

আর এই অন্বেষার মধ্যেই প্রফেসর সেনের জটিল মানসিকতার এক নতুন দিগন্ত হঠাৎ চোখে পড়ল। প্রেমের ব্যর্থতাই কি প্রসাদ সেনকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছিল ?

শুনেছে সেই মেয়েটি সহপাঠী অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করে-ছিলেন। ছেলেটি রূপবান বা ধনবান বা খ্যাতিমান ছিলেন না। তবু প্রসাদ সেনকে, প্রসাদ সেনের তীব্র ভালবাসাকে অস্বীকার করে ভদ্রমহিলা সেই ছেলেটিকেই বিয়ে করলেন কেন ?

তাঁদের জয়তী দেখে নি। সেই মেয়েটিকে না, সেই ছেলেটিকে না। ছেলেটি পরবর্তী কালের এক বিখ্যাত সাংবাদিক। সেদিনের সেই ভীরু, স্বল্পখ্যাত, সাধারণ একটি ছেলের মধ্যে মেয়েটি কি প্রতিভা খুঁজে পেয়েছিলেন ? আর আপন আবিষ্কারের আনন্দে, গৌরবেই কি নিজেকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিতে তাঁর বাধেনি ? মেয়েটি কি ছেলেটিকে ভালবেসেছিলেন, না, প্রেমে পড়েছিলেন নিজের আবিষ্কারের ? এবং একটি ভীরু, অল্পখ্যাত,

মামুলি ছেলের জীবনে পরবর্তী এই সাফল্যের কারণ কি তাঁর আপন প্রতিভা না মেয়েটির জীবনের ছোঁয়া? সস্নেহ প্রেরণা না ধিক্কৃত তাগিদ? কিংবা ছেলেটি যখন সত্যিই বিখ্যাত হলেন, সফল হলেন, মেয়েটি কি তখন হঠাৎ নিজেকে শ্রান্ত আর বাতিল মনে করতে আরম্ভ করেন নি? নাকি তিনি আজও আপন আবিষ্কারের মধ্যে সৃষ্টির পরিণতি দেখে তৃপ্ত, পূর্ণ?

আর সেদিন বিখ্যাত ছাত্র প্রসাদ সেন তাঁর স্মার্টনেস, তাঁর গুণ, তাঁর প্রতিভায় সমস্ত কলেজের শ্রদ্ধা কুড়িয়েও মাত্র একটি মেয়ের কাছে, একটি মেয়ের প্রতিভা এবং গভীরতা বিচারের কাছে পরাজিত হওয়ার যন্ত্রণায়ই কি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন? ব্যক্তিত্বের অপমানে হেমলকের পাত্র বরণ করার যাদুকরী মোহই কি প্রসাদ সেনকে য়্যাসিড পানের পথে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল?

ভদ্রমহিলা যদি রূপবান বা ধনী বা রূপবান আর ধনী একটি ছেলেকে বিয়ে করতেন, তাহলে হয়তো প্রসাদ সেনের ব্যক্তিত্বে এতবড় আঘাত লাগত না। তাঁর অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়তো না। মেয়েটিকে তুচ্ছ মনে করে স্বস্তি পেতেন। আজীবন একটি তুচ্ছ মেয়েকে দূর থেকে ভালবাসতে পারার মহত্ববোধে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতেন।

আর সেই মেয়েটির স্পর্শ পেলেন না বলেই কি ছাত্রজীবনের সমস্ত সম্ভাবনা প্রসাদ সেনের পরবর্তী জীবনে এভাবে ব্যর্থ হল? প্রেরণা ছিল না, নির্মম আর অধৈর্য তাগিদ ছিল না, তাই?

হঠাৎ সেই মেয়েটিকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হল। এবং কৃষ্ণাকে। আপন ব্যক্তিত্বের গগনস্পর্শী অভিমান নিয়ে প্রফেসর সেন কৃষ্ণার

মত মোটামুটি সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে কি ভাবে প্রাত্যহিক জীবন যাপন করছেন? প্রসাদ সেনের জীবনে কৃষ্ণার ভূমিকা কি? শুধু কি সন্তানের জননী হওয়া? কৃষ্ণা ভালবাসে না করুণা করে?

সচকিত হল। আজ এই মুহূর্তে তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা প্রেম আর যৌবনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সাধনা, ওই নেপালী ছেলেটি, প্রসাদ সেন—সকলকেই কি সে নিজের মানসিকতার ছায়ায় অস্পষ্ট করে ফেলছে? একটু আগে অবাক হয়ে চিন্তা করছিল সাধনার শরীর আর মন সমস্ত জাগতিক প্রভাব মুক্ত হল কিভাবে। নিজের শরীর দেখিয়ে যে অনুক্ষণ অন্যকে সজাগ মনে আকর্ষণ করছে, তার শরীর কি কোনদিন অন্যের আকর্ষণ বোধ করে না?

সমস্ত নির্মমতা আর রহস্যের আড়ালে সাধনা নিজেকে ঠকাচ্ছে, আজ এ কথা মনে হওয়ার পেছনে কি জয়তীর আপন অভিজ্ঞতা কাজ করেনি? সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা যে জানার গর্ব রাখে, নিজের শরীরের বিজ্ঞান তো তার না জানার কথা নয়। এবং জয়তী আসাদকে ভালবাসে। বয়েসের সঙ্গে দুজনের দেহ-মনের বদল যেভাবে ঘটেছে, তাদের ভালবাসার চরিত্র কি সেই অনুপাতে পাল্টেছে? নিছক দেখা হওয়া, গল্প করা আর ছেলেমানুষি ঝগড়ার যে রোমান্স, না, ঠিক রোমান্সের সচেতনতা তাদের নেই, যে অভ্যাস, বহু-বছরের স্বভাব আর অভ্যাস—তাতে কি তারা পরস্পরকে ঠকাচ্ছে না?

মন ভালবাসে। মন যখন শরীরকে আশ্রয় করে আছে, তখন শরীরও ভালবাসে। ভালবাসা পেতে চায়, জানতে চায়। জয়তীর

মন আসাদকে পেতে চায়, জানতে চায়। কোন ব্যবধান বা পর্দা সইতে পারে না। জয়তীর শরীরও কি আসাদকে পেতে চায়, জানতে চায়? সমস্ত দূরত্ব এবং আচ্ছাদন ঘুচিয়ে সে কি চায় আসাদের মধ্যে মিশে যেতে, তার মধ্যে আসাদকে ছড়াতে?

জানি না, বুঝি না বলে যে সত্য অস্বীকার করতে চায়, অস্বীকার করতে চায়—লজ্জায় আর ভয়ে যে সত্য জয়তী জানি না, বুঝি না বলে ভুলে থাকতে চায়—এখন তাকে চাপা দেবে কি ভাবে? কতকাল দেবে? কেন দেবে?

মন চায়, একথা ভেবে গর্ব। অথচ, শরীর চায়—এ চিন্তায় এত লজ্জা কেন? আর লজ্জা কাকে? আসাদকে? নিজেকে? আহ্, নিজের কাছে বা আসাদের কাছে কোনদিন, কোন বিষয়ে তো জয়তীর লজ্জা ছিল না। থাকার কথা নয়। আশ্চর্য! আসাদের মনে কি এ প্রশ্ন জেগেছে? সেও কি বুঝতে পেরেছে একটা অভ্যাসবোধে চালিত হয়ে তারা ভালবাসার খেলা করছে? তাদের শরীর, মনের বয়েস বেড়েছে কিন্তু দুজনের প্রেম আজও শৈশব পেরোয়নি?

এই নে। মুচকি হেসে গৌরী এক টুকরো কাগজ দিল। সেই স্লিপটা। সাবিত্রী লিখেছেঃ হরেনবাবুর গ্যাঁজানো আর শুনতে পারছি না। এবার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। তার তলায় আর একজনের মন্তব্যঃ মা হলে ছাড়তেন। ইনি যে বাবা।

শূন্য দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়ে রইল। এই পড়ে সকলে এ ভাবে হাসছিল? আশ্চর্য তো। হিংসে হল। এরা কত সহজে

হাসতে পারে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগে। স্লিপটা পড়ে জয়তীর মুখভাব কি হয়, তা ওরা লক্ষ্য করছে নাকি? একটা রসিকতা কে কিভাবে নিল দেখতে কৌতূহল হয় বৈকি। তা হলে তো জয়তীরও হাসা উচিত। হাসার চেষ্টা করল। তারপর সত্যি হেসে ফেলল। বেশ লিখেছে কিন্তু। মা নয়, বাবা। তুচ্ছ, কিন্তু উপভোগ্য। না, সত্যিই উপস্থিত বুদ্ধি এবং কৌতুকবোধ আছে। জয়তীর ভীষণ হাসি পাচ্ছে। স্লিপটার দিকে তাকিয়ে, নিজেকে দেখে। 'এবার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। জয়তী কি কিছু লিখবে? ব্লাউজের ভেতর থেকে পেনটা টেনে বার করল। লিখল: ধোৎ। তুইই। তাই তো ছেড়ে দিলেও আমরা যেতে পারি না। স্লিপটা পাকিয়ে নিপুণ কৌশলে গ্যালারির পাশে ফেলে দিল। যেন কোন বাজে কাগজ। কিছুক্ষণ পর প্রীতি আস্তে আস্তে পায়ের আঙুলে চেপে ওটা তুলে নিল।

আহ্। জয়তী বেঁচেছে। আর সকলের মত সেও হেসেছে, অন্যকে হাসাচ্ছে। কিন্তু নিজের কাছেই একটা কথা স্পষ্ট হল। একটা আবিষ্কার। ক্লাসে বসে পড়া না শুনে সে সকলকে দেখছে, নিজেকেও। আপন দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে জয়তী বিভোর। কিন্তু এ কথা একবারও কেন মনে হয়নি আরো অনেকের সেই ভালোলাগা আর না-লাগা জুড়ে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কেন মনে হয়নি আরো অনেকে নিজেকে দেখছে, সকলকে দেখছে, জয়তীকেও। নিজের মনের পৃথিবীতে জয়তী বন্দী। কিন্তু অন্যেরও তো মন আছে, চোখ আছে, কান আছে। তা হলে কি তার সামনে, পাশে, এদিকে, ওদিকে যতগুলি মুখ, যত কটা মানুষ—তাদের প্রত্যেকেই

এক একটি পৃথিবী ? আর সেই পৃথিবীতেও নিরন্তর ভাঙাগড়া চলছে ? এই পৃথিবীও কি অন্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখছে, দেখছে ?

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। পাশে গৌরী বসে আছে। সাধারণ একটি মেয়ে, রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ে নয়। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় জয়তী এই কবিতাটা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ ভাবলে হাসি পায়। গৌরীও ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ছে। তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু জয়তী কি জানে গৌরীর এই সাধারণ একটা শরীর আর আটপৌরে একটা মনে কি আছে ? জয়তী কি জানে গৌরীরও নানা দ্বন্দ্ব, নানা সমস্যা থাকতে পারে ? ওপর ওপর হাসি এবং ছেলেমানুষি দিয়ে সে তা ঢেকে রেখেছে ? জয়তী কি জানে সে যেমন দূরে থেকে প্রসাদ সেনকে দেখে, সুতপা আর সাধনাকে লক্ষ্য করে, তেমনি গৌরীও পাশে থেকে দীর্ঘকাল জয়তীকে দেখেছে ?

আবার চারদিকে তাকাল। একসঙ্গে পড়ছে অথচ কতজনকে জানে না। অল্প হাসি, দুটো একটা সংক্ষিপ্ত কথায় পরিচিতি বজায় রাখে। কিন্তু তাদের বোঝা, অন্তরঙ্গ হবার তীব্র আগ্রহ বোধ করে না। অথচ এ গর্ব বিলক্ষণ আছে, সে ক্লাসের একটি বিশিষ্ট মেয়ে। পড়ায় শ্রেষ্ঠ নয়, খেলায় রুচি নেই, মা অভিনেত্রী নন, বাবার গাড়ি নেই, সাবিত্রীর মত গান বা সাধনার মত অভিনয় করতে পারে না। তবু সে বিশিষ্ট। সকলে তাকে চেনে। অনেকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভোট দেয়। কারণ ভাবে, জয়তী প্রত্যেকের জন্য অনুভব করে। প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নেয়। প্রকাশদার মত, মায়াদির মত। মনে করে জয়তী তাদের ভালবাসে।

নিজেও এতদিন তাই জানত। কিন্তু এ কিরকম ভালবাসা? সুখ্যাত বা কুখ্যাত যারা—তাদের কয়েকজন ছাড়া জয়তী অন্যদের মনে রাখার কি-চেষ্টা করেছে? সত্য অর্থে বন্ধু তার কজন? জয়তীর কাছে অনেকে এসে মনের কথা খুলে বলে। কিন্তু সে কজনের কাছে নিজেকে খুলে ধরেছে?

একটা বিরাট ফাঁকি আজ হঠাৎ ধরা পড়ল। আর উপায়ও নেই। ফোর্থ ইয়ার। কলেজের জীবন শেষ হয়ে এল। চার বছর স্কটিশে পড়েছে। কলেজকে ভালও বেসেছে। অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছে আন্দোলনে। কিন্তু উত্তেজনা আর অভ্যাসবোধই জয়তীকে চালিয়েছে। তাই প্রথমে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরে সেইভাবে আস্তে আস্তে সরেছে। ভালবাসার উপলব্ধি ছিল না, উপলব্ধির ভিত্তি ছিল না, তাই নিজের সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এই?

কিরে? চমকে তাকাল। মিত্রা বিনুনী ধরে টান দিয়েছে।

প্রফেসর দাশের কাছে তুই তা হলে যাবি না?

হঠাৎ প্রসঙ্গটা মনেই পড়ল না। একটু থতমত খেয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, কেন?

মিত্রা আবার বিনুনীতে মৃদু টান দিয়ে বলল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলি না তো।

কাল চ। এই, মুখ ঘোরা। স্যার দেখছেন।

মিত্রা তাড়াতাড়ি সিধে হয়ে বসল।

এখন মনে হচ্ছে মিত্রাও একটা চরিত্র। একটু ভীরু। দুর্বল গোছের মেয়ে। দিনরাত পড়ে আর পড়ার কথা আলোচনা করে। জয়ন্তীর জন্য ওর খুব আক্ষেপ। প্রায়ই বলে, চব্বিশ ঘণ্টা এই কর। বেশ আছিস বাবা।

মিত্রাও জানে না জয়ন্তী গত কয়েক মাসে সরে গেছে। কিন্তু মিত্রার গলার স্বরে শুধু অভিযোগই থাকে না—একটু যেন অভিমান, একটু বা ঈর্ষা।

সমস্ত ক্লাস করতে হয়, সব সময় পড়তে হয়, তাই? জয়ন্তীর মত কামাই করে, আড্ডা মেরে, কাজে কর্মে সময় নষ্ট করতে পারে না, তাই? তাই বুঝি মাঝে মাঝে লোভীর মত মিটিংয়ের গল্প, স্ট্রাইকের কাহিনী, রবীন্দ্রভারতীতে অনুষ্ঠানের বর্ণনা শুনে নিজের খিদে মেটায়? কিন্তু মিত্রা যে তার জন্য, তাদের জন্য অনুভব করে—তাও তো মিথ্যে নয়।

আজ তোর প্রক্সি তিনজনে একসঙ্গে দিয়েছে। একেবারে কেলেঙ্কারি।

তাই নাকি? স্যার বুঝেছেন?

কি জানি। ছেলেরা মুখ টিপে হাসছিল রে। তোর প্রকাশদাও।

বয়ে গেছে। জয়ন্তী ঠোঁট উল্টে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে টেবিল চাপড়ে হরেনবাবু বলে উঠেছেন, প্লিজ, প্লিজ। আর চুপ করে গেছে সকলে। কিন্তু জয়ন্তী জানে কিছুক্ষণ পরেই আবার বিচ্ছিন্ন ভাবে কথা শুরু হবে।

কলেজের সমস্ত ক্লাসকে জয়তী তিন ভাগে ভাগ করেছে। প্রফেসর দত্ত বা সুধীরবাবুর ক্লাস। সকলে এঁদের জন্য অপেক্ষা করে। দত্তের জন্য অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা, সুধীরবাবুব জন্য শ্রদ্ধা আর ভয় নিয়ে অপেক্ষা করে। কিংবা দেরেনবাবু। খুব একটা শ্রদ্ধা বা ভয় নেই। কিন্তু পরীক্ষা পাশের তাগিদ আছে। দ্বিতীয় ভাগে অধিকাংশ প্রফেসর। তাঁরা পড়ান—ইচ্ছে হলে কেউ শোনে, কেউ শোনে না। গল্পের বই পড়ে, ছবি আঁকে, কাগজ চালাচালি করে। অধ্যাপকদের চোখ বাঁচিয়ে মাঝে মাঝে গল্প গুজবেও অংশ নেয়। তাই হরেনবাবুর পিরিয়ডে বিচ্ছিন্নভাবে কথা হবেই। টেবিল চাপড়ে অনুরোধ করলে চুপ করবে সকলে। কিন্তু কিছু পরে আবার আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে দুটো একটা কথা বাড়বে। দুটো একটা কথা, দুটো একটা প্রশ্ন। শুধু নোট দিলে ঐ পরীক্ষা পাশের তাগিদেই মনোযোগী হয়ে উঠবে সকলে। আর আছে কয়েকজনের ক্লাস। নিরবচ্ছিন্ন গণ্ডগোল চলবেই। অধ্যাপক অনুরোধ করবেন, তর্জন করবেন, হয়তো ক্লাস ভেঙে দেবেন। নইলে নিস্পৃহের মত পড়িয়ে যাবেন। যারা পড়ুয়া বা একটু বিবেকের ধার ধারে—তারা চুপ করে থাকলেও বাকি অনেকে কথা বলবে, মন্তব্য করবে, এমন কি গুনগুন করে গানও গাইবে। কে বলবে তখন, এটা একটা ক্লাস এবং কলেজে ভর্তি হওয়া বা দিন কাটানোর কিছু আইন কানুন আছে।

জয়তী জানে ছাত্রীরা প্রকাশ্যে গণ্ডগোল কম করে। কম করে, কারণ প্রথমতঃ ভদ্রতা, শিষ্টাচার ইত্যাদিতে মেয়েরা একটু বেশি মাত্রায় প্রখর। তাই চেঁচিয়ে মন্তব্য করে না, গল্প ফাঁদে এমন

ভঙ্গিতে যে স্বয়ং অধ্যাপকও মনে করেন তাঁরই পড়ানোর সূত্র ধরে একটু আলোচনা করে নিচ্ছে। খাতায় লেখালেখি, বিনুনি ধরে টান বা দুজনের আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধার মত দুষ্টুমি এত সতর্কতায় সারে যে হঠাৎ তা চোখে পড়া মুশকিল। দ্বিতীয়তঃ, এক ঘর ছেলের সামনে অধ্যাপকের বকুনি খাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু ছেলেদের সতর্কতা থাকলেও এ ব্যাপারে তারা মেয়েদের মত ভীরু নয়। বরং বিমান মল্লিক জাতীয় এমন ছাত্রও আছে, যারা বকুনি খেয়ে বেরিয়ে যাওয়াকে শিভালরি মনে করে।

হাসি পেল। কলেজ জীবনের টুকরো টুকরো ছবি মনে পড়ছে। অজস্র। পরস্পর-বিরোধী। একটার রঙের সঙ্গে অন্যের রঙে মিল নেই। অথচ সব মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য প্রেক্ষাপট। বাইরের এই আপাতউচ্ছলতার মধ্যে কত কান্না আর অভাব, স্বপ্ন এবং সংগ্রাম। কতো যন্ত্রণা। গোটা কলেজ জীবনটা নানা বিরুদ্ধ মনোভাব ও আবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ঘূর্ণির মধ্যেই তার সত্য পরিচয় হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ। তাই জয়তী স্কটিশ চার্চ কলেজের কোন ব্যতিক্রম নয়। একটা অংশ।

তাছাড়া পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাস এত মনোটোনাস। অধিকাংশ অধ্যাপকেরই ব্যক্তিত্ব নেই। এমন কি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ভান পর্যন্ত জানা নেই। সকলে যেটুকু শোনে, চুপ করে থাকে—তা প্রাণের দায়ে। পাশ করার তাগিদে। কিন্তু দায়ে পড়ে বা ভয় করে ডিসিপ্লিন মানার ভান কি বিড়ম্বনা।

এ জন্য কাকে দায়ী করবে? জয়তী বোঝে। জানে। তবু মাঝে মধ্যে কথা না বলে পারে না।

অধ্যাপকদের? কিন্তু ঐ প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বছরের পর বছর একই কথার পুনরাবৃত্তি এবং মামুলি রসিকতায় মন ভোলানোর চেষ্টা কি যন্ত্রণা!

আজ মাস্টারি নেওয়ায় জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ক্লাস ম্যানেজ করার যে মর্মান্তিক প্রচেষ্টা, করতে না পারার গ্লানি, নিজে উপলব্ধি করেছে, চারুদি হৈমদির মধ্যে দেখেছে—সেই একই চেষ্টা, গ্লানি, ক্ষোভ তো তার অধ্যাপকদের মধ্যেও আছে।

অবাক হয়ে হরেনবাবুর দিকে তাকাল। জয়তীর অধ্যাপক। তার অচেনা জগতের মানুষ। দূর থেকে যাঁকে শ্রদ্ধা করতে হয়, ভয় করা যায়। কিন্তু হরেনবাবু তো একটি সাধারণ মানুষ। তার ছাত্রীরা যেমন জানে না টিচার জয়তীদি একটি সাধারণ মানুষ, তেমনি সেও কি বুঝবে না ঐ প্ল্যাটফর্ম আর চেয়ার আর টেবিলের সঙ্গে ক্লাসের এই বেঞ্চি ক'টার ব্যবধান যত বড়ই হোক, আসল একটি জায়গায় সব সমান।

এই ক্লাসেরই কত জন টিউশনি করে মাইনে জোগায়। তারা জানে মনোযোগের অভাব ও অনাগ্রহ যে পড়ায় তাকে কত বিচলিত করে। অথচ নিজেরা যখন ছাত্র হয়ে ক্লাসে বসে, তখন সেই বোধ কেমন অনায়াসে লুপ্ত হয়ে যায়। একই নিয়মে স্কুল টিচার জয়তী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছাত্রী জয়তীর একি আশ্চর্য বিরোধ। স্বভাবে, মানসিকতায়। আহ্, একি আশ্চর্য বিরোধ!

হরেনবাবুর মুখের পাশে হৈমদির রুগ্ন, করুণ মুখটা উঁকি দিচ্ছে। আর, শিক্ষিকা জীবনের দায়িত্ববোধ যে তার নিরুদ্বিগ্ন

ছাত্রী-জীবনেও প্রভাব ফেলছে, তা জয়তীর সদ্য আবিষ্কার। আর বোধহয় ক্লাসে বসে ছেলেমানুষি করতে পারবে না। মাস্টারি জীবনের ট্র্যাজেডি তার জানা। হৈমদির মুখের পাশে শর্বরীর মুখ।

আহ্, জয়তী আর আগের মত নিশ্চিন্ত ছাত্র জীবনের আপন খেয়াল খুশিতে ফিরে যেতে পারবে না। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন হওয়ার কোন ক্ষেত্র রইল না। অবকাশ না। অস্তিত্বের পরিবর্তন। বোধহয় এমনিই হয়। এইভাবেই হয়।

দুঃখ হচ্ছে, ভালোও লাগছে। দুঃখবোধ আর ভালোলাগা—এই দুই বিরোধী মনোভাবের মধ্যে নতুন জয়তীর জন্ম হচ্ছে।

যে দায়িত্ববোধকে প্রথমে সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়, পরে বাড়ির ভেতর সীমাবদ্ধ রেখে স্কটিশ চার্চ কলেজে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে চেয়েছিল, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই সেই দায়িত্ববোধকে আজ ছড়িয়ে দিতে হবে। জীবন বড় হচ্ছে আর বড় হচ্ছে। তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধও বাড়ছে।

কবিতার মত আবৃত্তি করে নিজেকে শোনাল, বড় হচ্ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। আর মনে হল, এমনিই হয়। এমনিই হয়েছে।

॥ এগারো ॥

অনার্স লাইব্রেরির নাম কেন যে এমন, জয়তী তা জানে না। কলেজের কালো চত্বরটুকু পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ক-ধাপ তা অবিশ্যি কোনদিন খেয়াল করে নি। তারপর উত্তর দক্ষিণে টানা বারান্দা। বারান্দার মধ্যিখানে সরু প্যাসেজ ধরে হলে যেতে হয়।

অধ্যাপক আর ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বারান্দারই উত্তর দিক ঘেঁষে সুইং ডোর আছে। ভেতরে অনার্স লাইব্রেরি। মাঝারি একটা ঘর, কিছুটা প্যাসেজেরও কাজ দেয়। দরজার কাছে দুটো আলমারি! খান কয়েক বই। পূব-পশ্চিম দুই মুখে দুটো টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। পশ্চিমের টেবিলটা বড় আর গোল।

অনার্স লাইব্রেরির বাঁ দিকে প্রফেসর্স কমনরুম, ডানদিকে একটা আপিস ঘর। কিসের অফিস তা জানা নেই। শুধু মাঝে মাঝে দেখে নীরেনবাবু ঢুকছেন আর প্রফেসর অ্যালেন এসে সাইক্লো মেসিনটা চালাচ্ছেন। লাইব্রেরি পেরিয়ে একটুখানি বারান্দা। বাঁ দিকে প্রফেসর্স রুমের দ্বিতীয় দরজা, ডানদিকে একটা কাঠের রেলিং। বারান্দার চৌকাঠ ডিঙিয়ে হল্। ছাত্রদের প্যাসেজকে আলাদা করার জন্যই রেলিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাধারণভাবে ছেলেদের এ পাশে আসা নিষেধ। তবে অনেকেই তা মানে না। কেউ রসিকতা করে রেলিংটার নাম দিয়েছে কাঠগরাদ। ছাত্রী আর প্রফেসাররা আসামী। বিচারক নাকি যিশুখৃস্ট স্বয়ং।

ইন্টারমিডিয়েটে যাদের স্পেশাল বেঙ্গলি আছে এবং বি-এ তে বাংলায় যাদের অনার্স বা পাস—মাত্র সেই ক'জনই অনার্স

লাইব্রেরি থেকে সপ্তাহে একবার বই নিতে পারে। বই দেন তারকবাবু, বাংলার অধ্যাপক। জয়তীর অনার্স ইতিহাসে। তাই এই নামের সার্থকতা সে বোঝে না।

ক্লাসের বাইরে অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলা বা আলোচনার সুবিধের জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা জয়তীর জানা নেই। কিন্তু গত দু-বছরে এই ঘরটা ছাত্র ফেডারেশনের আপিসে পরিণত হয়েছে।

এ কৃতিত্ব প্রকাশদার। তিনিই প্রথম বড় টেবিলটা অধিকার করে এক পাল ছেলে মেয়ে নিয়ে বসতে শুরু করলেন। কখনো আড্ডা মারতে, কখনো বা মিটিং করতে। আস্তে আস্তে এই টেবিলে বসেই পোস্টার লেখা আর 'পূর্বাভাষ' সম্পাদনা শুরু হল।

কমনরুম থেকে বেরোবার সময় অধ্যাপকরা তাকিয়ে দেখতেন। আর গুরুত্ব বুঝে তারা উঠে দাঁড়াতো কি দাঁড়াতো না। কোন ছেলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে অধ্যাপককে সব সময় ছোট টেবিলটা ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু একাধিক অধ্যাপক যদি একই সময়ে কথা বলতেন বা পড়া দেখিয়ে দিতেন—তখন প্রকাশদা বড় টেবিল ছেড়ে সকলকে নিয়ে বাইরে চলে আসতেন। দু-দিন পর অধ্যাপকরাই হেসে বললেন, থাক থাক। তোমরা মিটিং কর। আমি দাঁড়িয়েই বলছি, দু-মিনিটের তো ব্যাপার।

কথাটা প্রিন্সিপ্যালের কানে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ থার্ড ইয়ারের গোড়ার দিকে কলেজে চিপ্ ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে স্ট্রাইক হয়, তার জন্য তিনি প্রকাশদা, জয়তী এবং আরও প্রায় দশজনকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেবার

চিঠি দিয়েছিলেন। প্রকাশদা অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যাল ডক্টব টেলার। জাতিতে স্কচ, পেশায় ভূতপূর্ব আই-সি-এস্। প্রথমে কথাই বলবেন না। কারণ চিঠি তিনি ছাত্রদের দেন নি, দিয়েছেন অভিভাবককে। পরে আলাদা আলাদা এসে যার যার বক্তব্য বলার আদেশ দিলেন। তিনি কলেজে একটা গ্রুপ বা তাদের মুখপাত্র হিসেবে কাউকে স্বীকার করতে রাজি নন। কিন্তু সকলের হয়ে প্রকাশদাও কথা বলবেনই। অত্যন্ত বিনয়ে তিনি অধ্যক্ষকে তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুবাগ জানালেন। ভারতবর্ষে গুরু-শিষ্যেব সম্পর্কের যে ছবি পুরাণে আছে তাব উল্লেখ করে টেলার সাহেবকে স্কটিশের সমস্ত ছাত্রেব পিতৃতুল্য জ্ঞানে চিপ, ক্যান্টিন এবং অন্যান্য দাবির প্রসঙ্গ তুললেন। সব শেষে আঙ্গুলের কড় গুণে এক দুই করে বললেন এই চিঠি প্রত্যাহার না কবলে তিনি কলেজ কম্পাউণ্ডে অনশন করবেন, ছাত্ররা ধর্মঘটের আশ্রয় নেবে, সারা কলকাতায় সেই ধর্মঘট ছড়াবে, অ্যাসেম্বলিতে কথা উঠবে এবং একদল ছাত্র স্কটিশ চার্চ মিশনের অফিসে গিয়ে ডক্টর টেলারের পদচ্যুতির দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।

সেদিনটা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রকাশদা কিছু দক্ষ ইংবিজি বলিয়ে নন। আর তাঁর কথায় ব্যাকরণের দু-চারটে ভুল জয়তীর কানেও বেজেছিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখছিল কেমন মৃদু হাসি, কুণ্ঠিত বিনয় এবং অবনত মাথায় প্রকাশদা কলেজের এই জাঁদরেল ডিক্টেটরটিকে অনায়াসে অনর্গল ভাষায় ভয় দেখাচ্ছেন।

ডক্টর টেলার কয়েক মুহূর্ত মুখ নীচু করে বসে মৃদু হেসে

প্রকাশদার পিঠ চাপড়েছিলেন। বলেছিলেন ওঁর মত য়্যাকম্‌প্লিস্‌ড্‌, স্পিরিটেড্‌ আর এফিসিয়েণ্ট স্পিকার তিনি এদেশে দেখেন নি। আর জবাবে প্রকাশদা মৃদু হেসে ঘাড় নামিয়ে বলেছিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

সেই থেকে প্রিন্সিপ্যাল তাদের ঘাঁটান না। সেই থেকে আস্তে আস্তে স্কটিশের বহু কনভেনশ্যন ভেঙে, গড়ে, কলেজের বুকে দাঁড়িয়ে তারা একটার পর একটা ধাপ এগিয়েছে। ক্যান্টিন হয়েছে, ছোট একটা কমনরুমও। ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে হলে স্টেজ পেতে ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে অভিনয় করেছে। তাছাড়া অনার্স লাইব্রেরিটা দখলে পাওয়া এবং কলেজে বসে পোস্টার লেখা সত্যিই আগে কল্পনা করা যেত না।

ক্লাস শেষ হয়েছে। হল পেরিয়ে, কাঠগরাদ পাশে রেখে, অনার্স লাইব্রেরি দিয়ে দলে দলে মেয়ে বেরুচ্ছে। প্রকাশদা কারোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, কাউকে বা একটা দুটো কথা বললেন, কাউকে ডেকে পাশে বসালেন। ওদিকের প্যাসেজেও এখন নিশ্চয়ই কেউ দাঁড়িয়ে আছে। দলে দলে ছেলে বেরোচ্ছে। যাকে যাকে দরকার, বলে দিচ্ছে মিটিংয়ে যেতে।

মিনিট কয়েকের ভেতর ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। কমনরুম থেকে একে একে অধ্যাপকরাও বেরোতে শুরু করলেন। কারোর হাতে ফোলিও ব্যাগ, কারোর হাতে বই। কয়েকজনের হাতে কিছুই নেই। বার কয়েক সকলকে উঠে দাঁড়াতে হল। বার কয়েক সকলকে উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করতে হল। বার কয়েক কয়েকজনকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে হল। যেন সেই সময় সেই অধ্যাপকটির যাওয়া

কারোর নজরেই পড়ে নি। বার কয়েক মৃদু হাসি আর নমস্কার বিনিময় হল কয়েকজনের সঙ্গে। রবি দাস যথারীতি শাসন করে প্রকাশদাকে বলে গেলেন, সারাজীবন পলিটিক্স করতে পারবে, কিন্তু ছাত্র-জীবন আব ফিবে আসবে না। কাল তোমায় ক্লাসে দেখতে চাই।

ও পাশের টেবিলে বসে থার্ড ইয়ারের একটি মাদ্রাজী ছেলে আর সাধনার বোন সাহানা কি একটা খাতা মাঝখানে রেখে দ্রুত নোট টুকছে। দু বোনের এইখানেই জিত। পড়াশুনোটা ঠিক করে যায়। অথচ সে? প্রকাশদা?

অন্যমনস্কের মত চিন্তা করছিল। কথাটা সত্যি। ছাত্রজীবন আর ফিরে আসবে না, আসে না। গত বছর অসুস্থ হয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এবার পরীক্ষা দিলেও ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট কিছু হবে না। অথচ প্রকাশদার মাথা ছিল। প্রতিটি অধ্যাপক ওঁর জন্য আপসোস করেন। নিজের কেরিয়ার নষ্ট করে প্রকাশদা এই যে কলেজে একটা ক্যান্টিন আর কমনরুম প্রতিষ্ঠা বা কিছু ছাত্রের মাইনে মকুব, ফি যোগাড়ের সাফল্যে বুঁদ হয়ে আছেন—এতে সত্যিই মহত্ব আছে না কি মহত্ববোধের রোমাঞ্চ?

কি ভাবছো?

কিছু না তো। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়তী হাসল, কাজ সেরে নিন, বাইরে যাবো। মায়াদি, এই শোন না, তোমার সঙ্গেও দরকার আছে।

আমার তো এখুনি টিউশনি রে। মায়াদি দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁটটা চেপে হাসল, সারাদিন ছিলি কোথায়?

আজ না হয় না গেলে।

নারে। মাইনে পাব কিনা।

ও হ্যাঁ। গলা নামিয়ে মায়াদির কানে কানে বলল, আমিও আজ পেয়েছি।

সত্যি ? খুশিতে জয়তীর হাত চেপে বলল, কবে খাওয়াচ্ছিস ?

আজ।

থমকে গিয়ে ম্লান হেসে জবাব দিল, নারে, আজ আমায় এখুনি যেতে হবে।

তবে যাও। রাগ করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি। একদিন—

নারে, উপায় নেই। মায়াদি আবার হেসে উঠেছে, কাল কিন্তু। ভুলিস না যেন।

বয়ে গেছে। প্রকাশদা আর আমি আজই—

খবরদার। মেরে ফেলব কিন্তু। হাসতে হাসতে মায়াদি পিঠে একটা কিল মারল।

জয়তী জানে মায়াদির মত বদলাবে না। প্রকাশদার সঙ্গে মায়াদির তফাৎ এইখানে। প্রকাশদা প্রত্যেকের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারেন—ছেলে,মেয়ে, অধ্যাপক, দারোয়ান। শুধু মিশতে পারেন না, মানিয়ে নিতেও জানেন। প্রকাশদা যেন জল, যে কোন পাত্রেই ভরা যায়। কিন্তু তাতে ওঁর স্বভাব বা চরিত্রের বদল হয় না। জয়তী জানে যত কাজই থাকুক, যত বড় কাজ, প্রথম মাইনে পেয়েছে—সুযোগ করে প্রকাশদা আজ তার সঙ্গে আড্ডা মারতে যেতেনই। দরকার আছে শুনলে

তো কথাই নেই। কিন্তু মায়াদি যেন একতাল মাটি। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশতে পারে না। আর সম্পর্কের বিভিন্নতাকে আচরণের তারতম্যে কঠোরভাবে মেনেও চলে। একই আড্ডায় বসে কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো গম্ভীর। কারোর ঠাট্টা বা অনুরোধ মায়াদির উচ্ছ্বাস কি গাম্ভীর্যকে ভাঙতে পারে না। কতগুলো নীতিকে সতর্কভাবে মেনে চলে। অবস্থা বুঝে বা অন্যেব মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে প্রকাশদার মত সে ব্যাপারে কিছুতেই আপোষ করবে না। তাই টিউশনিতে ও আজ যাবেই। যদিও জয়তী জানে, সে প্রথম মাইনে পেয়েছে—এ খববে মায়াদি অত্যন্ত খুশি। যদিও জয়তীর জানা আছে, আজ বেস্তোরাঁ বা সিনেমায় যেতে মায়াদির ভালো লাগত। তবু নিজের ভালো-লাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিয়মভঙ্গ ও করবে না।

মায়াদি জয়তীদের এক বছরের সিনিয়ার। ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করে তার সহপাঠিনী হয়েছে। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আলাপ বহু-দিনের। কিন্তু আজও মায়াদির চরিত্রটি ঠিক মত বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথম প্রথম ভাবত ফেল করার গ্লানি। পরে দেখেছে তা নয়। বছর খানেক আগে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, প্রেমে পড়েছো নাকি? উত্তরে মায়াদি ফিক্ করে হেসে বলেছিল, হ্যাঁ।

কার? জয়তী তখন আবিষ্কারের আনন্দে যেন ফেটে পড়বে। একটি চরিত্রের রহস্য স্পষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠে মায়াদি বলেছিল, তোর।

আর জয়তী রেগেছিল। আর জয়তী বুঝেছিল প্রেমে পড়ে হঠাৎ খুশি হঠাৎ গম্ভীর হওয়ার মত সাধারণ মায়াদি নয়।

তবে কি পারিবারিক ব্যাপার? কিন্তু সে খবরও জয়তীর জানা। বাবা-মা নেই। দাদাদের কাছে মানুষ। বড়দা থাকেন টালিগঞ্জে, সেজদা হ্যারিসন রোডে। মেজদার সঙ্গে পরিবারের কোন সম্পর্ক নেই। মায়াদি হ্যারিসন রোডেই থাকে। জয়তী গিয়েছে। মায়াদির সেজবৌদি ফুটফুটে আর ছেলেমানুষ। ননদের সঙ্গে সখিত্বের সম্পর্ক। বড়বৌদির অসুখ-বিসুখ হলে মায়াদিকে গিয়ে টালিগঞ্জে থাকতে হয়। সেই দিন ক'টা খারাপ যায়। কারণ বড়দা রাশভারী, বৌদি পড়া ফেলে ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়ানোয় মায়াদির ওপর বিরক্ত। পরের ভাই খোকন পলিটেকনিকে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ও-ও সেজদার কাছে থাকে।

মোটামুটি পারিবারিক জীবনে মায়াদির অস্বস্তি আছে কিন্তু অশান্তি নেই। অস্বস্তি, কারণ মায়াদি চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কারণ খোকন পাশ না করা পর্যন্ত নাকি ওর দুর্ভাবনা ঘুচবে না। অথচ খোকনের দায়িত্ব নিতে কেউ মায়াদিকে সাধে নি। এমন কি খোকনও না। মা বেঁচে থাকলে তিনিও কি জয়তীর মার মত খোকনের জন্য, মায়াদির জন্য অসহায় দুর্ভাবনায় চোখের জল ফেলতেন? মায়াদি তাতে খুশি হত, না বিরক্ত? উত্তর খুঁজে না পেয়ে কেমন এক অস্বস্তিতে যেন মাথা ধরে উঠল।

বসে বসে গ্যাঁজাবেন, না কাজের কথা বলবেন?

মায়াদির ধমক শুনে জয়তী প্রকাশদার দিকে তাকাল। মুচকি

হেসে বললেন, দেরি করিয়ে দিচ্ছি। মিটিং শেষ হলেই তো চলে যাবেন।

বই-খাতা গুছিয়ে মায়াদি উঠে দাঁড়াল, আমি তবে চললাম। আপনাদের অফুরন্ত সময়।

বাধা দিয়ে প্রকাশদা বললেন, ধূর্জটিপ্রসাদের নায়ক হলে অবিশ্যি আপনার এই সময়-প্রসঙ্গে কিছু বাণী দিতে পারতাম। কিন্তু তার আর দবকার হবে না।

রঞ্জিত ঢুকল। প্রকাশদা বললেন, আচ্ছা ইডিয়ট হচ্ছিস তো দিন দিন ?

থাম্। সখ করে দেরি করেছি কিনা। ক্যান্টিনে—

দেখ রঞ্জিত, বাজে বকো না। মায়াদি গম্ভীর হয়ে বলল, দেবি করে এসে আবার—

রঞ্জিত হাসল, চটে গেছো ?

আচ্ছা বন্ধুগণ। আমরা মিটিং শুরু করছি। আমি প্রস্তাব করছি আজকের এই সভায় জয়তী মুখার্জী প্রিসাইড্ করুন।

মায়াদি বলল, সমর্থন করছি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রকাশদার দিকে তাকাল। কার্যকরী সমিতির এই সভা কেন ডাকা হয়েছে তাই জানে না। আর প্রকাশদা কি এইভাবে তার কর্তব্যবোধকে নাড়া দিতে চাইছেন ?

ততক্ষণে প্রকাশদা শুরু করেছেন, সাথী সভাপতির অনুমতি নিয়ে কয়েকটা কথা বলছি। আপনারা জানেন ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্বীকৃতির দাবিতে সেই কলেজের ছাত্ররা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের ঠিক

সামনে কাল থেকে অনশন ধর্মঘট করছেন। তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ছাত্র সাধারণ বা শিক্ষাবিদ্‌দের কোন সংশয় নেই। বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিনও বেতার বক্তৃতায় আমাদের প্রিয় নেতা পণ্ডিত নেহেরু আপসোস করে বলেছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য দেশে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার চাই। বিদেশী কারিগর আনার খেসারত দিতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই আক্ষেপের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর কাজ বা নীতির মিল কোথায় ?

ছোট্ট একটা সভা। যে ক'জন উপস্থিত, তাদের কাউকেই এ ভাবে বোঝানোর প্রয়োজন ছিল না। তবু প্রকাশদা বক্তৃতা দিচ্ছেন। পরে ঠাট্টা করলে জবাবে হেসে বলবেন, বিজয়ীদি, জানা কথাকেই ঠিক মুহূর্তে হ্যামার না করলে উদ্দীপনা আসবে কেন ? আর তোমাদের উদ্দীপনাই তো ভরসা।

আমরা চাই দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সফল হোক। আমরা চাই নিজের হাতে দেশকে গড়তে। কিন্তু গত কয়েক বছরে ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কয়েকশো ছাত্র পাশ করেও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু তাদের কলেজ রেকগ্‌-নাইজড্‌ নয়, সেহেতু তাদের শিক্ষার কোন মূল্য নেই। যখন দেশে অজস্র টেকনিকাল কলেজ চালু করার কথা, তখন শুধু মাত্র সরকারী অনুমোদনের অভাবে এত বছরের কলেজটা উঠতে বসেছে। যখন বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালতে হচ্ছে, তখন আমার দেশের পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারেরা না

খেতে পেয়ে কেরানীগিরি খুঁজছে। বন্ধুগণ, তাই ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের এই অনশন ধর্মঘটকে আমরা দেশের জন্য, ছাত্রসমাজের বৃহত্তর ঐক্য এবং মঙ্গলের জন্য প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে সমর্থন করতে বাধ্য।

থার্ড ইয়ারের নমিতা বলল, কাগজে দেখছিলাম দু-তিনজনের অবস্থা নাকি—

হ্যাঁ। প্রকাশদা মুচকি হেসে বললেন, অবিশ্যি আমাদের জাতীয়তাবাদী কাগজে কতটুকু খবরই বা বেরোয়? সুযোগ পেয়েই প্রকাশদা একটু খোঁচা দিলেন। যাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তাদের কানে এ কথা পৌঁছবে না, তা জানেন। পৌঁছলেও কোন গুরুত্ব পেত না, তাও জানেন। তবু সুযোগ পেলেই প্রকাশদা খোঁচান। সুযোগ করে নিয়ে খোঁচান। এত নরম মন প্রকাশদার, এতো ভালবাসেন। অথচ কতো ঘৃণা, জ্বালা।

কিন্তু যা বলছিলাম। কলকাতার সমস্ত কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক এবং বাংলা দেশের প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি এক সভায় আজ স্থির করেছেন আগামীকাল ব্যাপক ছাত্র-ধর্মঘট হবে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ল'নে বেলা বারোটায় এক কেন্দ্রীয় সভায় ধর্মঘটীদের সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হবে। তারপর সেই প্রস্তাবের কপিসহ ছাত্রদের এক বিক্ষোভ মিছিল যাবে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করতে—

বাধা দিয়ে গৌতম বলল, কিন্তু আজ সারাদিন তো কোন প্রচারই হল না।

হ্যাঁ! কারণ এ প্রস্তাব আমরা পেয়েছি মাত্র এক ঘণ্টা

আগে। প্রকাশদা তার দিকে মুখ করে বললেন, অবিশ্যি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের দাবি জনপ্রিয় করার জন্য ক'দিন ধরেই পোস্টার মারা হয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি স্ট্রাইক সাকসেসফুল হবে না। রঞ্জিত বলল, যেহেতু আমাদের কলেজ ইউনিয়নের এ ব্যাপারে কোন ইনিশিয়েটিভ নেই এবং কালও সেক্রেটারি স্ট্রাইক নোটিস দেবেন কিনা জানি না, সেহেতু বন্ধুগণ, এখনই এ ডিসিশন নেওয়া আমাদের ঠিক হবে না।

জয়তী সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, প্রকাশ-বাবুর বক্তব্য শোনার পর মনে হয় না আমরা নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কারণ অল ইউনিয়ন্‌স্ এবং অল অর্গানিজেশন্‌স্ কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, লোয়ার ইউনিট হিসেবে আমরা তা মানতে বাধ্য। বলল আর অবাক হয়ে ভাবল, প্রকাশদা ঠিক যে ভাষায় উত্তর দিতেন, শিখিয়ে না দিলেও জয়তী নিজে থেকে তা-ই উচ্চারণ করল। কালই স্ট্রাইক হওয়া উচিত কিনা, সম্ভব কিনা, জয়তী তা মিটিংয়ে ঢোকার আগে চিন্তা করে নি। সমস্ত সমস্যাটা এখনও তার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তবু সে যে ধর্মঘটের প্রস্তাব সমর্থন করল এর পেছনে প্রকাশদার ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তি, না তার শুভকামনা এবং বিচারবোধ—কি কাজ করেছে ?

রঞ্জিত বাধা দিয়ে বলল, বন্ধু প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন কোন কেন্দ্রীয় প্রস্তাব কার্যকরী করার আগে স্থানীয় ইউনিট নিজের বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখে।

নিশ্চয়ই। প্রকাশদা আরম্ভ করেই একবার জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রেসিডেণ্টের অনুমতি নিয়ে বলছি, এই অব্জেক্টিভ কণ্ডিশন বিশ্লেষণেই রঞ্জিতবাবুর ভুল হচ্ছে। সায়েন্স ক্লাসে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী নেই। তবু মাত্র দু-ভোটে আমরা কলেজ ইউনিয়নে মেজরিটি পাই নি। কিন্তু তা হলেও আপনারা জানেন, ইউনিয়ন প্র্যাক্টিকেলি আমাদের গাইডেন্সেই চলে। সুতরাং আশা করছি কালও সেক্রেটারির সমর্থন পাব। তা ছাড়া ইউনিয়ন বিরোধিতা করলেই কি আমাদের পেছিয়ে পড়তে হবে? বন্ধুগণ, আপনাদের কি মনে নেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই কলেজে ক্যান্টিন, কমনরুম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে এস, এফ! তখনও ইউনিয়নের কোন ইনশিয়েটিভ ছিল না। তাছাড়া ইউনিয়ন প্রতিটি ছাত্রের। তাদের প্রেসার থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেক্রেটারি বাধ্য হবেন স্ট্রাইক কল করতে। আমাদের কাজ সেই প্রেসার সৃষ্টি করা। একটু থেমে হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত কাল সমস্ত কাগজে বেরোচ্ছে। তাছাড়া আমরা পিকেটিং করব। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ জাতীয় একটা কেন্দ্রীয় আন্দোলনে সাধারণ ছাত্ররা অবুঝ হবে, স্কটিশের সে দিন আর নেই।

শেষ কথাটা কানে বাজল। সে দিন আর নেই। এ প্রসঙ্গে প্রকাশদার মুখ চকচক করে ওঠে। দীর্ঘ চার বছরে একটা কলেজের চেতনাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতার স্তরে আনতে পারার যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, তাতে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন।

অস্বীকার করার উপায় নেই সে বিচারে তিনি সার্থক। কিন্তু নিজের ছাত্র-জীবনকে বলি দিয়ে এই যে ছাত্র-আন্দোলন, এ কি আন্দোলনের চারিত্রিক ত্রুটি, না প্রকাশদার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের অক্ষমতা? সত্যিকারের ছাত্র না হয়ে ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে, এর পরিণতি কি?

…সুতরাং এই আমার অনুরোধ। মায়াদি কথা শেষ করল। কিছু বলছিল, জয়তী দেখেছে। কিন্তু কি, কান পেতে শোনে নি। ফিরে বলার অনুরোধও করা যায় না। অত্যন্ত বিব্রত হয়ে যেন অভ্যাসবশেই প্রকাশদার দিকে তাকাল। প্রকাশদা মুচকি হেসে বললেন, সে তো বটেই।

হাসলেন কেন? বুঝতে পেরেছেন কি? মরুক গে, আবার অন্যমনস্ক হচ্ছে। প্রকাশদা বলছেন, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ারের কাউকে খবর দেওয়া যায় নি। আগের পিরিয়ডে ছুটি হওয়ায় গৌতম আর পৃথ্বীশ ছাড়া সকলেই চলে গেছেন। রাত্রি বেলাই কয়েকজনের বাড়ি গিয়ে ইন্টিমেট করতে হবে।

তা হলে জব ডিভিশন হয়ে যাক। রঞ্জিত বলল।

আর জয়তীর হাসি পেল। মিটিংয়ে বসলেই এরা সাধারণ কথাতেও গুরুত্ব আনার জন্য বিশেষ কতগুলো শব্দ ব্যবহার করবে। অবজেকটিভ কণ্ডিশন, সাবজেকটিভ য়্যানালিসিস এবং জব ডিভিশান ইত্যাদি। একদিন তিন ঘণ্টার একটা মিটিংয়ে বসে মায়াদি লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সব শব্দের একটা লিস্ট তৈরি করেছিল মুদ্রাদোষের মত প্রকাশদা আর রঞ্জিত যা বহুবার নিজেদের বক্তব্যে ব্যবহার করেছে।

হ্যাঁ। প্রকাশদা খাতা আর কাগজ টেনে নিলেন। কাজ মোটা-মুটি তিনটে। প্রথমতঃ, পোস্টারিং। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বাভাষের একটা জরুরি সংখ্যা পরশু বার করা। তৃতীয়তঃ, কাল ন'টায় এসে কর্ডনিং। তা ছাড়া, আই এম সরি—মায়াদির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, কয়েকজন ইম্পরটেণ্ট কর্মীকে রাত্তিরেই গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করল অনেকের মনে সংশয় ছিল, ভয় ছিল। কিন্তু প্রকাশদা এমনভাবে কথা বললেন যে শেষ অবধি সকলেই ভাবল এ সবই তাদের মনের কথা। তারাই প্রকাশদাকে দিয়ে বলিয়েছে। সিদ্ধান্ত হল। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

কে কি দায়িত্ব নেবে লেখা হয়ে গেল। কার বাড়িতে কে যাবে, তাও ঠিক হল। পূরবীকে খবর দেওয়ার ভার জয়তীর। তা ছাড়া কাল ন'টায় পৌঁছতে হবে। ন'টায়? কি করে আসবে? বনদি কি ছাড়বেন? কিছু একটা বলে ছুটি করিয়ে নিতেই হবে।

জয়তী চিন্তা করল। কিন্তু মনে কোন উত্তেজনা নেই, উদ্দীপনা নেই। চেষ্টা করেও আনতে পারছে না। অবাক হয়ে সে নিজেকে দেখল, নিজের অতীতকে দেখল, চারপাশের মুখগুলোকে দেখল। তার ভয় করল।

ভয় করল আর নিজেকে প্রশ্ন করল, আমার কি হল? আমার অনুভূতির তারগুলো কিছুতেই বাজে না কেন? সব কিছুকেই এমন তুচ্ছ আর মামুলি মনে হয় কেন? খুব একটা জ্যান্ত মানুষের মত আমি টান হয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কোন প্রত্যয়ের কথা বলতে পারি না কেন? নানা সংশয় আর দ্বন্দ্বে সব কিছুকে চিরে

চিরে বিশ্লেষণ করার এই নিরন্তর প্রয়াস কেন? আমার কি হল? আমি কি মরে যাচ্ছি? পালাতে চাইছি?

ভয় করল আর কান্না পেল।

অসীম শূন্যতার মধ্যে একটা অগ্নিপিণ্ডকে আবর্তন করছে একটি গ্রহ, সেই গ্রহে একটা দেশ, সেই দেশে একটা সহর, সেই সহরে একটা কলেজ। সেই কলেজের রেকগ্‌নিশন না পাওয়ার সমস্যা—এই মুহূর্তে জয়তীর কাছে কত অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। অস্তিত্বটাই যার কাছে সমস্যা, জীবন-মৃত্যু-বিশ্ব-প্রকৃতি জড়িয়ে যার সহস্র ভাবনা আর সীমাহীন যন্ত্রণা—তার কাছে এই সভা, এই কথা কাটাকাটি, এই পরিকল্পনা, এই গভীর দায়িত্ববোধ এবং উৎকণ্ঠা কতো ছেলেমানুষি!

অথচ অস্বীকার করতে, অশ্রদ্ধা করতেও তো পারে না। এই দায়িত্ববোধ, উৎকণ্ঠা আর মমতা তো ধার করা নয়, জোর করে জন্মানো নয়। কলেজের এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে এই যে ক'জন এখানে এসে বসেছে, আড্ডা ফেলে, লাইব্রেরিতে পড়া ফেলে, টিউশনি ফেলে, পেটে খিদে নিয়ে এখানে এসে বসেছে, ভাবছে, প্রস্তুত হচ্ছে—এর মহত্বকে অস্বীকার করলে জয়তীর পায়ের তলায় মাটি থাকবে কি করে?

হঠাৎ মনে পড়ল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কাপড়ের ছাউনীর তলায় এই কুৎসিত গরমে কয়েকটি ছেলে না খেয়ে শুয়ে আছে। তাদের মাথার চুল শুকনো, চোখের পাতা ভারী, স্নায়ু অবশ। দাবি আদায় না হলে তারা মরবে। ইচ্ছে করলেই যারা কিছু খেতে পারতো, না খেয়ে তারা মরে যাবে। আর সেই কয়েকটি

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশদার এক চোখে ঘৃণা, অন্য চোখে ভালোবাসা।

শুধু স্কটিশ চার্চ কলেজের কয়েকটা সমস্যা দূর করার জন্যই নয়, এখানে ওখানে সেখানে সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে, জীবন ও তার বিকাশের জন্য প্রকাশদা তাঁর এক চোখে ঘৃণা এবং অন্য চোখে ভালবাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। থাকবেন।

তাই প্রকাশদার মনু সাহেবের জন্য ভাবনা, জয়ন্তীকে ভালবাসা, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য উৎকণ্ঠা, আলজিরিয়া নিয়ে উদ্বেগ। আর জয়ন্তীর শুধু আপন বিশ্ব, নিজের পৃথিবী।

ভয় করল, রাগ হল আর কান্না পেল। মনে মনে নিজেকে চাবকে চুপ করে চেয়ারে বসে রইল।

সভা শেষ হয়েছে। যাদের তাড়া ছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মায়াদিও যাবে! বলল, সারাদিন তো গ্যাঁজালেন। এবার কিছু খেয়ে আসুন। খালি পেট ছাড়া বুঝি বিপ্লব হয় না?

তাহলে প্রকাশদা আজও না খেয়ে এসেছেন। কাজ থাকে সত্যি, কিন্তু এ কি ধরণের রোমান্টিসিজম্? অনেক আগে একদিন প্রশ্ন করেছিল, বাড়িতে মা বাবা কিছু বলেন না? প্রকাশদা মুখ টিপে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, না বলে পারেন না, তাই। তবে তাঁরাও জানেন বলে লাভ নেই। আমারও শুনতে খারাপ লাগে না। এই আর কি!

খুব বাহাদুর তো?

আলবৎ। জানো বিজয়ীদি, কয়েক বছর আগে যখন অনিয়ম শুরু হল, মানে ফিরতে রাত হয় আর স্নান খাওয়ার কোন রুটিন

নেই—তখন মা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় খেলি, রাত হল কেন—হেন, তেন। কি জবাব দেব? ভালো মানুষের মত মুখ টিপে টিপে শুধু উচ্চাঙ্গের হাসি বিলোতাম। একদিন ফস্ করে বলে ফেললাম, মা, তোমার কি ভয় হচ্ছে, মানে তুমি কি আমায়—ইস্, মার মুখটা এমন হয়ে গেল। সত্যি, আমার জন্য ওঁদের অনেক কষ্ট।

জয়তী ভাবছিল তাকে সামনে রেখে প্রকাশদা বোধহয় নিজের মার সঙ্গেই কথা বলছেন। প্রকাশদার মাও কি তার মার মত কাঁদেন? আহ্, মায়েদের চোখের জল কি কোনদিন, কোনদিন শুকোবে না? হঠাৎ নিজের ওপর বিরক্তি এসেছিল। প্রকাশদার ওপরও। গলায় বিরক্তি মিশিয়েই বলেছিল, বোঝেন তাহলে?

বুঝি ভাই। কিন্তু উপায় নেই। তাছাড়া আমার স্বভাবটাও এমন বিদঘুটে। মানে ঠিক গৃহস্থ টাইপ নয় আর কি।

জয়তী জানে আজও ধমক দিলে, প্রশ্ন করলে প্রকাশদা মোটা-মুটি একই জবাব দেবেন। আর সে ঠিক বোঝে না নিজের এই বাউণ্ডুলেপনার জন্য প্রকাশদা লজ্জিত না গর্বিত। হয়তো বা দুইই। হয়তো কিছুই না।

রঞ্জিত বলল, যারে, কিছু খেয়ে নে। সন্ধ্যেয় বসন্তে আসছি।

দোহাই। প্রকাশদা হাত জোড় করে বললেন, তুই বাণী দিসনে। সারাদিন এত কষ্ট করে না খেয়ে থাকি, তা কি আর তোর শুকনো গলার তর্জন শোনার জন্যে?

মায়াদি চোখে মুখে একটা তীব্র বিরক্তি আর শাসন ফুটিয়ে বললে, চল রঞ্জিত। তোমার সঙ্গে যেতে যেতে কথাটা সেরে নি।

এই সেরেছে। প্রকাশ, মায়াকে চটিয়ে দিলি তো?

তোর মাথা। প্রকাশদা বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলেন, হে ভারত, ভুলিও না তোমার শাশ্বত নারীর আদর্শ ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা। মায়া ভারতীয় নারী, অতএব সর্বংসহা। আধুনিক যুগের ভদ্রমহিলা, সুতরাং ফিফটি পার্সেন্ট লেস্। তাহলেও যথেষ্ট। কি বলেন স্যার?

আচ্ছা, কোন মানে হয়? মায়াদি হেসে ফেলেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে গ্যাঁজাগেঁজি করার কোন ইয়ে আছে?

নিশ্চয়ই নেই। সত্যি, বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াবেন?

মায়াদি প্রকাশদার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বলল, আপনার দিদিই তো রয়েছে। তাছাড়া এ কলেজে আপনাকে খাওয়াবার লোকের অভাব?

দূর। জয়তীর খাওয়ানো কি আপনার মত মিষ্টি লাগবে? ডোন্ট মাইণ্ড বিজয়ীদি, পরে এবম্বিধ নানা বাক্যে তোমাকেও খুশি করে দেব। এই, চলুন না।

মায়াদি হতাশ ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। প্রকাশদা বসলেন। রঞ্জিত আর জয়তীকেও বসতে হল। বসেই তার চোখে পড়ল উল্টোদিকের দেওয়ালে কার যেন একটা ছবি। তলায় কি সব লেখা। আগেও দেখেছে, বোধহয় কোন মৃত এক্স-স্টুডেন্টের ছবি। কিন্তু কার, দু-পা এগিয়ে তা দেখার আগ্রহ হয় নি। আশ্চর্য! হলেও এমনি কয়েকটি পূর্বতন প্রিন্সিপ্যালের ছবি আছে। তাঁদেরও চেনে না। অথচ সিরিয়ায় কি হচ্ছে, সে খবর জয়তীর বিলক্ষণ জানা।

নীরেনবাবু আড়চোখে তাকিয়ে গটগট করে চলে গেলেন।

মিটিংয়ের ভেতরও একবার ঘুরে গেছেন। প্যাণ্টের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে ভদ্রলোক মাথা নীচু করে হাঁটেন আর তেরছা ভাবে তাকান। অফিসের সামান্য ক্লার্ক অথচ কলেজে দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সকলেই জানে প্রিন্সিপ্যালের স্পাই। অথচ অন্ততঃ দু-বার প্রকাশদাকে ডক্টর টেলারের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাছাড়া পরীক্ষার আগে পার্সেণ্টেজ সিন্ধু পেরোবার একমাত্র কাণ্ডারী তিনিই। আশ্চর্য ভদ্রলোক। কর্তৃপক্ষ আর ছাত্র—সকলের কাছেই অপরিহার্য। অথচ প্রত্যেকেই তাঁকে অবজ্ঞা করে।

আচ্ছা, নিজে তো অকর্মার ধাড়ি। মায়াদির কথা কানে এল। কাকে বলছে? আমরাও অপদার্থ না হলে বুঝি আপনার শান্তি নেই? ও, প্রকাশদাকে। সকলে আপনার মত—

বালাই ষাট। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে দিন দিন আপনাদের শ্রী বৃদ্ধি হোক। মা বসুমতীর মত আপনাদের ঐশ্বর্য বাড়ুক। প্রকাশদা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, আপনি, বিজয়াদি, এমন কি রঞ্জিত পর্যন্ত যে রেটে কাজের মানুষ হচ্ছেন! শুধু হতভাগ্য আমিই, অবিশ্যি সবই তো ভগবানের, ইত্যাদি।

কথা নিয়ে খেলা করার স্বভাব প্রকাশদার আর যাবে না। জয়তীর হাসি পেল। বলল, ওঠো বাপু। আমার তো অন্য কাজও আছে।

রাখ্ রাখ্। খুব আজকাল কাজের মানুষ হয়েছিস যে রে, এ্যাঁ?

বেশ করবে হবে, একশোবার হবে। কি বল বিজয়াদি? দেখো,

তোমার জন্য গরিব প্রকাশের সচীৎকার ওকালতি যেন বৃথা না যায়।

এই, শুনুন। আজকে মাইনে পেতাম। কাল খোকনের হাতে কিছু টাকা না দিলেই নয়।

প্রকাশদা এক মুহূর্ত মায়াদির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, যান।

মায়াদি উঠে দাঁড়াল, চল রঞ্জিত।

বা রে। জয়তী খাওয়াচ্ছেন। আমি বুঝি—

রেগে জয়তী জবাব দিল, বয়ে গেছে। তুমি যাও।

মায়াদি খিল খিল করে হেসে উঠে জয়তীর বিনুনি ধরে টান দিল। তারপর বলল, শোন্, কাল তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু। রঞ্জিত, চল।

মায়াদি যাবেই জানত। বইপত্র তুলে বলল, চলুন, যাওয়া যাক। লক্ষ্য করল প্রকাশদা অন্যমনস্কের মত কি দেখছেন আর মুখ টিপে টিপে হাসছেন। ঘরের উত্তর পূর্ব কোণে ছোট টেবিলটার পেছনে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটার রং সাদা। ওপরে কাঠের ফ্রেমে ঘরের তিনদিকে লম্বা করে বইয়ের তাক। কি বই তা জয়তী জানে না, কাউকে ব্যবহার করতেও দেখে নি। শুধু মাঝে মাঝে প্রফেসর্স কমনরুমের বেয়ারা রাজেনদা ঝাড়ন হাতে ওপরে ধুলো ঝাড়ছে, লক্ষ্য করেছে। একটা ধবধবে সাদা বেড়াল আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আশ্চর্য! এতদিন এ কলেজে আছে। কখনো বেড়াল দেখে নি। বেড়ালটা ওপরে সংসার পেতেছে কি না কে জানে!

দেখেছো ? প্রকাশদা হেসে বললেন, স্বর্গের সিঁড়ি। কুকুরের জায়গায় বেড়ালও আছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির বেচারার পাত্তা নেই। অন্ততঃ প্রক্সি দিতেও যদি কাউকে পাঠাত।

হঠাৎ সত্যিই যেন হকচকিয়ে গেল। তারপর ধমকে বলল, আমরা আপনার মত প্রতিভাবান নই। দয়া করে হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট ভাষায় বলুন।

বলছি। জয়তীর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, তুমি একটা বুদ্ধু।

আহা ! এত দেরিতে বুঝলেন ?

না স্যার, অনেক আগেই বুঝেছি। কিন্তু এটুকু কি জানো— যা বোঝা হয়, তা বলা যায় না ?

আবার ? হল কি আপনার ?

বড্ড খিদে পেয়েছে কি না, মাথায় কাব্যি পাক দিচ্ছে।

সস্তা রসিকতা। চলুন তো।

প্রকাশদা খুশিতে গুন গুন করে গান গেয়ে বললেন, যাবই, আমি যাব !

আর দরজা ঠেলে বেরোতে বেরোতে জয়তীর আবার মনে হল, বেড়ালটা ওপরে নিশ্চয়ই সংসার পেতেছে। শিগ্‌গিরই ওর গেরস্থালী অনেকগুলো কাচ্চা বাচ্চায় ভরে উঠবে। কিন্তু তারপর ওরা কোথায় যাবে ?

আহ , কোথায় যায় ?

॥ বারো ॥

বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সাঙ্গুভ্যালি রেস্তোরাঁ। ফুটপাতের ওপরই দোকান। উঁচু একটা ঘরকে কাঠের ফ্রেম আর তক্তা দিয়ে দোতলা করা হয়েছে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ছোট ছোট কেবিন, চারজন বসতে পারে। টেব্‌ল্ ফ্যান মাথার ওপর এমন ভাবে ফিট করা যাতে একটা পাখার বাতাস দু-কেবিনে যায়।

বসতেই সেই বাচ্চাটা এল। প্রকাশদার চেনা, জয়তীও কয়েক-বার দেখেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া পর্দাটা টেনে দিতে যাচ্ছিল। প্রকাশদা হেসে বললেন, থাক্।

কি খাবেন বলুন।

মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তিত স্বরে বললেন, তোমার ট্যাঁক তো গরম আজ, না ?

তাই তো বলছি, কি খাবেন ?

বাচ্চার দিকে ফিরে প্রকাশদা বললেন, দুটো পরটা, দু-গ্লাস জল। চা পরে দিবি—একটা ডবল হাফ, একটা কড়া, বুঝলি ?

ঘাড় নেড়ে চলে গেল। চায়ের দোকানের ছেলেমানুষ ওয়েটার-গুলো এত বিচিত্র হয়! এ ছেলেটা একদম কথা বলে না। অথচ জলটুঙির আদিনাথের মুখে তো সব সময় খৈ ফুটছে। কিন্তু কি অর্ডার দিলেন প্রকাশদা! মাত্র একটা পরটা ?

সারাদিন খান নি শুনলাম—

দেখো বিজয়াদি, আমার একটা মহৎ দোষ আছে। কাঁধ থেকে

কাপড়ের ঝোলাটা টেবিলে রেখে আয়েস করে বসলেন, খাওয়াও খাওয়াও বলে লোককে জ্বালাতে ভালবাসি। কিন্তু খেতে মোটেই পারি না।

তা দেখেছি। কিন্তু এ ভাবে আর কতকাল?

দেখা যাক। কিন্তু নিছক উপদেশামৃতের জন্যই কি—

রাগ হল বুঝি? বিজয়ীর ভঙ্গিতে জয়ন্তী হাসল। নিজের হাসি যেন চোখ চেয়ে দেখতে পেল আর দেখে খুশি হল। বলল, বিশ্ব-দুনিয়ার সকলকে তো উঠতে বসতে বাণী দিচ্ছেন। আমরা কিছু বললেই—

ধেৎ বোকারাম। তোমাদের এই শাসনটুকুর লোভেই তো—

থামুন। হেসে ফেলল। এমনি করেই প্রকাশদা সকলের মুখ বন্ধ করে দেন। ততক্ষণে বাচ্চাটা প্লেট এনেছে। চীনে মাটির সাদা প্লেট, ধারে ধারে ফুল কাটা। পরটা, সামান্য তরকারি আর পেঁয়াজ কুচি। বিটের রঙে পেঁয়াজের রঙও লাল। কেমন একটা বাসি গন্ধ থাকে, অথচ খেতে খারাপ লাগে না। গেলাসের জলে হাত ধুলো। ছুরি কাঁটায় জয়ন্তী খেতে পারে না। তাছাড়া রং-চটা এই বস্তুগুলো দেখলে ঘেন্না হয়। প্রকাশদা ইতিমধ্যে ডান হাতে ছুরি আর বাঁ হাতে কাঁটাচামচে ধরে খেতে আরম্ভ করেছেন।

এইবার জয়ন্তী বলবে। সে জানে যত দেরি হবে তত সঙ্কোচ বাড়বে। সঙ্কোচ আর দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। প্রকাশদা জানতে চাইবেন, কি ব্যাপার? সে বলবে, বলছি। একটা রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। একজন শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, একজন বলার। এবং রহস্যের আবহাওয়া যত ঘন হবে, ততোই হয়তো ভাববে

প্রকাশদার এমন প্রতীক্ষার মুহূর্তে তার এই কথা হয়তো তুচ্ছ প্রমাণিত হবে। আর সেই তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার লজ্জায় জয়তী শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারবে না। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়বে, আর একদিন বলব। তেমন কিছু নয়।

বাইরের দিকে তাকাল। সামনেই অপ্রশস্ত বারান্দা, লোহার রেলিং। বারান্দাটা ঘুরে ওদিকে চলে গেছে। কিন্তু ওপাশে কেবিন নেই। কিছু কিছু বিছানা, জামাকাপড় এলোমেলো ছড়ানো। কে একজন শুয়েও আছে। হয়তো রেস্তোরাঁর চাকরবাকর থাকে। চোখ নামিয়ে নীচের দিকে তাকালে সামনের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে একতলার ঘরটা অংশতঃ চোখে পড়ে। শ্বেত পাথরের টেবিল ঘিরে খাটো খাটো চেয়ার। টেবিলের ওপর এ্যাসট্রে। ছুটো কাঁচের শিশি। নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো। ইচ্ছে হলেই ঘর পেরিয়ে বাইরের ফুটপাতের দিকে তাকান যায়। বাটনাবাটা শিলের মত ছিট্ তোলা ফুটপাত। খানিকটা গোবর, কলার খোসা, শালপাতার ঠোঙা। নোংরা অথচ জ্যান্ত। এ যায়, সে যায়। বাচ্চাদের পুরো শরীর চোখে পড়ে, বড়দের নয়। তবু আশ্চর্য লাগে দেখতে। শাড়ি, ধুতি, ট্রাউজার, এমনকি লুঙ্গি পরে কয়েকটা পা হেঁটে যাচ্ছে। ঐটুকু দেখে গোটা মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা আনার চেষ্টা করতে বেশ লাগে। রাস্তায় আটের-বি বাস। বাস, ট্যাক্সি আর রিক্সা। জয়তী দেখছে, কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।।

খাও ?

সতর্ক হল। বেশ বুঝতে পারছে নিজেব কাছ থেকে পালাবার

জন্য ঐ একফালি রাস্তা, এক টুকরো পৃথিবী, কিছু দেখা আর না দেখা কয়েকটা মানুষকে জুড়ে তার মন এখনি নানা দার্শনিক চিন্তার জাল বুনতে শুরু করবে। কিন্তু প্রকাশদার কাছে এত দ্বিধা কেন? তাছাড়া সে তো শুধু প্রকাশদাকেই বলবে না, নিজেকেও শোনাবে তার গল্প, তার স্বপ্ন, তার সমস্যা। হয়তো প্রকাশদাকে উপলক্ষ্য করে নিজের সঙ্গেই কথা বলবে। পথ খুঁজবে! আর হ্যাঁ, বলতে যখন হবে, তখন যত সহজ, সহজ আর অবিচলিতভাবে সম্ভব, কথাটা পাড়া যাক। ভূমিকা নয়। ভূমিকায় নাটকীয়তা আসতে পারে। তাহলেই প্রকাশদা মনে মনে হাসবেন। জয়তী নিজেও নাটকের চরিত্র হতে রাজি নয়।

তোমার বুঝি খিদে নেই?

ইস্। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছি। জয়তী বুঝল না, খিদে নেই একথা স্বীকার করতে কেন বাধল। একবার ভাবল বলে, না, সত্যি তেমন ইচ্ছে নেই। কিন্তু পারল না। এক টুকরো পরটা চিবিয়ে এক ঢোঁক জল খেয়ে বলল, প্রকাশদা আপনাকে একটা কথা বলব।

বল।

আমি প্রেমে পড়েছি।

চম্‌কে মুখ তুলে তাকালেন। জয়তী নিজেও চম্‌কেছে। এত সহজে, আহ্, এত সহজে তার এই আশ্চর্য যন্ত্রণার কথা সে কিভাবে বলল? কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য মুক্তি। মুক্তি আর আনন্দ। কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচের অবকাশ নেই। প্রকাশদা জানলেন, মায়াদি জানবে। সকলে শুনবে। সকলে জয়তীকে

বুঝবে, যে জয়ন্তীর নতুন জন্ম হচ্ছে। মায়াদি না এসে ভালো করেছে। ওর সামনে এত সহজে বোধহয় কথাটা বলতে পারত না। কিন্তু প্রকাশদা কি খুব অবাক হয়ে গেছেন? স্পষ্ট করে তাকাল। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। সেই পরিচিত মুখ, কপালের ওপর এলোমেলো চুল, দীর্ঘদিন না কামানো গোঁফ দাড়ি। সেই পরিচিত মুখ, কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, কেন তা জয়ন্তী জানে না, তার মনে হচ্ছে একটা খাটো বেতঝাড় এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠেছে আর তাকে ঘিরে এক মুঠো জোনাকি উড়ছে, জ্বলছে। প্রকাশদা খুশিতে জোনাকির মত জ্বলছেন।

কি, হাঁ হয়ে গেলেন যে? কথাটা বলে ফেলে জয়ন্তী নিজেকে তারিফ করল।

দু-হাতে জয়ন্তীর বাঁ হাতটা চেপে ধরে প্রকাশদা জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি বলছো?

বারে। জবাব খুঁজে পেল না।

হাতটা ছেড়ে দিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। জয়ন্তী জানে এটা রেস্তোরাঁর কেবিন না হলে প্রকাশদা উঠে দাঁড়াতেন। অনর্গল কথা বলে অজস্র ছেলেমানুষি করতেন। ভাঙা ভাঙা গলায় গান গাইতেন।

উঃ, কি দারুণ, কি সাংঘাতিক। প্রকাশদা খুশিতে আর বিস্ময়ে, খুশি আর বিস্ময়ে যেন গলে যাবেন। বললেন, আমার বিজয়ীদি, মানে আমাদের জয়ন্তী দেবী কি না—হঠাৎ গলা নামিয়ে খুব একটা গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে ফিস্‌ফিস্ করে অনুনয় মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার ভাই, কে সেই ভাগ্যবান?

আপনি চিনবেন না। বিদ্যাসাগরে পড়ে, থার্ড ইয়ার। না, অনার্স নেই।

বারে। বিদ্যাসাগরের অনেককে আমি চিনি। কি নাম বলতো ?

একটু থেমে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে জয়তী হাসল। হেসে বলল, আসাদ।

প্রকাশদা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্তব্ধ আর গম্ভীর। চিন্তা করতে করতে বললেন, না, চিনি না তো। তারপর জয়তীর মুখে দ্রুত এক পলক চোখ বুলিয়ে শব্দ করে হেসে উঠলেন। বাঁ হাতটা আবার নেড়ে দিয়ে বললেন, বহুত আচ্ছা। বিজয়ীদি, তুমি সত্যিই আমার দিদি। তোমার পায়ের ধূলো নেব।

হঠাৎ ? কোনরকমে বলতে পারল। ভেবেছিল সব দ্বিধা কেটে গেছে। তবু বুকটা এমন ঢিপঢিপ করছে কেন ?

জানো ? ছেলেবেলায় ক্ষুধিত পাষাণ পড়ে একটি মুসলিম মেয়েকে ভালবাসার বড্ড সখ ছিল। আহ্, ওদের সেন্স অফ রোমান্সই আলাদা। আর কি মেজাজ ! তোমাদের মত ভেজা ন্যাকড়া নয়।

বটে ? শেষে আপনার এই সিদ্ধান্ত ?

থাক থাক। রাগ করো না। তোমার প্রেমের গল্প বল, শুনি।

বাচ্চাটা দু-কাপ চা নিয়ে এল। টেবিল পরিষ্কার করে প্লেট আর গ্লাস কটা যখন নিয়ে যাচ্ছে, তখন জয়তী জিজ্ঞেস করল, সিগারেট খাবেন না ?

জরুর। একটা নয়, এক প্যাকেট। চারমিনার নয়, উইল্স্। সম্ভব হলে গড়গড়া টানতাম।

ব্যাগ থেকে টাকা বের করে জয়তী বলল, এক প্যাকেট ক্যাপস্টান এনে দেবে ভাই ? কি, দেশলাই আছে, না—

মাথা খারাপ ? ও বস্তুটি আমি সর্বদা পকেটে রাখি। অবিশ্যি পরার্থে।

প্রকাশদা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। জয়তী টেবিলের ওপর পুরু অয়েলক্লথের ছেঁড়া ছেঁড়া ঢাকনিটার দিকে তাকিয়ে রইল। পুরনো হয়ে রং চটে গেছে। জলে কাদায় কেমন যেন চটচটে। মসজিদের গায়ের নক্সার মত বিবর্ণ কয়েকটা ছাপ। আজকাল এমন টেবিলক্লথের চলন নেই।

সিগারেটের প্যাকেট এল। প্রকাশদা ওপরের সেলোফেন পেপারটা যত্ন করে খুললেন। তারপর প্যাকেটের ভেতরে রাংতার মোড়কের একটা মুখ অল্প ছিঁড়ে দুটো সিগারেট বার করলেন।

নাও।

আবার ইয়ার্কি হচ্ছে ?

আরে, আজ তো কেউ নেই। তোমার মায়াদি নয়, কলেজের অন্য ছেলেমেয়ে না। এমন একটা দিনকে সেলিব্রেট করবে না ?

দিন। হাত পেতে একটা সিগারেট নিল। দশ আঙুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, কি হয় এগুলো খেয়ে ?

আমার ব্রাদারকেই জিজ্ঞেস করো। ওর আবার চলে তো ?

আশ্চর্য লাগছে। আসাদ প্রসঙ্গে এ জাতীয় প্রশ্ন কেউ কোনদিন করেনি, জয়তীকে এভাবে ঠাট্টাও না। ভালো লাগছে, না লজ্জা করছে ? নাকি প্রকাশদার মামুলি রসিকতা শুনে বিস্ময়ে হাসি পাচ্ছে ? অন্যমনস্কের মত বলল, হুঁ।

গুড্।

কিন্তু আমার সামনে নয়।

ইডিয়টিক। কালই গিয়ে কান মলে আসব। এসব ছেলেমানুষির কোন মানে হয়?

চোখের সামনে আসাদের মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রকাশদা নেই, কেউ না। শুধু আসাদ। চোখ মেলে আসাদকে দেখছে অথচ কথা যে বলছে প্রকাশদার সঙ্গে, সে চৈতন্যও যায় নি। অস্ফুটে বলল, সত্যি। বড্ড ছেলেমানুষ।

হা হা করে হেসে উঠলেন, মাই গুডনেস্। এত পেকে গেছো?

জয়তীও লজ্জা পেয়েছে। হেসে বলল, ধ্যেৎ।

জানো? আস্তে আস্তে তুমি সব কিছু থেকে সরে যাচ্ছিলে, সকলেই জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? আমি বলতুম, নির্ঘাত পাড়ায় ডাংগুলি খেলছে, না হয় ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আর ভেতরে ভেতরে এই কাণ্ড?

হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

রাগ করো না বিজয়াদি। তোমার পাঠ্যজ্ঞান বা চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে তোমাকে কিছুটা ছেলেমানুষ ভাবতুম। তোমার স্বচ্ছতা, তোমার আবেগ, তোমার ছেলেমানুষি ঝগড়া বা রাগ, সবকিছুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধাকে ঠিক ছোট বোনের মত স্নেহের চোখে দেখতাম। মনে আছে মিস্ দাশের সঙ্গে ঝগড়ার ঠিক পরই আমাদের আলাপ হয়েছিল?

হাসিমুখে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল।

সেই মুহূর্তে তোমাকে আপন করে পেতে ইচ্ছে হয়েছে।

মেয়েদের সঙ্গে প্রথম দিনই ভাই-বোন বা মাসি-ভাগ্নের সম্পর্ক পাতাবার মতো অশ্লীল কাপুরুষতা আমার নেই। তাই মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা অজস্র হলেও বোন মাত্র কয়েকটি। বন্ধুত্বের স্তরভেদ আছে। কিন্তু বোনের সম্পর্কে তো কোন স্তরভেদ থাকে না। কিন্তু দেখ, আসলে বলতে চাইছিলাম অন্য কথা। মানুষের চরিত্র আমি বুঝি আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে থাকি—-এমন একটা গর্ব ছিল। কিন্তু তোমার সম্পর্কেই কতবড় ভুল করেছি। ছোট বোনটি বানিয়ে রেখে একবার জানার চেষ্টাও করিনি ইতিমধ্যে তুমি কত বড়, কতো বড় হয়ে উঠেছ।

আহ্, সে জানত প্রকাশদা এই কথা বলবেন। সে জানত তার হতাশা বা দুর্বলতার মুহূর্তে জোর পাওয়ার মত কিছু সঞ্চয় আজ ঘটবে। জয়ন্তীর কান্না এল।

এ্যাসট্রের ওপর ঘষে ঘষে সিগারেটটা নিভিয়ে প্রকাশদা হাসলেন, যাক্, প্রচুর বাণী দিলাম। এবার মুখর করে দাও হে আমার নীরব দিদিরে। শেষ কথাটা গুনগুন করে গানের সুরে বললেন।

পা থেকে চটি জোড়া খুলে জয়ন্তীও আয়েস করে বসল। টেবিলে ডান হাতের কনুই রেখে আঙ্গুলগুলো মুঠি পাকিয়ে তার ওপর গাল পেতে দক্ষিণ দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, গল্প আর কি ? তেমন কোন ঘটনা নেই। নেহাৎ সাদাসিধে ব্যাপার।

আর একটি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারটা পেছন দিকে হেলিয়ে টেবিলের কার্ণিশে হাঁটু দুটোর ভর রেখে প্রকাশদা আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে বললেন, তাই শুনি।

এক পাড়ায় থাকতাম। একসঙ্গে খেলাধূলো করেছি, বড় হয়েছি। রায়টের সময় ওরা চলে গেল মানিকতলা। হাঙ্গামা কমলে আবার দমদমের স্কুলেই পড়তে আসত। আসাদরা গরীব। এ স্কুলে ফ্রি-শিপের ব্যবস্থা ছিল।

তারপর ?

দাদার কথা তো জানেন ? মানে তাঁর মৃত্যুর সময় ছেলেমানুষ ছিলাম। স্বভাবতই তখন মুসলমানদের ঘৃণা করতাম, ভয়ও। কিন্তু দু-দিন পরেই টের পেলাম আসাদের অভাববোধ মনকে পীড়া দিচ্ছে। আর আশ্চর্য, দাদার মৃত্যুর বালিয়াড়ি ভেঙে আমাকে প্রেমের সমুদ্রে পৌঁছতে হয়েছে।

দাদার মৃত্যু, না নিজের ভালবাসা—কিসের আবেগে হঠাৎ কবিতার মত একটি লাইন উচ্চারণ করলো ? সেই মুহূর্তেও জয়তী নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাইলো। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। আর ভাবতে ভাবতেই পূর্ব কথার জের টেনে বলল, কিরকম যেন মনে হল, এ-ই ভালবাসা। অথচ বয়েসে তখনও আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।

তারপর ?

ম্যাট্রিক পাশ করলাম। ততদিনে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা যেন স্বভাব বা অভ্যেস হয়ে গেছে। দুজনেই বুঝতাম পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু কেউ কোনদিন মুখ ফুটে সে কথা বলি নি। প্রেমে পড়ার আগে বা পরে যে বিভিন্ন ব্যাপার-ট্যাপার হতে শুনেছি, আমাদের জীবনেও তা কখনো ঘটেনি।

নাইস্। তারপর ?

আমি ভর্তি হলুম স্কটিশে, ও বিদ্যাসাগরে। ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করে আসাদ এক বছর পেছিয়ে গেল।

ও, তাই বুঝি থার্ড ইয়ারের গোড়ার দিকে তোমাকে কিছুদিন বিচলিত দেখেছি? আমি ভাবতুম আই. এ-র রেজাল্ট ভালো হয়নি, তাই।

হ্যাঁ। কারণ দুইই। জয়তী হাসল।

বুঝেছি। লজ্জার কি আছে? প্রকাশদাও হাসলেন, এ তো স্বাভাবিক। তারপর?

এখনও তেমনি চলছে। রোজ দেখা হয়, গল্প হয়, মাঝেমাঝে রাগারাগি। আসাদ সত্যিই কিছুটা ছেলেমানুষ। আমিও ছিলাম। কিন্তু প্রকাশদা, কতগুলো কারণে আমাকে হঠাৎ বড় হতে হয়েছে।

কি রকম? উঠে সোজা হয়ে বসলেন।

মানে, দিদি অসবর্ণ বিয়ে করেছেন। বাবা-মার প্রতিক্রিয়া দেখে আমি তাই ভবিষ্যৎ ভেবে খুবই বিচলিত। বাবা এদিকে শিক্ষা, সহজ মেলামেশার ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। কিন্তু নিজের জাত, গোত্র, পারিবারিক সম্মান ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি আশ্চর্য নির্মম। আর মা তো নিতান্তই মধ্যযুগীয়। তা ছাড়া দাদার ইয়ের পর গোটা মুসলমান সমাজ সম্পর্কে মার ঘৃণা বলুন, ভয় বলুন— সবই সীমাহীন!

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রকাশদা আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

সংসারে আমার যা কর্তব্য, তা করব। আমাকে করতেই হবে।

কিন্তু দিনে দিনে আমি নিজের কাছেই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছি প্রকাশদা।

কেন?

এই সেদিনও ভাবতাম ভালবাসাই ভালবাসার শেষ। প্রেম সম্পর্কে গল্প, কবিতা, তত্ত্ব আলোচনা সবই কিছু কিছু পড়া ছিল। কিন্তু আমার কাছে ভালবাসা কোনদিনই সমস্যা মনে হয়নি, কারণ আমাদের প্রেমে কোন জটিলতা ছিল না। দেখা হওয়া, কথা বলা, একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো—এর পর দুজনের আর চাহিদা ছিল না। তাই ভাবতাম একদিকে রইল কর্তব্য, বাবা-মার সংস্কার। অন্যদিকে রইলাম আমি আর আমার প্রেম।

অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

কিন্তু দিদির বিয়েই মনে প্রথম সংশয় আনল। দিদি আমাদের সত্যি ভালবাসত, চিন্তা করত সংসারের জন্য। তার কর্তব্যবোধেও কোন খাদ ছিল না। কিন্তু যেদিন দেখলাম ভদ্রমহিলাকে তবু আমাদের ছেড়ে যেতে হল, সেদিন বারবার ভাবলাম—এ কি, এ কেন? দিদির প্রেম কি তুচ্ছ, না আমিই ভালবাসার নামে ছেলেখেলা করছি?

কোন প্রশ্ন না করে প্রকাশদা নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

স্কুলে মাস্টারি নিলাম। এক মাসে আমার বয়েস অনেক বেড়ে গেল। এতদিন কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছি, স্কটিশের মত কলেজ। দেখেছি কত প্রেম এল আর গেল। ভালবাসার সমস্যা কত শুনতে হয়েছে, বন্ধুবান্ধবকে কতবার সমবেদনা জানাতে হল।

কিন্তু মাস্টারি নেওয়ার পর বুঝলাম ওরা কি ছেলেমানুষ, আমরা কি ছেলেমানুষ।

একবার প্রকাশদার দিকে তাকাল। তারপর সোজা হয়ে বসে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাঁ হাতের চুড়িটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, শকুন্তলা আমার কলিগ্। ওর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না বিয়ের পর মেয়েরা কি আশ্চর্য ফ্র্যাঙ্ক হয়ে যায়। জীবনের সব রহস্য জানার পুলক আর বিস্ময় কিছুতেই নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। আর দিনের পর দিন, আহ্, দিনের পর দিন এই আলোচনা শোনায় মনের একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এক দিন আবিষ্কার করলাম আমার মধ্যেও সেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোন দিন স্পষ্ট করে যা ভাবি নি, যা বুঝি নি—আর আমার কাছে সেই সত্য অস্পষ্ট নয়। বুঝলাম, তাকে আজ অস্বীকার করতে পারি, কালও পারি। কিন্তু তারপর? আমাদের শিগ্গিরই একটি ভাই হবে। মার দিকে চোখ পড়ে আর একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে মনকে চাবকায়। স্কুলে শকুন্তলা, বাড়িতে মা, আর এই প্রশ্ন, তারপর? তারপর কি জীবনের প্রশস্ত পথ থেকে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে আর একটি হৈমদি হয়ে উঠব? হৈমদিকে আপনি চেনেন না, না?

বুঝলাম। প্রকাশদা কি হাসার চেষ্টা করলেন, না যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল? একটু থেমে বললেন, আসাদের সঙ্গে আলোচনা করেছো? ও কি বলে?

কি বলবে? মনের এই ঝড়ঝাপ্টার কথা ওকে জানাইনি, কাউকে না। কি লাভ বলুন? আর ভয় কি জানেন? দু-দিন পরে

আসাদ যখন জীবনের অনিবার্যতায় একই সমস্যায়, পূর্ণতা পাওয়ার সমস্যায়, সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন কি বলবো? আমি কি করবো?

ভুরু দুটো কুঁচকে দু-হাতে মাথার চুল মুঠি করে চেপে প্রকাশ-দা শুনছিলেন। হঠাৎ হাত নামিয়ে মুচ্‌কি হেসে বললেন, যদি এমন হয়, আসাদও এক ধাঁচে চিন্তা করছে আর মনে মনে ভাবছে জয়তী ছেলেমানুষ, এই যন্ত্রণার কথা শুনিয়ে ওর কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি, তাহলে? কিংবা, যা ভাবে তা লজ্জায় বলতে পারে না, তবে? এ কখনো হয় জয়তী, যে ভালবাসা তোমার মনে পরিণতিবোধ এনেছে, আসাদের ওপর তার কোন প্রভাব নেই?

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। কথাবার্তা, চালচলন, চাউনি—সমস্ত জড়িয়ে আসাদকে মনে পড়ছে। তাই কি? আসাদও কি নতুন চৈতন্যের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করছে? কিন্তু জয়তী আসাদকে ভালবাসে, আসাদের যন্ত্রণা সে বুঝতে না পারবে কেন? আসাদও তো জয়তীকে ভালবাসে। তাহলে কি জয়তীর সমস্ত লজ্জা, সমস্ত যন্ত্রণা ওর অজানা নয়? আহ্, আসাদ কি সব বোঝে? নতুন অবস্থা-বিন্যাসের প্রভাব জয়তীর ওপর যদি পড়ে, আসাদের ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? প্রকাশদা কতোবড় ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত কাছে থেকেও যেমন প্রকাশদা জানতে পারেন নি জয়তী বদলেছে, তেমনি নিকট সান্নিধ্যেও জয়তী বোঝে নি আসাদ বড় হয়েছে। কি আশ্চর্য একটি গান। শুধু জয়তী নয়, আসাদও বড় হয়েছে।

পকেট থেকে একটা দু-আনি বের করে প্রকাশদা টেবিলের

ওপর ঠুকলেন। বাচ্চাটা এল। বললেন, দু-কাপ চা। একটা ডবল হাফ, একটা কড়া।

এই মুহূর্তেও প্রকাশদা ভোলেন নি জয়তী ডবল হাফ চা খায়। আশ্চর্য লোক তো। রাগ হচ্ছে ভাবতেই হাসি পেল। তার যন্ত্রণা শুনে সকলের সব কিছু ভুল হয়ে যাবে, জয়তী কি তাই চায়?

বুঝলে বিজয়ীদি, তোমার সমস্যা অ্যাডজাস্টমেণ্টের।

ঠিক ধরেছেন। খুশি হয়ে জয়তী বলল, এক্কেবারে তাই। নিজের সঙ্গে পরিবারের, পরিবারের সঙ্গে সমাজের, আমার বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের অ্যাডজাস্টমেণ্ট।

বক্তৃতার মত শোনালেও এ কথা কিন্তু সত্যি। বিশ্বাস কর, আজ পৃথিবীর সকলের এই এক সমস্যা। না, তোমার প্রব্লেমের গুরুত্ব কমাচ্ছি না, সে স্পর্ধা আমার নেই। জয়তীর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রকাশদা বললেন, রাগ করলে ভাই?

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলল, না, বলুন।

হ্যাঁ। এই সমস্যা প্রত্যেকের, তবে তার চরিত্রে তফাৎ আছে। অনেকে ভেঙে পড়ে, ভয় পায়, ভুল করে। আর আজীবন সে ভুলের মাশুল গোণে। কিন্তু তোমায় উপদেশ দেব, বিশ্বাস কর গ্যাস দিচ্ছি না, এ সাহস আজ আর নেই। আমি জানি তুমি পথ খুঁজে বার করবে। তুমি এবং তোমরা দুজনেই। শুধু একটা অনুরোধ করব। করবো?

বুক টিপটিপ করে উঠল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে অস্ফুট বলল, বলুন।

আবেগের বশে হঠকারিতা করো না। আর একটা কথা। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন ক্ষুদ্রতা নয়। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে যা সত্য বলে বুঝবে—কখনো তার সঙ্গে আপোস করবে না। চেষ্টা রাখবে বোঝাতে, ধৈর্য ধরবে, ত্যাগ স্বীকার করবে। শেষে প্রয়োজন হলে আঘাত দেবে। ভাই বিজয়ীদি, মানুষের ইতিহাসে এই আঘাতের মূল্য আছে।

বাচ্চাটা চা নিয়ে এল। কিন্তু প্রকাশদার কথাকটা জয়তী তখনো মনে মনে উচ্চারণ করছে। হ্যাঁ, সকালে যা ভেবেছিল তাই সত্য হল। প্রকাশদা নতুন কিছু বলেননি। এ প্রসঙ্গে নতুন কিছু বলার নেই—যা সে আগে ভাবেনি। তবু জয়তী যা খুঁজছিল, পেয়েছে। তার ভাবনার সঙ্গে প্রকাশদার চিন্তার মিল খুঁজে পেয়েছে। পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি মানুষ—যাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে—জয়তীকে বলেছেন সত্য হতে। বলেছেন পথ খুঁজে নিতে। পথ আছে। আর পৃথিবীতে যে মানুষটিকে সে প্রথম তার প্রেমের কথা শোনাল—তিনি জয়তীকে অভিনন্দিত করেছেন তার ভালবাসার জন্য, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আহ্., আনন্দে আর বেদনায় চোখে জল আসছে। আনন্দে আর বেদনায়।

চা খাও। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে প্রকাশদা হাসলেন, এবার আমি একটা গল্প বলি শোন। একমাত্র তোমাকেই বলা যায়। অন্যমনস্কের মত একবার বাইরের দিকে তাকালেন!

রাস্তার ফুটপাতে জয়তীরও চোখ পড়ল। একটা কুকুর রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এল। আর এই আসন্ন সন্ধ্যায় কতগুলো ক্ষিপ্র পদচারণা যেন

তার মনটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জেটির ধারের সেই ছায়া-ছায়া গাছতলায়। আসাদ বড় হয়েছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে। কোনদিন কেউ কাউকে যেমন বলে নি—ভালবাসি, অথচ বুঝেছে ভালবাসে, তেমনই আজও কি কেউ কাউকে বলবে না—ভালবাসার একি যন্ত্রণা, অথচ সব যন্ত্রণা বিনা প্রকাশে সহ্য করে যাবে!

জানো? বছর দুই আগে আমি একবার প্রেমে পড়েছিলাম। মানে, হঠাৎ আর কি!

জয়ন্তী চমকাল। প্রকাশদা আর প্রেম—এই দুটো শব্দে যে কোন যোগসূত্র থাকতে পারে, কোনদিন তা কল্পনা করে নি। কলেজের কেউই হয়তো ভাবতে পারে না।

তোমাদের মায়াদিকে গিয়ে মাথা চুলকে স্পষ্ট করে বললাম—দেখুন, আমি আপনাকে—মানে ঠিক এভাবে না হলেও অনেকটা এই রকম আর কি।

জয়ন্তী আর একবার চমকাল। প্রকাশদা, মায়াদি, প্রেম—কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য!

তারপর কি হল জানো? মায়াও দিন কয়েক পরে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমার সম্পর্কে নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝেছেন, তাহে প্রেম নাই।

জয়ন্তীর মুখ নীল হয়ে উঠল! প্রকাশদা কি ঠাট্টা করছেন? না তো! কিন্তু এ কি করে সম্ভব? প্রকাশদা ভালবাসলেন অথচ মায়াদি পারলেন না—এই ঘটনা এমন করে একটা মানুষ কি ভাবে নিজের মুখে বলে?

তোমরা কেউ জানতে না। আজও কেউ জানে না। ভেতরে ভেতরে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। মানে, আমি যেমন ঠাট্টা করে বললাম, ঘটনাটা এমন হাল্কাভাবে ঘটে নি। কিন্তু যা ঘটেছে তাই বললাম। আমি মায়াকে ভালবেসে দুঃখী আর মায়া আমাকে ভালবাসতে না পেরে দুঃখী। দুজনেরই মনে সমান অপরাধবোধ। কিন্তু হৃদয় বস্তুটিতে প্রেম জোর করে ঢোকানো বা তাড়ানো যায় না—এ তোমাকে আর কি বোঝাবো? সমস্যাটা রীতিমত পাকিয়ে উঠল। মায়ার ধারণা হল—আমাকে স্বীকার করতে পারেন নি, তাই আমি ভেঙে পড়ছি। আমি ভয় পেলাম, আমার ইচ্ছাশক্তির কাছে ভদ্রমহিলা তাঁর ভালো-লাগা বা ভালবাসাকে যদি অবনত করেন—তা হলে সে হবে দুজনেরই চূড়ান্ত অপমান। জানো তো ভাই, ভালবাসা চেয়ে করুণা পাওয়ার মত দৈন্য আর নেই। করুণা নিতে পারব না, অথচ মায়াকে না পাওয়ার যন্ত্রণাও সইতে পারি নে।

অন্যমনস্কের মত মুখ টিপে একটু হাসলেন। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ওপরে ওপরে সব করে যাচ্ছি। সংগঠন, রাজনীতি, আড্ডা, ক্লাস। সেই পিরিয়ডেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের ব্যাপারে টেলার সাহেবের সঙ্গে ফাটাফাটি হল, নিশ্চয়ই মনে আছে। অথচ মন তখন পালাতে চাইছে। কিছু পরে সুযোগও এল। পনেরই আগস্ট উপলক্ষ্যে গোয়ায় সত্যাগ্রহী দল যাবে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মহিমা এবং ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা ভোলার সহজ একটা পথ খোলা।

তারপর? চাপা আর কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল।

হল না। ওঁরা বললেন, আমি না গেলেও গোয়ার আন্দোলন আটকে থাকবে না। কিন্তু গেলে নাকি কলেজে কাজের ক্ষতি হবে। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে সত্যাগ্রহী পাঠাবার মত অবস্থা তখনও আসেনি। মায়াও একই কথা বললেন। আর নিজের সেল যদি ডিসিশন করে, তা হলে যাই কি করে?

সে তো ঠিকই। জয়তী বলল। কারণ আর কিছু বলার ছিল না।

মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে মায়া আমাকে বললেন, এভাবে পালাতে চান? লজ্জা হল, লজ্জা আর দুঃখ। হেসে বললাম, না, পালাবো না। আর সত্যি কথা বলতে কি মরার বাসনা বা শহীদ হবার ইচ্ছে কোনটাই আমার ছিল না। শুধু পালাতে চেয়েছিলাম। একটা চেঞ্জ তখন দরকার। সত্যাগ্রহী হয়ে গেলেও যে প্রথম দলে ছাত্রদের পাঠাবে না, তা জানতাম। তবু চোখের সামনে এত বড় একটা আন্দোলন দেখতে পেলে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা বা ফ্রাস্ট্রেশন অনেকটা কমতো। কিন্তু মায়ার কথায় বুঝলাম ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে যোগ দেওয়া সবল চিত্তের লক্ষণ নয়। আমাকে এইখানে থেকেই সমস্ত হতাশা আর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

এক চুমুকে আধ কাপ চা গিলে জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে প্রকাশদা বললেন, এইটুকু শুনে কারোর সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে এলে ভুল করবে। আমি জানি ভালবাসতে পারা যত যন্ত্রণা, ভালবাসতে না পারার যন্ত্রণাও তার থেকে কম নয়।

কিন্তু প্রকাশদা ওকালতি করছেন কেন? জয়তীর চোখে

মায়াদি ছোট হয়ে যাবে, এই ভয়ে? না কি নিজের প্রত্যয়ের অবিচলতা? দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল, তারপর?

তারপর আর কি? আছি, ভালোই আছি। সবই করছি। মায়ার সঙ্গে আগের সম্পর্কই আছে। কেউ কিছু বোঝে না, জানে না। প্রেমে ব্যর্থতার যন্ত্রণা যে একেবারে ভুলে গেছি, তা বললে মিথ্যে ভাষণ হবে। তবে তার ছেলেমানুষি বাড়াবাড়িটা আর নেই।

জয়তী পাথর হয়ে গেছে। মায়াদিকে মনে পড়ছে, প্রকাশদাকে। প্রকাশদা আর সামনে বসে নেই। স্মৃতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মায়াদির সঙ্গে সখীসংবাদের পালা গাইছেন। কতোদিনের কত ঘটনা, মামুলি কথা, তাকাবার সামান্য ভঙ্গির পেছনে এত ইতিহাস ছিল, ব্যঞ্জনা ছিল, তা কি জানত? কাছে থেকেও মানুষ মানুষকে কতটুকু চিনতে পারে?

তোমাকে এই গল্প বললাম কেন জানো?

কেন?

অস্থির ভাবে মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে প্রকাশদা বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেজায় গর্ব ছিল, প্রেমের ব্যাপারে আমি একটা মহৎ পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোমার মহত্ব আমার চেয়েও বেশি। আমি পাইনি। তুমি পেয়েও চারিদিকে চোখ রেখে কতটুকু নেবে চিন্তা করছ। ভাই বিজয়ীদি, যদি কখনো দুর্বল হয়ে পড়, তাহলে সেই মুহূর্তে আমার এই কথাটা মনে রেখো। আমি নিজেও যদি কখনো দুর্বল হই, তাহলে তখন তোমাকেই স্মরণ করব।

টপ্ করে একফোঁটা জল পড়ল। জয়তী কাঁদল। হায়রে।

এসেছিল পথ খুঁজতে। এখন নাকি সে-ই অন্যকে পথ দেখাবে। জয়ন্তী প্রকাশদাকে শক্তি দেবে বাঁচতে। জীবন কি বিচিত্র, কি বিচিত্র।

প্রকাশদার দিকে তাকাতে ভয় করল। যে মানুষটা ময়লা পোশাক, রুক্ষ চুল আর কাঁধে একটা ভারী ঝোলা নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে, হৈ হৈ করছে, গান গাইছে—কলেজের প্রত্যেকে যাঁকে ব্রিলিয়েণ্ট ছাত্র, সংকর্মী আর নিপুণ রাজনীতিক ছাড়া অন্য-কিছু ভাবতে পারে না—কতো বড় একটা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা কেউ জানে না, কোনদিন জানবে না। সমস্ত ছাত্রের সমস্যা দূর করতে যিনি ব্যস্ত, তাঁর নিজের সমস্যার আজও কোন সমাধান হয় নি।

জয়ন্তী ভাবছিল জীবনে মৃত্যু আছে, পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে—নিশ্চিত অবক্ষয় যখন সামনে, তখন বাঁচার জন্য এত যন্ত্রণা সে কেন সইবে? অথচ প্রকাশদা অমোঘ বিশ্বাস নিয়ে বসে আছেন পৃথিবী বদলাবে, জীবন পূর্ণ হবে। এই পূর্ণতা আনায় নিজের ভূমিকা পালনেও তাঁর কোনদিন শৈথিল্য নেই। ভবিষ্যতে সেই পূর্ণতার মুহূর্তে মায়াদি ভালবাসবেন, এমন নিশ্চিয়তা প্রকাশদার নেই। তবু তিনি জীবন সম্পর্কে, জীবন আর মানুষের ভবিষ্যতে কোন আস্থা হারান নি। স্বার্থপরের মত নিজের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে বহুর মঙ্গল-স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হন নি।

আহ্। সত্যিই পথ পেয়েছে। প্রকাশদা ভাবছেন জয়ন্তীর মহত্বের সীমা নেই। কিন্তু সে বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে তার যত সংশয় আর গ্লানি আর দ্বিধার অবসান ঘটল। হ্যাঁ। সমস্ত বাস্তবতার

সামনে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে তাকে পাঞ্জা লড়তে হবে। আর সরে থাকা নয়, দূরে থাকা নয়। তাহলেই ভয়। ভয়, গ্লানি, মৃত্যু। সত্য হবে। পথ খুঁজে নেবে। সে, তারা। জয়তী আর আসাদ আর প্রকাশদা, মায়াদি। আহ্। পথ আছে। পথ ডাকছে।

উঠে দাঁড়াল। বই আর ব্যাগটা পাঁজা করে তুলে বলল, চলুন। যাওয়া যাক।

॥ উপসংহার ॥

বৃষ্টি আসছে।

এস্‌প্ল্যানেডের চৌরাস্তায় নামল। বাসে বসে দেখেছে বিকেল শেষ হচ্ছে, কিন্তু সন্ধ্যা নামে নি। আকাশে দিনের নিভন্ত আলো, ওয়েলিংটনের মোড়ে নিয়ন বাতির বিজ্ঞাপনটা জ্বলে উঠেও ম্লান আর অস্পষ্ট। অথচ মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এই চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে জয়তীর চোখে অনেকখানি আকাশ। কালো। উত্তরে, পূবে ছদিকের সারি সারি প্রাসাদের বুক চিরে ট্রামের তার। দক্ষিণে, পশ্চিমে এক ফুটে ময়দান, অন্যদিকে অট্টালিকা। কিন্তু তিনদিকের এই উঁচু দেয়ালের ঘোমটা খসিয়ে অনেকখানি আকাশ। কালো। সন্ধ্যা আসে সময় জুড়ে। কিন্তু অন্ধকারটা হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ চোখে পড়ে। স্তিমিত তারাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটবার আগেই নানা রঙে, শোভায় চৌরঙ্গী মুখর হয়ে ওঠে! আর এই আলোর স্বচ্ছতাই মনে পড়িয়ে দেয় রাত হয়েছে।

বাঁকের কাছে দক্ষিণ-পূব কোণের ফুটপাতের গায়ে লোহার রেলিং। কালো রাস্তায় সাদা দাগ। চৌমাথার বুকে আলোর বেদী—ফুলের পাঁপড়ির মত চারদিকে চারটে বাতি। সাদা বাল্ব ঘিরে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্যামাপোকা উড়ছে। আকাশটা মেঘে মেঘে স্তব্ধ, এখনও নক্ষত্র হাসল না। রাজভবন ছাড়িয়ে, হাইকোর্টের চূড়া ঘেঁষে ছবির মত একটা মেঘ। কালো। বৃষ্টি আসছে।

আশ্চর্য। জীবন এখানে দ্রুত। দ্রুত আর কি এক অনিবার্যতার দিকে যেন সব সময় ছুটছে। চার রাস্তার মোড়ে লাল, হলুদ, সবুজ বাতির নিশানা। অনেকগুলো ট্রাফিক পুলিস, অফিসার। উত্তর-

দক্ষিণের রাস্তা এখন খোলা। গাড়ি ছুটছে, মানুষ পার হচ্ছে। নানা জাতের যান, যাত্রী। ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় সবুজ গ্লোব, প্যারাডাইস্ সিনেমার লাল-নীল হরফের বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিভছে। মধ্যের একটা অক্ষর নেই। এক ভদ্রলোক অনেকখানি ছুটেও বাস ধরতে পারলেন না। ফুটপাতের ওপর দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসে। থেকে থেকে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। কালো আকাশ। মেঘ। বৃষ্টি আসছে।

পূব-পশ্চিমের রাস্তা আলোর নির্দেশে বন্ধ। পর পর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাম, বাস, প্রাইভেট কার। একটা রিক্সাকে ধমক দিয়ে পুলিস পেছন দিকে পাঠিয়ে দিল। সাদা দাগের সামনে লোহার রেলিংয়ের ভেতর অজস্র মানুষ অপেক্ষা করছে। কয়েকফুট চওড়া চৌরঙ্গী রোড পেরোবার জন্য হয়তো কয়েকমিনিট দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তেমন একটা ক্ষোভ নেই। কারণ সকলেই জানে এরপর পালা আসবে। সবুজ বাতির নিশানায় তারা ওপাশে যাবে, উত্তর দক্ষিণের রাস্তা তখন বন্ধ। আহ্, ক-হাজার বছরের সভ্যতায় মানুষ নিজেই পথ তৈরি করেছে, নিজেই পথ সামলাচ্ছে। আলোর বেদীটার দিকে তাকিয়ে মাত্র দেড় শতাব্দী আগের কলকাতাকে জয়তী উপলব্ধি করতে চাইছিল। তার রোমাঞ্চ হল। আর সেই মুহূর্তে সজাগ হয়ে বুঝল, শুধু অনুভূতির রোমাঞ্চ নয়। এতক্ষণ গুমোটের পর প্রথম হাওয়া বয়েছে। বাতাসের স্পর্শে ঘর্মাক্ত হাতদুটো শিরশির করে উঠেছে। হাওয়া! দূরের সেই মেঘটা চেহারা বদলে অন্য এক ছবি হয়ে উঠেছে। হাওয়া, ছবি, কালো আকাশ। বৃষ্টি আসছে।

ফুটপাতের ওপর একবার তাকাল। এক ইঞ্চি জায়গার অপচয় নেই। মোড়ের পানের দোকান থেকে শুরু করে মেট্রোর গায়ের গলি পর্যন্ত যে কয়েকগজ পরিসর, তাতে স্থায়ী আর অস্থায়ী কতো দোকান, কতো ধরণের।

সামনে উত্তরের ফুটেও একবার চোখ বোলাল। মসজিদ। ঢুকবার দরজার গা থেকে শুরু হয়েছে পর পর ফলের দোকান, ঘড়ি আর মনিহারির ছোট্ট বিপনি। তারপর নীল রঙের খানিকটা লোহার রেলিং। গায়ে ক্যালেণ্ডার আর ছবির পসরা। অভিনেত্রী, অবতার, দেবদেবী এবং দেশনেতাদের কিছু বিচিত্র ভঙ্গির পোর্ট্রেট। ল্যাণ্ডস্কেপও আছে। ছাপা, অথচ দেখলে মনে হয় আঁকা। বিদেশী ছাঁদে বাংলা দেশের নদী, নৌকো, আকাশের চাঁদ। সামনে দিয়ে মানুষ যাচ্ছে। হঠাৎ এক একটা ফাঁকে রেলিংয়ের এক একটা অংশ উঁকি মারছে। আর আশ্চর্য, ছোটবেলা থেকে এই এক জাতের ছবি নানা ফুটপাতে বিক্রি হতে দেখে আসছে। কে এঁকেছিল? ওই রঙ চঙে পোর্ট্রেটগুলোর পাশে ল্যাণ্ডস্কেপটা দেখতে মন্দ লাগে না। কোন একজিবিশানে এভাবে ছবি সাজাবার কথা কেউ চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু এখানে মোটেই তা অস্বাভাবিক ঠেকছে না।

এই চৌরাস্তার কোণ ঘেঁষে দাঁড়ালে তার চোখের পাল্লার ভেতর এমনি আপাতঃ অসঙ্গতির কি আশ্চর্য সঙ্গতি ফুটে উঠেছে। এদিকে মসজিদ, ওদিকে চার্চ, সামনে মদের দোকান। ফলের পসরা সাজিয়ে সাদা দাড়ি ঐ যে মুসলমান বুড়োটা বসে বসে অলস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, ওকে দেখলে আরব্য

উপন্যাসের চরিত্র মনে হয়। আর জয়তীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে দামি স্যুটপরা যে সুপুরুষ ভদ্রলোকটি অন্যমনস্কভাবে বারবার হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন—সম্ভবতঃ ইনি বিদেশ ঘুরে এসেছেন। ফুটপাতের ওপর উবু হয়ে বসে যে বাচ্চাটা তার বুট-পালিসের বাক্স বাজিয়ে নীচু গলায় সিনেমার গান গাইছে—ও জানে না পৃথিবী একটা গ্রহ, সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আর এই সব মিলিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়—তার একদিকে গাড়ি চলে, মানুষ। অন্যদিকে সকলে অপেক্ষা করে—অপেক্ষা করে, কিন্তু কোন অসন্তোষ নেই।- ক্ষোভ নয়। রাস্তার মোড়ে লোহার স্ট্যাণ্ডের ওপর লোহার ঢাকনার ভেতর কিছু সময়ের ব্যবধানে লাল, হলুদ, সবুজ—আলো জ্বলছে, নিভছে। রূপে, পোষাকে, প্রসাধনে, ধ্যান আর ধারণা আর চরিত্রে আশ্চর্য অসঙ্গতি এবং বিরোধ নিয়ে একটি নতুন অস্তিত্বের ঘোষণার মত এই চৌরাস্তা কিন্তু সব সময় কি এক অনিবার্যতার দিকে ছুটছে! দেড়শো বছর আগে এখানকার বাতাস যে ভবিষ্যতের দিকে ছুটেছিল, আজকের এই মুহূর্তে তারই পথ ধরে আরো দেড়শো বছর পরের অনিবার্য ইতিহাসের দিকে অস্থির আবেগে ছুটছে।

আবার হাওয়া দিল। চারদিক ছুঁয়ে এই বাতাস জয়তীকে স্পর্শ করছে। আহ্, জয়তীর চৈতন্যেও নতুন অস্তিত্বের জন্ম। সমস্ত স্ববিরোধ আর অসঙ্গতি নিজের মধ্যে নিয়ে এক অনিবার্যতার দিকে যাওয়ার জন্যে স্থির, শান্ত হয়ে সে অপেক্ষা করছে। দেখছে। বৃষ্টি আসছে। ঝড় উঠেছে। আকাশের চাপ বাঁধা কালো মেঘ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তরল হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

বাঁশি বাজল। পুলিস হাত দেখাল। উত্তর আর দক্ষিণের রাস্তা বন্ধ। যে বাস থেকে জয়তী নেমেছে, তার এঞ্জিন গর্জন করে উঠল। পরপর কয়েকটা ট্রাম ঘণ্টা বাজিয়ে আগের ড্রাইভারকে দ্রুত হতে নির্দেশ দিল। ট্রামের ঘণ্টা, বাসের গর্জন, মোটরের হর্ন আর যে লোকগুলো সাদা দাগের ভেতর দিয়ে ওপারে যাচ্ছে, তাদের টুকরো কথা আর মন্তব্য—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হল। জয়তী কান পেতে শুনল, হাঁটতে হাঁটতে শুনল। সেই শব্দের সঙ্গে যখন তার এবং অন্য কয়েক-জনের পদচারণার ধ্বনিও এক সুরসঙ্গতিতে মিশে গেল—তখন সে অবাক হল। ওপারে গিয়ে যখন পেঁাছেচে, তখনও কান থেকে সেই শব্দের ঢেউ যায় নি। এঁকে বেঁকে ট্রামলাইন কার্জনপার্কের গুমটির দিকে চলে গেছে। কিছু কিছু কাটাফলের ব্যাপারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছতলার সত্র থেকে বাঁশের চোঙা বেয়ে জল পড়ছে, একজন আঁজলা ভরে খাচ্ছে। দূরে কে যেন কাকে চীৎকার করে ডাকল, একটি উদ্বাস্তু মা ঘোমটা টেনে তার বাচ্চা ছেলের হাত সামনের দিকে প্রসারিত রেখে একটানা বিলাপের মত ভিক্ষে চাইছে, আকাশে বজ্রের গুঞ্জন—আশ্চর্য, আশ্চর্য, এতক্ষণ দৃশ্য দেখে জয়তী চৌরঙ্গীকে অনুভব করছিল। কিন্তু যদি অন্ধ হত, তবু শব্দ শুনে বুঝতে তার এতটুকু অসুবিধে হত না। শব্দ আর রূপ। গন্ধ নেই। কিন্তু জয়তী জানে, বৃষ্টি আসছে। একটু পরে চৌরঙ্গীও গন্ধে মৌ মৌ করে উঠবে। ফুলের না, নির্দিষ্ট কিছুর নয়। অস্তিত্বের ঘ্রাণ। আর রূপে, গন্ধে,শব্দে পৃথিবীটা উপছে পড়বে।

আশ্চর্য। অবাক হয়ে জয়তী আপন মনেই আবার বলল, আশ্চর্য। প্রতিমুহূর্তে এই বিস্ময়বোধ কি আশ্চর্য। জীবনটাই আশ্চর্য। পৃথিবীও এক বিস্ময়। আর জীবন আর পৃথিবী যে মনটাকে আশ্রয় করে প্রতিমুহূর্তে সত্য হচ্ছে, মিথ্যে হচ্ছে, রঙ বদলাচ্ছে—তারও বিস্ময়ের কোন সীমা নেই। সীমা নেই—এই কি তার আজকের মোট উপলব্ধি ?

টার্মিনাস পেছনে রেখে, কার্জন পার্কের মধ্য দিয়ে হেঁটে যখন আবার রাস্তায় নেমেছে, তখন ঝড় উঠল। মাঠের দিক থেকে শালপাতা আর কাগজ উড়িয়ে ধুলোর ঝড় ঘূর্ণির মত ঘুরতে ঘুরতে উত্তর দিকে চলে গেল। তারপরই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশটা যেন ইডেন গার্ডেনের ওপর ঝরে পড়বে। পথচারীরা দ্রুত। এদিকে ওদিকে ছড়ান ব্যাপারীর দল তাদের পসরা সাজাতে ব্যস্ত। বৃষ্টি আসছে। কিন্তু তার আগে জেটির ধারে সেই গাছ-তলায় পৌঁছতে হবে। ব্যাগের ভেতর প্রকাশদার সিগারেটটা রয়েছে। আজ আসাদকে উপহার দেবে, স্বীকৃতি জানাবে। উপহার নেবে, স্বীকৃতি চাইবে। আহ্, জয়তী আজ নিজের কপালে আসাদের আলুথালু চুলের স্পর্শ নেবে। সব সঙ্কোচ, বাধা এবং ব্যবধানের পর্দা টান টান করে ছিঁড়ে ফেলবে।

সে বুঝেছে মানুষ কেন বাঁচে। জয়তীকে কেন বাঁচতে হবে। জীবনের সহস্র তুচ্ছতা বা অসঙ্গতির মধ্যেও মানুষ কি নিয়ে বাঁচে, জয়তীকে কিসের জন্য বাঁচতে হবে। আহ্, নিশ্চয়তা কতোবড় আশীর্বাদ। নিজেকে ভালবাসি, একথা স্বীকার করতে আর লজ্জা নেই। অন্যকে ভালবাসতে পারার জোরও বেড়েছে, বাড়ছে।

সমন্বয় করতে হবে। নিজেকে বলল। দায়িত্বপালন করবে মানুষ হিসেবে—অন্যের যা প্রাপ্য, তা দেবে। নিজেকেও বঞ্চিত করবে না। বেশি দিয়ে বা কম দিয়ে মহৎ সাজার প্রলোভন জয় করবে, পক্ষপাতিত্বের কোন মোহ রাখবে না।

ইডেনগার্ডেন পাশে রেখে আউট্রাম ঘাটের দিকে বাঁক নিল। হাওয়ায় চুল উড়ছে, আঁচল খসে যাচ্ছে। কিন্তু জেটির ধারের গাছতলাটাও আর দূরে নয়। পথ আছে, পথ পেয়েছে। বাঁ হাতে বই আর ব্যাগ চেপে ধরে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জয়তী আরো তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল।

আর, বৃষ্টি এল।